প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য

দ্বিতীয়াংশ

(৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

শ্রীকালিদাস রায়

প্রকাশক—শ্রীজয়দেব রায়, এম-এ, বি-কম
৫৩।১৩ রসা রোড, টালিগঞ্জ।

১৩৫৭, জ্যৈষ্ঠ

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য
দি নিউ প্রেস
১, রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা—২৫

উৎসর্গ

সুহৃদ্বর অধ্যাপক

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

করকমলে-

সূচীপত্র

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য

তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড

মনসামঙ্গল

১

বাংলা সর্পসঙ্কুল দেশ। বৎসর বৎসর বহু লোক সর্পের দংশনে এ-দেশে প্রাণ-ত্যাগ করে। এই অমঙ্গল বারণের জন্য বাঙ্গালী সর্পের দেবতা মনসার পূজা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী কেবল মনসাপূজা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মনসার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের জন্য ছড়া গান পাঁচালী বহুদিন হইতেই রচনা করিয়া আসিয়াছে। মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিতে হইলেই উপাখ্যানের সৃষ্টি করিতে হয়। একটি উপাখ্যানেরও সৃষ্টি হইল—এই উপাখ্যানের মূলে কিছু সত্য'ও থাকিতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গলে চান্দ সদাগরের উল্লেখ আছে। চান্দের উপাখ্যান লইয়া প্রথম গ্রন্থ লিখিলেন কানা হরিদত্ত। ইহাকে মুসলমান অধিকারের আগের লোক বলিয়া মনে করা হয়। তারপর হোসেন শাহের সময়ে বরিশালের বিজয়গুপ্ত কবিকর্ণপুর পদ্মাপুরাণ লেখেন। পদ্মা মনসার আর একটি নাম। গুপ্তকবির গ্রন্থই বঙ্গদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল—গ্রামে গ্রামে গীত হইত। মনসামঙ্গলের গানকে মনসার ভাসানও বলে। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র ৬২ জন ভাসান-গান-রচয়িতার নামোল্লেখ করিয়াছেন। আরও কত যে ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী যুগে ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মনসার আর একটি নাম কেতকা।

অতএব ক্ষেমানন্দের উপাধি কেতকাদাস। ইঁহার কাব্যে বেহুলা চরিত্র অত্যুজ্জ্বল হইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের চরিত্র-মাহাত্ম্য ইনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—সে জন্য ঐ চরিত্রের গৌরব রক্ষা করিতেও পারেন নাই। চান্দের পরাজয়ে ইনি বিজয়ানন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল একখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য। দ্বিজবংশী-বদনের মনসামঙ্গলের ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে। ইনি সংস্কৃতশব্দবহুল সমৃদ্ধ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৬শ শতাব্দীর মনসামঙ্গল-রচয়িতৃগণের মধ্যে ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাধর সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনসার ভাসানের প্রভাব এমনি প্রবল হইয়াছিল যে বাঙ্গালীরা অন্য সকল দেবতাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যানগুলির মধ্যে মনসামঙ্গলের কাহিনীই সবচেয়ে পুরাতন। সর্পপূজার সহিত এই কাহিনীর যোগ আছে। সর্পপূজা দ্রাবিড়জাতি হইতে আর্য্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সর্পভয়ে প্রপন্ন বঙ্গদেশেই এই পূজার প্রাধান্য। সর্পদেবতাকে রুদ্রাণী মহাশক্তির একটি রূপ বলিয়া মনে করা হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রতপার্ব্বণের সহিত কোন-না-কোন কাহিনী জড়িত করা হইয়া থাকে। সর্পরূপা মহাশক্তির পূজাপার্ব্বণের সহিত বেহুলা চান্দ সদাগরের কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে।

আমাদের দেশের ধর্ম্মসভ্যতা দ্রাবিড় ও আর্য্যসভ্যতার মিশ্রণে উৎপন্ন। এই মিশ্রণটা বিশেষভাবে ঘটিয়াছিল বৌদ্ধযুগে। বৌদ্ধদের ধর্ম্মসভ্যতায় প্রথম-প্রথম ইন্দ্র (শক্র) ছাড়া অন্য দেবদেবীর স্থান ছিল না। ক্রমে বৌদ্ধ সভ্যতা ও হিন্দু সভ্যতার মধ্যে যখন সমন্বয় ঘটিতে থাকিল—তখন আর্য্য দেবদেবী বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান

পাইতে লাগিলেন। অবশ্য ইঁহাদের স্থান হইল বুদ্ধদেবের শাসনাধীনে। বৌদ্ধ শাসনে এই দেবদেবীগণের আদিম আর্য্যরূপ আর থাকিল না। নানা দেবদেবীর মিশ্রণে নূতন নূতন দেবদেবীর আবির্ভাব হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘের রূপের সঙ্গে আর্য্য দেবদেবীর রূপের মিলনে নব নব দেবতার সৃষ্টি হইল। এই সকল দেবতার পূজা এখন আর বড় প্রচলিত নাই, কিন্তু তাঁহাদের মূর্ত্তি আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেবল আর্য্য দেবদেবীর নয়, বহু অনার্য্য ও দ্রাবিড় দেবদেবীর সহিত বৌদ্ধ দেবদেবীর রূপের মিশ্রণও ঘটিয়াছিল—বৌদ্ধধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানে।

মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানই উত্তর ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এইরূপ দেবদেবীর পরিকল্পনা করিয়া তাঁহাদের পূজা প্রচার করিয়াছিল। দ্রাবিড় সভ্যতার সর্প দেবতা ও আর্য্য সভ্যতার সরস্বতী— "এই দুই দেবীর মিশ্রণে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ 'চতুর্ভূজা জটামুকুটিনী, শুক্লোত্তরীয়া, শুক্লসর্প-বিভূষিতা, চন্দ্রাংশুমালিনী, বীণাবাদয়ন্তী, জাঙ্গুলী দেবীর পরিকল্পনা করিয়াছিল।

এই জাঙ্গুলী দেবীই "নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরা, ফণিময়ী, হংসারূঢ়া, শশধরবদনা, সাষ্টনাগা, কামরূপা-যোগিনী শঙ্কর-পুত্রিকা মনসাদেবীতে পরিণত হইয়াছেন।

একটি ধ্যানমন্ত্রে স্পষ্টই আছে—"বন্দে শঙ্কর-পুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীং।" ইহাতেই প্রমাণিত হয় যিনি জাঙ্গুলী, তিনিই বিষহরী, তিনিই পদ্মা।"

বঙ্গদেশে সম্পূজিতা এই মনসা দেবীর ক্রমোদ্‌বর্ত্তনের ইতিবৃত্ত শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—তাঁহার মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে এই ভাবে সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন।

মনসার দাক্ষিণ্য অপেক্ষা মনসার প্রতিহিংসা-সাধনের ও অনিষ্ট

করিবার শক্তি যে কত তাহাই বুঝাইবার জন্যই যেন মনসামঙ্গল রচিত। এ বিষয়ে মনসামঙ্গল অন্নদামঙ্গলের বিপরীত। পদ্মাপুরাণে পদ্মার মাহাত্ম্য ততটা পরিস্ফুট হয় নাই যতটা পরিস্ফুট হইয়াছে চাঁদসদাগরের মাহাত্ম্য। চাঁদসদাগর বঙ্গসাহিত্যের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এক গোরক্ষনাথ ছাড়া এমন সংযম-দৃঢ় তেজোদীপ্ত চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। সত্যের জন্য, মনুষ্যত্বের জন্য মানবধর্ম্মের জন্য, পৌরুষ মর্য্যাদার জন্য চাঁদ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যে আত্মনিগ্রহ সহ্য করিয়াছিল, তাহার আদর্শ যদি বঙ্গসাহিত্যে প্রচুর থাকিত অথবা বাঙ্গালী জাতির কল্পনাতেও থাকিত, তাহা হইলে বাংলার এই দুর্দ্দশা হইত না। কবি শেষপর্য্যন্ত চাঁদের পরাভব দেখাইয়াছেন। তাহা না দেখাইলে দেবীর দৈবীশক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখানো হয় না। এই পরাভবেও চাঁদের চরিত্র ম্লান হয় নাই। অর্দ্ধ রাহুগ্রস্ত হইলেও চাঁদই প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আকাশে চিরসমুজ্জ্বল হইয়া আছে।

নিম্নলিখিত কবিতায় চাঁদ সদাগরের চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করা হইয়াছে।

দেবতা-মন্দিরে ভরা, সিন্দুর-চন্দনে গড়া, বাণী-তীর্থে উচ্চে তুলি শির,
তুমি দেবতারো বড়, আমার এ অর্ঘ্য ধরো, শৈব সাধু চন্দ্রধর বীর।
এ বঙ্গের সমতলে, তৃণ-লতা-গুল্মদলে, বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি,
জ্ঞানায়ুধ শাপজিৎ, হে অমর পরীক্ষিত, শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।
সাস্তালী পর্ব্বত ’পরে, হিন্তালের যষ্টি করে, চির-দীপ্ত তোমার পৌরুষ,
তোমা ঘেরি চারিপাশে, বাঁচে মরে কাঁদে হাসে, কোটিকোটি ভীরু অমানুষ।
মানুষে করিয়া খর্ব্ব, যাহারা করিল গর্ব্ব, তাদের ক্লীবতা দলি পায়,
অবিচল তুমি শৈব, কৃতাঞ্জলি হ’য়ে দৈব, মার্জ্জনা তোমার পদে চায়।
তব শিরে যমদণ্ড, ভেঙ্গে হলো সাত-খণ্ড, পণ তব প্রাণেরো অধিক,

সাত পুত্র-শব' পরি, শিব শূলী শম্ভু পরি' বামাচারী তুমি কাপালিক।
সনকার আর্ত্তনাদে, চম্পকনগর কাঁদে, ডুবে যায় সপ্ত-মধুকর,
কৌপীন করিয়া সার, তোমার পুরুষকার, পথে পথে ফিরে দিগম্বর।
অশ্রুবিন্দু নাই চোখে, দুর্বিষহ মহাশোকে, নেত্র তব উগারে অনল,
শুধু তব জগদীশ, কণ্ঠে ধরেছেন বিষ, সর্ব্ব অঙ্গে তোমার গরল।
বিষে তনু নীলরুচি, আত্মা তব শুভ্র শুচি, নীলাম্বরে পূর্ণচন্দ্রোপম।
সহস্র ফণার মাঝে, তোমার পৌরুষ রাজে, মহাবীর্য্য গরুড়ের সম।
হরিয়া নশ্বর ধন, তোমা নিঃস্ব অকিঞ্চন, কে করিবে? এত স্পর্দ্ধা কার?
পুরুষার্থ-শিরোমণি, শাশ্বত ধনে যে ধনী, বিশ্বে সেই নমস্য সবার।
তোমারে করিতে বন্দী, ব্যর্থ দেবতার ফন্দী, মানুষের সনে সন্ধি যাচে,
সর্ব্ব দৈব দণ্ড-ভয়, যে জন করেছে জয়, দণ্ড-দাতা প্রার্থী তারি কাছে।
সারা বিশ্ব অসহায়, নিয়তির জয় গায়, দাসীত্বে নোওয়াতে তার শির,
একাই করিলে রণ, স্তম্ভিত দেবতাগণ, কম্পমান পাষাণ-মন্দির।
যুগ যুগ ধরি যত, মূক জীব অবিরত, দৈব-দণ্ড আসিয়াছে সহি,
তোমার মাঝারে সবি, পুঞ্জীভূত রূপ লভি, রুদ্রকণ্ঠে হলো কি বিদ্রোহী?
সহস্র বৎসর ধরি, ভয়ে কাঁপে থরহরি, নরনারী যূপবদ্ধ ছাগ,
বজ্রমন্দ্রে তার মাঝে, শুনাইলে দেবরাজে, "মানুষেরো চাই যজ্ঞ ভাগ।"
শিখাইলে এই সত্য, তুচ্ছ নয় মনুষ্যত্ব, দেব নয়, মানুষই অমর,
মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে, করে দেব-মহিমা নির্ভর।
হে ব্রহ্মজ্ঞ মহাযোগী, হইতে চাহনি ভোগী, সত্য-ব্রহ্ম করি সঙ্কোচন,
সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত, পান করি চিদমৃত, জিনেছিলে মৃত্যুর শাসন।
উদ্যত-কনকঘট, সহস্র দেউল মঠ, কালদণ্ডে হ'য়ে গেছে গুঁড়া,
গরলসিন্ধুর মাঝে তোমার গৌরব রাজে চিরদিন মৈনাকের চূড়া।

বৈকালী।

চাঁদ ছিলেন শিবের উপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মবাদী। তৎকালীন সমাজের লোকেরা পরংব্রহ্মকে ছাড়িয়া মূর্ত্তিমতী প্রকৃতিকে পূজা করিত। যুগধর্ম্ম কেমন করিয়া যুগযুগান্তরের ধর্ম্মকে কবলিত করে, ভয়ের ধর্ম্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের ধর্ম্মকে অভিভূত করে, চাঁদের পরাভবে তাহাই দেখিতে পাই। সেকালের জনসাধারণের মুখপাত্ররূপে কবি দেখাইয়াছেন—নিষ্কাম ধর্ম্মের কোন মূল্য নাই, সকাম উপাসনাই প্রকৃত উপাসনা। চাঁদের পরাভবে বাঙ্গালীজাতির মনুষ্যত্বেরই যে পরাভব হইয়া গেল সেকালের কবিরা তাহা ভাবিয়া দেখিতেন না।

সতীধর্ম্মের মহিমাকীর্ত্তনের জন্য বেহুলাচরিত্র অনেকটা সাবিত্রীর আদর্শে অঙ্কিত হইয়াছে। স্বামীর জীবনের জন্য শোকজীর্ণা মৃতকল্পা বেহুলা যে দেবসভায় নৃত্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন—এইটুকুর মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য আছে। স্বর্গে ত আর বেদনা নাই—সেটা চোখের জলের ঠাঁই নয়। সেখানে চোখের জলে কি ফল হইবে? স্বর্গ আনন্দধাম—সেখানে আনন্দ দিয়াই পুরস্কার পাইতে হইবে। শোকাহতা বেহুলার দেবসভায় এই নৃত্য স্বামীর জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসর্গ। এত বড় পরীক্ষা সাহিত্যে কোন সতীর জীবনে হয় নাই।

এক হিসাবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব হইতে এই সাহিত্যের সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। মনসা দেবী মহাশক্তিরই একটি রূপ। তাঁহার উপাসনা শক্তিরই উপাসনার নামান্তর। মহাশক্তি মহামায়াকে শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী মনে করা হইলেও শাক্ত ও শৈবদের মধ্যে বিবাদের অন্ত ছিল না। মনসারূপা মহাশক্তির পূজা দেশময় প্রচারের জন্য ও তাঁহার মহিমা ঘোষণার জন্য এই সাহিত্য রচিত হইয়াছে। শক্তিপূজাপ্রচারের জন্য মনসাদেবীর নির্ব্বাচনে সার্থকতা আছে। সর্পভয়ভীত বাঙ্গালী চিত্তের শঙ্কাজাত ভক্তি আকর্ষণের পক্ষে শক্তির মনসারূপই প্রশস্ত মনে

করা হইয়াছে। মনসাপূজাপ্রবর্ত্তনই প্রাচীন কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—তাহার উপসৃষ্টিস্বরূপ (By-product) একটি সাহিত্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। তারপর ইহার সঙ্গে একটি চমৎকার লৌকিক উপাখ্যান পাইয়া পরবর্ত্তী কবিরা তাহা অবলম্বনে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। আমাদের দেশের কবিরা নূতন আখ্যানবস্তু আবিষ্কার করিতে পারিতেন না—একটা কোন উপাখ্যান পাইলেই তাঁহারা দলে দলে তাহাই অবলম্বন করিয়া কবি-শক্তির প্রয়োগ করিতেন।

শক্তিপূজা ও দেবতাবাদের সহিত অদৃষ্ট-বাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যাহারা নিরীশ্বর, তাহারা নিজের পৌরুষশক্তির উপর আর কোন দৈবী শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না। প্রাকৃতিক শক্তিকে অবশ্য তাহাদেরও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া স্তব বা উপাসনার দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রসন্ন করা যায়, একথা তাহারা মানে না। যাহারা ব্রহ্মবাদী, যাহাদের আস্তিকতার একটা দার্শনিক ভিত্তি আছে—তাহারা ভাগবতী শক্তিকে স্বীকার করে, কিন্তু সে-শক্তির সহিত পৌরুষের কোন বিরোধ আছে তাহা মনে করে না। দেবতার শক্তি বা দৈবীশক্তিই দৈব বা নিয়তি। এই নিয়তিকে অস্বীকার করিয়া যে শক্তি আপনার সাধনার উপর নির্ভর করে—তাহাই পুরুষকার। মনসামঙ্গলে প্রকারান্তরে দৈবীশক্তির প্রাধান্য দেখাইতে গিয়া কবি নিয়তিরই প্রাধান্য দেখাইতেছেন। মনসাদেবী এই নিয়তির প্রতীক। আর চাঁদ সদাগর পুরুষকারের প্রতীক। মনসামঙ্গলে এই নিয়তির সহিত পুরুষকারের সংগ্রাম দেখানো হইয়াছে। মনসার কাছে চাঁদের পরাজয়ই নিয়তির কাছে পুরুষকারের পরাজয়। চাঁদের দশা বিপর্য্যয়, সহস্র সাবধানতা সত্ত্বেও সাঁতালী পাহাড়ের লৌহদুর্গের ছিদ্র দিয়া

সর্পপ্রবেশ এবং লখীন্দরের মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনার দ্বারা নিয়তির লীলাই দেখানো হইয়াছে। সর্পদংশনকে রীতিমত নিয়তির দণ্ডই মনে করা হয়। কথায় বলে 'সাপের লেখা', কপালে লেখা থাকিলে সর্পদংশন হয়। সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও সাপের কবল বা ছোবল হইতে রক্ষার উপায় নাই। কাজেই ইহা নিয়তি ছাড়া আর কি ?

মনসামঙ্গলে পুরুষকারের পরাজয় দেখিয়া দৈবীশক্তির ভক্তেরা আনন্দই পাইতেন। অদৃষ্টবাদী দেশে তাই এই সাহিত্যের আদর হইয়াছিল অসাধারণ।

কেবল প্রাচীনযুগের ঘরসংসারের পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এবং সতীত্বের অলৌকিক আদর্শ দেখানো হইয়াছে বলিয়া ইহা সংসাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিতে পারে না। সনকা বিনাইয়া বিনাইয়া অনেক কথা কহিয়াছেন বলিয়াও ইহা সৎসাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। একমাত্র চাঁদসদাগরের চরিত্রই ইহার প্রধান সম্বল। মনসামঙ্গলের কবিগণ চাঁদ সদাগরের চরিত্রাদর্শের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও ইহাই তাঁহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

মনসামঙ্গলের শেষে চাঁদের সন্তানগণের পুনর্জীবন লাভ এবং চাঁদের লক্ষ্মীশ্রীর পুনরুদ্ধারের কথা আছে। তাহা সত্ত্বেও ইহা ট্র্যাজেডি। লখীন্দরের মৃত্যুতেই লৌকিক দিক হইতে কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যে ইহাই একমাত্র ট্র্যাজেডি এবং গ্রীক আদর্শের ট্র্যাজেডি। এই হিসাবে মনসামঙ্গলের একটা উচ্চধরণের স্বাতন্ত্র্য আছে। যে বাঙ্গালী বৃন্দাবনলীলার মাধুর্য্য উপভোগে অভ্যস্ত, বিলাসকলায় কুতূহল চরিতার্থতার জন্য উৎকর্ণ, সেই বাঙ্গালী যে এই শোকঘন বীভৎস ও ভীষণ আখ্যানবস্তু উপভোগ করিত কি করিয়া, ইহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহাতে

মনে হয়, বাঙ্গালীচিত্ত পরবর্ত্তী যুগের মেঘনাদবধ কাব্যের রস উপভোগের পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও মিলনান্ত পর্য্যবসান একটি বৈশিষ্ট্য। গান শুনিয়া শ্রোতা বেদনভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিবে, পাঠান্তে গ্রন্থে ডোর দিয়া পাঠক দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে ইহা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কবিদের অভিপ্রেত ছিল না। রচনার মধ্যে বিচ্ছেদ, বিরহ, মৃত্যু' ইত্যাদির অবতারণা করিয়া কবিরা পাঠকের চিত্তে বেদনানুভূতির সঞ্চার করিতেন—তাহা রসসৃষ্টির অঙ্গীভূত। দুর্ব্বিষহ বেদনা রসসৃষ্টির অন্তরায়। কবিরা বেদনার প্রখরতা ও দুর্ব্বিষহতা হরণ করিতেন পুনর্মিলন বা পুনর্জীবনের আশ্বাস দিয়া। এই আশ্বাস মনে পূর্ব্ব হইতে বিরাজ করিত বলিয়াই পাঠক অতিতীব্র দুর্ব্বিষহ বেদনার মধ্যেও সাহিত্যের রস সম্ভোগ করিতে পারিত।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধাকে ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রাই শেষ কথা। রাধার বেদনায় ব্যথাতুর শ্রোতা ও পাঠককে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং এই রূপ সান্ত্বনার দ্বারা সাহিত্যের পর্য্যবসান-প্রথার অনুবর্ত্তনের জন্যই ভাবসম্মেলন ঘটানো হইয়াছে।

ঠিক ঐ প্রথার অনুবর্ত্তনের দ্বারা শত শত ব্যথিত চিত্তকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য লখীন্দর ও তাহার ভ্রাতাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া বেহুলার স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কল্পনা। প্রকৃত পক্ষে বেহুলার পতির শবদেহ লইয়া কলার ভেলায় চড়িয়া অনন্তের পথে যাত্রাতেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি। অনিত্যের মায়ায় মুগ্ধ ব্যথিত চিত্তগুলিকে প্রবোধ দেওয়ার জন্যই তাহার প্রত্যাবর্ত্তন।

আর একটা আশ্বাস সকল মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর পর্য্যবসানে জড়িত আছে। আমরা যাহাদের বেদনায় এত ব্যথিত—তাহারাত আমাদের

মত মানুষ নয়। তাহারা দেবতার কার্য্যসিদ্ধির জন্য স্বর্গলোক হইতে অবতীর্ণ, অথবা শাপভ্রষ্ট। দেবতার কার্য্যসিদ্ধি হওয়ার পর পৃথিবীতে তাহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। অতএব তাহাদের জন্য ব্যথায় বিগলিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। শাপভ্রষ্ট নরনারীর মুক্তিলাভে বেদনার কারণ নাই, বরং আনন্দলাভ করিবারই কথা!

মনসার পাঁচালীতে কবিরা বেহুলাকে লখীন্দরের সঙ্গে ফিরাইয়া আনিয়াছেন বটে, কিন্তু আর ঘরসংসার করিতে দেন নাই। বেহুলা সনকাকে দেখা দিয়া স্বামীর সঙ্গে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। নারায়ণদেব এই প্রথার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন, আবার দেবকার্য্য-সিদ্ধির আশ্বাসও একটু স্পষ্টভাবেই দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, পরাতত্ত্বের ইঙ্গিতও আছে। বেহুলা যেন পুত্রহারা কিসা-গোতমীর মত ব্যথাতুরা জননীকে কেবল একটি কথা বলিতে আসিয়াছিলেন—"মা, মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হইয়া কেন শোক করিতেছ? কাহাকেও চিরদিনের জন্য ধরিয়া রাখিবে এ দুরাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর। আমাকে জন্মদান করিয়া তুমি দৈবকার্য্যে সহায়তা করিলে—এই সান্ত্বনা লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে কর।"

মিলনান্ত-পর্য্যবসান যেমন মঙ্গলকাব্যের কবি-প্রথা, যে দেবতার মহিমাকীর্ত্তনের জন্য কাব্য রচিত সেই দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে তেমনি দেবতার চরণতলে শেষ পর্য্যন্ত নতশীর্ষ করাইয়া তাহার দর্প-হরণও তেমনি একটি কবিপ্রথা। কবিরা যে ভাবে চাঁদ সদাগরের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তাহাতে তাহার "জোড়হাতে মনসার করয়ে স্তবন" স্বাভাবিক পরিণতি হইতে পারে না। কেবল কবিপ্রথা-রক্ষার জন্যই যেন কবিরা এই অসঙ্গত ব্যাপারের যোজনা করিয়াছেন।

কবিরা শেষ পর্য্যন্ত চাঁদসদাগরের দ্বারা মনসার পূজা করাইয়া ছাড়িয়াছেন। এজন্য অনেকে কবিদের অপরাধী করিয়াছেন এবং

কাব্যের দিক হইতে তাঁহারা সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপও করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে চাঁদ সদাগরের মত সত্যনিষ্ঠ বীরত্বমণ্ডিত মনুষ্যত্বের আদর্শ আর নাই। এই আদর্শের ক্ষুণ্ণতা দেখিয়া পাঠকমাত্রেই ক্ষুণ্ণ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আর একদিক দিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহাতে সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। চাঁদচরিত্র আদর্শস্থানীয়, কিন্তু অস্বাভাবিক। শৌর্য্যেরও একটা সীমা আছে। মনসার দেবত্বের কাছে চাদের মনুষ্যত্বের শোচনীয় পরাভাবের দিক হইতে দেখিলে চাঁদচরিত্রের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিতে হয়। কিন্তু আর একটি দিক আছে—তাহাও কাব্যেরই উপজীব্য। চাঁদ কেবল মনসার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে নাই—চাঁদের জীবনে কেবল স্বধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মেরই সংঘর্ষ হয় নাই, স্নেহের সঙ্গে স্বকীয় ধর্ম্মাদর্শেরও দারুণ সংগ্রাম হইয়াছে। এই দ্বন্দ্বে যদি শেষ পর্যন্ত স্নেহেরই জয় হইয়া থাকে, তবে কাব্যের দিক হইতে দোষ দেওয়া যায় না। চাঁদের যে পুরুষকার নিয়তির সঙ্গে সমগ্র জীবন ধরিয়া নিদারুণ সংগ্রাম করিয়া দুর্ব্বিষহ নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে—সেই পুরুষকার যদি শেষ পর্যন্ত স্নেহের কাছে পরাজিত হইয়া থাকে, তবে কাব্যের দিক হইতে অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হয় নাই। চাঁদের চরণতলে পড়িয়া সনকা, লখীন্দর, বেহুলা, অন্য ছয় পুত্র ও পুত্রবধূগণ যখন গড়াগড়ি দিয়া প্রার্থনা করিয়া বলিতেছে—"আমাদের জন্য একবার মনসাকে তুমি পুষ্পাঞ্জলি দাও, আমাদের রক্ষা কর।" তখন চাঁদের অন্যোপায় কি ছিল?

তাহা ছাড়া, চাঁদ তাহার পুত্রবধূর অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করিল। যে বেহুলা এমন অসাধ্য সাধন করিল সে যদি দেবতার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়া থাকে—তবে সে প্রতিশ্রুতির

মর্য্যাদারক্ষাও বীরের ধর্ম্ম। চাঁদ যদি পূর্ব্ব মুখে বসিয়া শিব-পূজা করিয়া পশ্চিমমুখী হইয়া বামহস্তে মনসাকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া থাকেন—তবে মনসার জয় হয় নাই, তাঁহার স্নেহবিগলিত পিতৃত্বেরই জয় হইয়াছে। মা মনসা বিজয়ডঙ্কা বাজাইতে পারেন, কিন্তু পিতৃত্বের অন্তরালে অন্তর্য্যামী মনে মনে হাস্যই করিয়াছেন। সাত-পুত্রের মৃত্যুতেও চাঁদ বিচলিত হ'ন নাই—পুনর্জ্জীবিত সাত পুত্রের কাকুতিতেই চাঁদের হৃদয় টলিয়াছে।

তাই মনে হয়, কাব্যের দিক হইতে চাঁদের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই খানেই রাবণচরিত্রের সহিত চাঁদের চরিত্রের পার্থক্য। ভীষ্মের মত মহাবীরের, যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্মসর্ব্বস্ব মহাপুরুষের, রামের মত আদর্শ পুরুষের, বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের মত কঠোর তপস্বীরও দুর্ব্বলতা দেখাইতে মহাকবিগণ ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহাতে আদর্শের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং অবাস্তব ভাবাদর্শে মানবিকতা (Humanism) আরোপিত হইয়াছে। তাহার ফলে ঐ সকল চরিত্র মানুষের রক্তমাংসে জীবন্ত আদর্শ হইয়া উঠিয়াছে এবং কাব্যের পক্ষেও পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে চাঁদ সদাগর একদিন ছদ্ম-বেশিনী মনসার রূপে মুগ্ধ হইয়া পরম সম্পদ মহাজ্ঞান হারাইয়াছিলেন সেই চাঁদ সদাগর বৃদ্ধ বয়সে স্নেহে বিগলিত হইয়া হৃদয়ের অনুরোধে মনসাদেবীর চরণে অর্ঘ্য দিবেন তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। এই পুষ্পাঞ্জলি দান কাব্যের চিরপ্রচলিত মিলনান্ত পর্য্যবসানেরই অঙ্গীভূত ও পরিপোষক। চাঁদের চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা কাহারো মনে নাই—মনে থাকিবেও না—চিরদিন অক্ষয় অমর হইয়া দীপ্যমান থাকিবে তাঁহার মহাসংগ্রাম।

মনসামঙ্গল আগাগোড়াই ভাবাত্মক—ইহার মধ্যে বাস্তবতা অতি

অল্প। ভাবাত্মক কাব্য বলিয়া কবিরা নিরঙ্কুশ ভাবে সর্ব্বত্রই আতিশয্যের প্রশ্রয় দিয়াছেন। ইংরাজিতে ইহাকে বলে Emphasis দেওয়া, বংলায় বলে "রঙ চড়িয়ে বলা।" চণ্ডীমঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল বা শিবমঙ্গল কাব্যে যেমন অনেক স্থলে যথাযথতা রক্ষা করা হইয়াছে—মনসামঙ্গলে তাহাও হয় নাই। মনসার নির্য্যাতন, চাঁদসদাগরের আত্মনিগ্রহ, বেহুলার রূপ, বেহুলার পরীক্ষা, চাঁদের ধনসম্পদ, সর্পবাহিনীর অভিযান, উৎসবের ঘটা ও আড়ম্বর, প্রাকৃতিক উপদ্রবের প্রখরতা, সাঁতালী পর্ব্বতের বাসরঘররচনা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্তই চোখ ঝলসানো গাঢ় বর্ণে অতিরঞ্জিত—সমস্তই ব্যঙ্গার্থের অভিমুখী, রূপকার্থের অভিদ্যোতক।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—চাঁদ পুত্র লখীন্দরের জন্য পাত্রী দেখিতে যাইতেছেন—ষষ্ঠীবর তাহার বর্ণনা দিয়াছেন। এই অভিযান ভারত সম্রাটের পক্ষেও অত্যুক্তি।

সর্ব্ব সৈন্য লইয়া সাধু করিল পয়ান। ধানুকীর ঠাট সব হৈল আগুয়ান।
তেলেঙ্গার ঠাট সভে বত্রিশ হাজার। নর্ত্তক নর্ত্তকী চলে নাই ওর পার।
বেয়াল্লিশ বাদ্য বাজে কাংস্য করতাল। পঞ্চস্বরী বাদ্য বাজে শুনিতে বিশাল।
গজ কান্ধে সওয়ার চলিল লখীন্দর। কনক চৌদল চড়ি চলে সওদাগর।

কবিকঙ্কণের কথায় যে "চাঁদসদাগরের বাহির মহলে সাত মরাই টাকা"—সেই চাঁদসদাগরের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক।

মোট কথা, এই সমস্ত অতিরঞ্জন—প্রাচীনকালের কাব্যের অলঙ্করণ মাত্র—ইহার সহিত যথাযথ সামাজিক অবস্থার কোন মিল নাই—ইহা কবিপ্রথা মাত্র। এই প্রথা প্রাচীন কাব্যগুলিকে বাস্তব স্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবলোকে বা স্বপ্নলোকে মুক্তি দান করিয়াছে। কবিরা যেন বলিতে চাহিয়াছেন—

"কবিভাষ-বিজল্পিতং সখে পরমার্থতয়া ন গৃহ্যতাং বচঃ।"

এই অতিভাষণ কতকটা প্রথার অনুবর্ত্তন, কতকটা কবির নিজস্ব। অতিভাষণের দ্বারা অলঙ্করণ অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের তুলনায় মনসামঙ্গলে একটু বেশি বেশি।

মনসামঙ্গলের অন্যতম লক্ষ্য সতীত্বের মহিমাকীর্ত্তন। বেহুলার মহিমার কাছে মনসার মহিমা ম্লান হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মনসার কৃতিত্বকে বেহুলার সতীত্ব অতিক্রম করিয়া তাহার জয় ঘোষণা করিয়াছে। পদ্মাপুরাণকে মনসামঙ্গল না বলিয়া বেহুলামঙ্গল বলিলেই যেন যথাযথ হয়। ইহাতে দেখানো হইয়াছে দৈবীশক্তিকে এক প্রেমের শক্তি—সতীত্বের শক্তি ছাড়া মানুষের অন্য কোন শক্তি বশীভূত করিতে পারে না। আমাদের পুরাণে, সবিত্রী অনসূয়া ইত্যাদির জীবনে দেখানো হইয়াছে সতীত্বের শক্তি দৈব শক্তিকে পরাস্ত করিতে পারে—অঘটন ঘটাইতে পারে। পদ্মাপুরাণে এই ব্যাপারটায় অতিরিক্ত রঙ চড়ানো হইয়াছে। বেহুলার স্বর্গযাত্রার সমস্ত পথটি দৈবীশক্তির সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামের ও মুহুর্মুহু বিজয়লাভের কাহিনী। সতীত্বের গৌরবকে এত বেশী অত্যুক্তি ও অতিরঞ্জনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা আর কোন কাব্যে দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে শক্তিরই প্রয়োজন হয়। দৈবীশক্তির সহিত মানুষের শক্তি সৃষ্টির আদিকাল হইতে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে—এ সংগ্রামে মানুষ আজো সম্পূর্ণ জয়লাভ করে নাই—কোন কোন স্থলে সে আংশিক ভাবে বিজয়ী হইয়াছে। আজিও সে সংগ্রাম চলিতেছে—কিন্তু সে আজিও মৃত্যুঞ্জয় হয় নাই, মৃত্যুকে সে বশীভূত করিতে পারে নাই। মানুষের সেই শক্তি চাঁদসদাগরে রূপ লাভ করিয়াছে।

মানুষের উপর প্রেমের শক্তির ক্রিয়া অসাধারণ ও দুর্জ্জয় সন্দেহ

নাই। কিন্তু দৈবশক্তির সহিত প্রেমও সংগ্রাম করিতে পারে না। প্রেম তাহাকে শিরোধার্য্য করিয়া লয়। পতির মৃত্যু হইলে সতী তাহার অনুমৃতা হইয়া অথবা চিরজীবন মৃতপতির ধ্যান করিয়াই প্রেমের বিজয় ঘোষণা করে। সে মৃতপতির জীবন ফিরাইতে পারে না।

সতীত্বের আদর্শকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য—সতীধর্ম্মকে সকল ধর্ম্মের উপরে স্থান দিবার জন্য এবং সতীত্বের শক্তিকে অপরাজেয় করিয়া দেখাইবার জন্যই কবিদের এই অঘটনঘটনার পরিকল্পনা। অতিরিক্ত রঙ চড়াইয়া বা emphasis দিয়া ইহাকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখানো কবিদের উদ্দেশ্য। যে সমাজ সতীত্বের আদর্শকে অত্যুজ্জ্বল করিয়া দেখিত—সে সমাজের পক্ষে এই অতিরঞ্জন কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হইত না। যে সমাজ এই আদর্শকে অত বড় করিয়া দেখে না, সে সমাজের লোক উহাকে কাব্যরসসৃষ্টির এবং আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীভূত অভিসন্ধি বলিয়াই মনে করিবে।

সীতার বনগমনে তেজস্বিতা, সাবিত্রীর পতিবরণে তেজস্বিতা, সতীর পিতৃগৃহগমনে তেজস্বিতা ইহ্যাদির কথা পুরাণে আছে। পতির অনুমরণে তেজস্বিতার আদর্শ ভারতের সহস্র সহস্র নারী যুগে যুগে দেখাইয়া আসিয়াছে। পতির মৃতদেহ লইয়া বেহুলার জলযাত্রার যে তেজস্বিতা দেখানো হইয়াছে—তাহাতেও পদ্মাপুরাণের কবি অতিরিক্ত রঙ চড়াইয়াছেন। অনুমরণ ইহার কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার। সদ্যঃ-পরিণীতা একটি বালিকাচরিত্রে যে নির্ভীক তেজস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও একনিষ্ঠতা আরোপ করা হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জনের তুলিকায় সঞ্চারিত। বাঙ্গালী কবি এই ব্যাপারে সংস্কৃত কবিদের অতিক্রম করিয়াছেন। সেকালের পৌরাণিক কাব্যপদ্ধতির পক্ষে ইহা অসঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ মনসামঙ্গল একশ্রেণীর পুরাণ—নামও ইহার

পদ্মাপুরাণ। পুরাণে কিছুই অসম্ভব নয়। মনসামঙ্গলকে পুরাণের আদর্শেই বিচার করিতে হইবে।

সতীর জীবনে যতপ্রকারের পরীক্ষা পুরাণ ও লোকসাহিত্যে প্রচলিত ছিল—পদ্মাপুরাণের কবিগণ তাহাদের প্রায় সমস্তগুলিকে পরপর সাজাইয়া বেহুলার সতীত্বের শক্তিতে emphasis দিয়াছেন।

পুরাণে সতীত্বের তেজ দেখাইবার জন্য স্থলে স্থলে সতীর অভিশাপের অমোঘতা দেখানো হইয়াছে। যেখানে গল্পের জন্য সতীর পরাভব দেখানোর প্রয়োজন হইয়াছে—সেখানে অভিশাপের অবতারণা করা হয় নাই। পদ্মাপুরাণের কবিরা বেহুলার সতীত্বতেজে অভিশাপ দেওয়ার শক্তি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চারিত করিয়াছেন। বেহুলা তাহার জলযাত্রায় আততায়ীদের অভিশাপ দিয়া পরাস্ত করিয়া চলিয়াছে। এক কথায় বেহুলার সতীধর্ম্মকে সর্ব্বজয়ী করিয়া দেখানো হইয়াছে। পাতিব্রত্যের মহিমার বিজয়গীতি জগতের কোন সাহিত্যে ইহার চেয়ে উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষিত হয় নাই। তাই মনে হয় পদ্মাপুরাণকে সাধ্বীপুরাণ, মনসামঙ্গলকে বেহুলামঙ্গল নাম দিলেও দোষ হইত না।

মনসামঙ্গল

২

বিজয়গুপ্ত লিখিয়াছেন—'প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।' কানা হরিদত্তই মনসামঙ্গলের প্রথম কবি; হরিদত্ত পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন—তাঁহার নিবাস কোথায় ছিল জানা যায় না। তাঁহার ভণিতা-দেওয়া কোন কোন গান পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় তাঁহার গানগুলি অন্যের ভণিতায় গায়েনদের মুখে মুখে চলিয়া গিয়াছে। রচনায় ছন্দোবন্ধের পারিপাট্য ও কবিত্ব ছিল না বলিয়া বোধ হয় হরিদত্তের গানগুলি লুপ্ত অথবা অন্য কবির হাতে পরিমার্জিত হইয়াছে। অধিকাংশ মনসামঙ্গল কাব্যে মনসাদেবীর সর্পসজ্জার একটি করিয়া বর্ণনা আছে—বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই বিষয়টি অতিবিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সর্পসজ্জার কবিপ্রথার প্রবর্ত্তক যে হরিদত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কানা হরিদত্তের পর নারায়ণদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। নারায়ণদেবের বাসস্থান ছিল মৈমনসিংহ জেলায়। ইঁহার রচিত মনসামঙ্গল সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে এবং আসামে সমাদৃত হইয়াছিল। নারায়ণদেব আত্ম-পরিচয়ে নিজেকে 'জন্মমুগধ' বলিয়াছেন। লিপিকরের দোষে ইহা 'জন্ম মগধ' হইয়াছে। তাহার ফলে অনেকে তাঁহাকে মগধদেশে চালান করিয়াছেন। মুগধ—মুগ্ধ—মূঢ়। তিনি বিনয়বশতঃ নিজেকে 'জন্মমূঢ়' বলিয়াছেন। এ বিনয় বৈষ্ণব সাধককবি লোচনদাসের মত। বলা বাহুল্য, নারায়ণদেব মহাপ্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন,—সংস্কৃত

পুরাণাদিতে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল। তাঁহার মনসার পাঁচালীতে কবিত্বের সহিত পাণ্ডিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণের মনসা-মঙ্গলে চাঁদ সদাগরের লৌকিক কাহিনীর তুলনায় পৌরাণিক কাহিনীগুলিরই প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

পরবর্ত্তী মনসামঙ্গলের গ্রন্থকারগণ পরম ভক্তিভরে নারায়ণদেবকে স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। কবিত্বের দিক হইতে নারায়ণদেবের কাব্য প্রশস্ত। দ্বিজ বংশীদাস নারায়ণদেবের অনুবর্ত্তী কবি। ইঁহার পদ্মাপুরাণখানি দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামকান্ত চক্রবর্তীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে আছে—

"বংশীদাস নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণের উপাখ্যানে রূপকচ্ছলে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি পরধর্ম্মের অত্যাচার প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত করিয়া তাঁহার পদ্মাপুরাণ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার উপাখ্যানে চণ্ডী হিন্দুধর্ম্মের স্থানীয়া হইয়াছেন। তাঁহার চন্দ্রধর হিন্দুজাতির, সর্পগণ পরজাতির স্থানগ্রহণ করিয়াছেন।"

ফলে, কাব্যখানি Symbolical কাব্যে পরিণত হইয়াছে। এই-ভাবে কাব্যরচনা গতানুগতিক নয়, ইহার পরিকল্পনায় বিশেষতঃ ব্যঞ্জনায় মৌলিকতা আছে। এই মৌলিকতার জন্য কাব্যখানি সাধারণ মঙ্গলকাব্যের স্তর হইতে উন্নততর স্তরে স্থান পাইবার যোগ্য। এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য Symbolism—ইহা কাব্যখানিকে সাহিত্যাংশে উন্নত করিয়াছে, কিন্তু জনসাধারণ এই Symbolism'এর মর্ম্ম বুঝে নাই বলিয়া ইহা বহুল প্রচার লাভ করে নাই।

এই গ্রন্থ খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহার ভাষা অনেকটা আধুনিক। প্রাচীন মনসামঙ্গলগুলিতে পদ্মার সহিত শিবের দ্বন্দ্ব

দেখানো হইয়াছে। চাঁদ সদাগর এই গ্রন্থে শৈব নহেন, চণ্ডীর ভক্ত, শাক্ত। সেজন্য কোন কোন বিশেষজ্ঞ অনুমান করেন—পদ্মার সহিত শিবের দ্বন্দ্বের যুগ অতিবাহিত হইয়া পদ্মার সহিত চণ্ডীর দ্বন্দ্বের যুগ তখন চলিতেছিল। দেবদেবীদের এই সকল দ্বন্দ্বের শেষ পরিণতি অর্বাচীন মঙ্গলকাব্যে সর্বধর্ম্মসমন্বয়ে দাঁড়াইয়াছে। এই সর্বধর্ম-সমন্বয়ের সুর এই কাব্যে ধ্বনিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অর্বাচীন যুগের রামেশ্বরের শিবমঙ্গল কাব্য শিবায়ন ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সঙ্গে সগোত্রতা আছে।

শিবায়নে মহামায়া বাগ্‌দিনীবেশে শিবকে ও অন্নদা মঙ্গলে জরতীবেশে ব্যাসকে ছলনা করিয়াছিলেন। বংশীদাসের কাব্যে ডোমনীবেশে শিবকে তিনি ছলনা করিতেছেন। ছলনার ভাষা ভারতচন্দ্রের মত তেমন শ্লেষাঢ্য না হইলেও এই কাব্যে অনেকটা শ্লিষ্ট। এ সমস্তই কাব্যের অর্বাচীনতার লক্ষণ। * বংশীর কাব্যে শিবায়নের মত রঙ্গরসের ছড়াছড়ি দেখা যায়। ডোমিনীবেশে মহাদেবকে দেবীর ছলনা, দক্ষিণ পাটনের অধিবাসীদের আচার আচরণ বর্ণনা, নারিকেলের জন্মকথা, মহামূল্য বস্ত্র বলিয়া চট বিক্রয় করিয়া

*সপত্নীর কন্যা পদ্মা বা মনসার সংগে চণ্ডীরই বিবাদ। চাঁদ সদাগরকে তিনি স্বপ্নাদেশ করিয়াছেন—যেন চাঁদ মনসার পূজা না করেন। উভয়ের বিবাদের মধ্যে পড়িয়া চাঁদ সদাগরের লাঞ্ছনার এক শেষ হইল। অবশেষে শিব মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। চাঁদ সদাগরের এইরূপ চরিত্র-পরিকল্পনা মংগলকাব্যের মূল আদর্শের বিরোধী। কারণ, প্রাচীন মংগল কাব্যগুলির মধ্যে স্ত্রীদেবতার পূজার বিরুদ্ধেই কাব্যোক্ত নায়কের অভিযান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই গ্রন্থে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইয়াছে।

নির্ব্বোধ রাজাকে প্রবঞ্চনা—ইত্যাদি অংশে সেকালের উপযোগী রঙ্গ-কৌতুকের আতিশয্য যথেষ্ট দৃষ্ট হয়।

দ্বিজ বংশীদাসের রচনা সহজ, সরল ও সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য হইতে মুক্ত। বাঙ্গালীর প্রাণের কথা অকপটভাবে তাঁহার রচনায় অভিব্যক্ত। এইজন্য বংশীর কাব্য আজিও মৈমনসিং অঞ্চলে সমাদৃত। এই অঞ্চলের হিন্দুদের সর্ব্ববিধ মঙ্গল অনুষ্ঠানে বংশীর গান গীত হয়। বংশীদাসকে এ অঞ্চলের লোকেরা ভক্ত সাধক বলিয়াই মনে করে। তাহার ফলে তাঁহার গ্রন্থ ধর্ম্মগ্রন্থের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এমন উপাখ্যানও তাঁহার নামের সঙ্গে বিজড়িত হইয়াছে যে—দুর্দান্ত দস্যু তাঁহার গান শুনিয়া তাঁহার ভক্ত অনুচর হইয়া পড়িয়াছিল। বংশীদাসের কাব্যের মা-মনসা বংশীর সাধকজীবনের প্রসাদে স্বয়ং জগদম্বার দৈবী মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। ভক্ত যে তাঁহার উপাস্যের মহিমা নিজের সাধনার দ্বারা কতদূর বাড়াইতে পারেন, তাহার নিদর্শন লাভ করিতে হইলে বংশীর কাব্যের প্রতিপত্তি ও এই অঞ্চলের লোকদের ধর্ম্মভাবের প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে হয়।

বংশী চাঁদসদাগরের চরিত্রের অটলোন্নত মর্যাদা অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করিয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের চাঁদ সদাগরের তুলনায় বংশীর চাঁদ সদাগরের চরিত্র বহু গুণে মর্য্যাদাসম্পন্ন। সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্যবোধ বংশীর কাব্যে যেরূপ লক্ষিত হয় সেরূপ কাহারো কাব্যে নয়।

বংশীদাসের বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই চন্দ্রাবতী 'বংশীদাস ও দস্যু কেনারামের কাহিনীরও' রচয়িত্রী। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রাবতী বংশীদাসকে কাব্যরচনায় সহায়তা করিতেন এবং তাঁহার মনসামঙ্গলের কোন কোন্ অংশ চন্দ্রাবতীরই রচনা।

প্রাচীন মনসামঙ্গলকারগণের মধ্যে বিপ্রদাস পিপ্‌লাইএর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহার নিবাস পশ্চিমবঙ্গে বসিরহাট অঞ্চলে বাদুড়িয়া বড়গা। ইহার কাব্যে চাঁদসদাগরের বাণিজ্যপথের যে বর্ণনা আছে—তাহা নিতান্ত কাল্পনিক নয়। বহুপরিচিত স্থানের নাম তাহাতে আছে—এমন কি কলিকাতার নামও পাওয়া যায়। সকল মনসামঙ্গল কাব্যে অল্পবিস্তর নিরঞ্জন ধর্ম্মপূজাতন্ত্রের প্রভাব আছে—বিপ্রদাসের কাব্যে এই প্রভাব খুব বেশী। শিব হাতে জাপ্যমাল্য লইয়া ব্রহ্মমন্ত্রে বেদোচ্চারণ করিয়া—

নানা পুষ্প লৈয়া করে অনাদ্যের পূজা করে
একচিত্তে ধ্যায় অনুক্ষণ।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল বিভূতিভূষণ ভাল
বল্লুকা দেখিতে নিরঞ্জন।

আর নিরঞ্জন ও শিবের স্তবে তুষ্ট হইয়া—

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ডকমণ্ডলু করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর
হরের আশ্রমে দরশন।

এইরূপ ভাবে ধর্ম্মনিরঞ্জনের উপাস্যতার কথা এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

বীরভূম জেলায় বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টি-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপাল শিবের গলার হাড়ের মালার নিদানবার্ত্তা বলিয়াছেন—

শতেকবার মরে দুর্গা জীয়ে শতেকবার।
শতেকখানি হাড়ে শিব গলাতে পড়ে হাড়॥

অধিকাংশ মনসামঙ্গলকাব্য পূর্ব্ববঙ্গে রচিত ও প্রচারিত

হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে অতিরিক্ত সর্পভীতিই ইহার কারণ। সর্পভীতি পশ্চিমবঙ্গেও কম নয়। সেজন্য পশ্চিম বঙ্গেও মনসাপূজার ব্যবস্থা চিরদিনই আছে এবং মনসামঙ্গলগান পশ্চিম বঙ্গেও গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত তাহার সাক্ষী।

মনসামঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বরিশালের ফুল্লশ্রী-গ্রামনিবাসী বিজয় গুপ্ত। ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে—ইঁহার রচিত দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজের দীর্ঘত্রিপদী ছন্দের মত পাদক-মাত্রিক (Syllabic)। ইনি লোচনদাসের মত ধামালী ছন্দেও কোন কোন কবিতা রচনা করিয়াছেন অতএব এই দুই ছন্দের প্রবর্ত্তনার গৌরব বিজয়গুপ্তকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত রূপ বিজয়গুপ্তের রচনায় ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বিজয়গুপ্তের কাব্যে বহুস্থলে রঙ্গরস ও হাস্যপরিহাসের লীলা আছে। বিশেষতঃ হরগৌরীর কোন্দলে যথেষ্ট রঙ্গকৌতুক আছে। দেবদেবীর চবিত্রগুলিকে সাধারণ মানুষের সংসারে নামাইয়া আনাইয়া কবি দেবলীলাকে মানবলীলায় পরিণত করিয়াছেন। ফলে, বাংলার সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন অতি চমৎকার ফুটিয়াছে বিজয়গুপ্তের কাব্যে। ইহা ছাড়া, বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে বিজয়গুপ্তের কাব্যের মূল আখ্যানভাগেরও সংযোগ আছে।

চাঁদ সদাগরের কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের কাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের কাহিনীনির্দিষ্ট স্থলগুলির সহিত বরিশালের কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। সেজন্য গ্রন্থের ভৌগোলিক পরিচয়গুলি যথাযথ নয়—অনেক-স্থলে কাল্পনিক!

বিজয়গুপ্তের নামে যে পুঁথি এখন প্রচলিত—সেই পুঁথির

অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশ সেন ও ডাঃ সুকুমার সেন দুইজনেই সন্দিহান।

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"বিজয়গুপ্তের ছদ্মবেশে জয়গোপালগণ ঐতিহাসিক মরীচিকা উৎপাদন করিতেছেন। এই গাঢ়তম সমুদ্র হইতে রত্ন উঠাইতে যাইয়া অনেক সময় শঙ্খ লইয়া ফিরিতে হয়। পূর্ব্ববর্তি কাব্যগুলির ন্যায় বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

ডাঃ সুকুমার সেন বলেন—"বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহা প্রায় সবই গায়কের পুঁথি বলিয়া তাহাতে অনেক কবির রচনার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আর এই সকল পুঁথির কোনটাই বিশেষ প্রাচীন নয়। অধিকাংশ পদগুলিতে বিজয়গুপ্তের ভণিতা আছে বটে, কিন্তু এই ভণিতা সর্ব্বত্র অকৃত্রিম নয়।"

বিজয়গুপ্ত চাঁদসদাগর-চরিত্রের মহত্ত্ব ও গৌরব শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করেন নাই। ভাববৈচিত্র্য, দৃশ্যবৈচিত্র্য ও রস-বৈচিত্র্যের দিক হইতে বিজয়গুপ্তের কাব্যের যথেষ্ট মূল্য আছে।

ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনসামঙ্গলকাব্য-রচয়িতা। ইঁহার উপনাম কেতকাদাস। কেতকা মনসারই একটি নাম। ইনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দামোদরনদের তীরবর্ত্তী খাঁখড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এই অঞ্চলের অন্যান্য কবিদের মত তাঁহাদেরই প্রথা অনুসরণে গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিয়াছেন। ইঁহার রচনায় বর্দ্ধমান অঞ্চলের তৎকালীন সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিচয় পাওয়া যায় পশ্চিম রাঢ় অঞ্চলে আজিও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান গান গ্রামে গ্রামে গীত হয়। ক্ষেমানন্দের কাব্যের চিত্রগুলি সুরচিত।

কবি সর্পের দেহে বিষের পাশেই মধুরও আবিষ্কার করিয়াছেন। কালীনাগ বাসরঘরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নির্দ্দয়া অধীশ্বরীর নির্দ্দেশ পালন করিতে। কিন্তু সাপেরও হৃদয় আছে, তাই প্রভুধর্ম্ম ও বিধিধর্ম্মের সহিত তাহার স্বকীয় হৃদয়ধর্ম্মের একটা দ্বন্দ্ব ঘটিতেছে। এই দ্বন্দ্বটি সার্ব্বজনীন—ইহাতে universal appeal আছে। এ জগতে বহু ক্ষেত্রেই এই দ্বন্দ্ব ঘটে।

বাসরে সামাঞে নাগ ভাবে মনে মন।
লখিন্দরের রূপ দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥
লখাই চাইতে বেহুলা বড়ই সুন্দর।
রূপে গুণে আলা করে লোহার বাসর ॥
চান্দ সদাগরপুত বড়ই সুন্দর।
শিরে কেশ বানিয়ার হাড়িয়া চামর।

এই রূপ দেখিয়া আততায়ীর অনেকটা বিস অশ্রুজলে পরিণত হইল। এটুকু রসজ্ঞগণের উপভোগ্য। এই কবি চান্দের চরিত্রের মাহাত্ম্য যেভাবে শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন—বিজয়গুপ্তের মত শ্রেষ্ঠ কবিও তেমনটি রাখিতে পারেন নাই।

ডাক্তার সুকুমার সেন—একজন দ্বিতীয় ক্ষেমানন্দের কথা বলিয়াছেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। বন্ধুবর এই পাঁচালী হইতে স্থলে স্থলে উৎকলন করিয়াছেন তাঁহার রচিত সাহিত্যের ইতিহাসে। তাহা হইতেই পাঁচালীর রচনার উৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে।

২য় ক্ষেমানন্দের রচনায় পয়ারের পংক্তি অনেকস্থলে ধামালী ছন্দের রূপ ধরিয়াছে। যেমন—

চাঁদ—উচকপালী বেহুলা লো চিরুণ-চিরুণ-দাঁতী।
বাসরে খাইলে সোয়ামী না পোহাল্য রাতি।

বেহুলা—ভাল হৈল চান্দ শ্বশুর দোষ দিলে মোরে।
আর ছয় পুত্র তোমার কোন রোগে মরে।

জীবন মৈত্রের পদ্মাপুরাণ একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। বগুড়া জেলায় করতোয়া তীরে ইঁহার জন্ম। অতএব এই পদ্মাপুরাণখানি উত্তর বঙ্গের সম্পদ। জীবন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন—সেজন্য তাঁহার রচনায় সংস্কৃতের প্রভাব খুব বেশি। তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। মনসামঙ্গলের মত লোকসাহিত্য বিদ্বৎ-সমাজের জন্য নয়,—জনসাধারণের জন্য। ইহাতে পাণ্ডিত্যের ও আলংকারিকতার উপদ্রব থাকিলে ইহা জনবল্লভ হইতে পারে না। সেজন্য জীবনের পদ্মাপুরাণের ততটা প্রচার হয় নাই। জীবনের পদ্মাপুরাণের অনেক স্থলে মূলকাহিনীর সহিত মিল নাই। কবি মূল-কাহিনীর সঙ্গে অনেক নূতন নূতন কাহিনীর সংযোগ করিয়াছেন। তাহাতে কবি অনেকস্থলে গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করিয়া মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন। কিন্তু রচনাভঙ্গীর প্রাঞ্জলতার অভাবে এবং উপকরণ-বাহুল্যের জন্য তাঁহার রচনা রসঘন ও জনবল্লভ হইতে পারে নাই।

অতি অল্প কবিরই সম্পূর্ণাঙ্গ মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে। গ্রামে গ্রামে গাওনার সুবিধার জন্য গায়কগণ নানা কবির রচনা একত্র গুম্ফিত করিয়া পালা রচনা করিয়া লইত। সেই গুলিই চলিত,—মূল কাব্যগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িত। বাংলাদেশ সংহিতার দেশ। এদেশে যেমন রামায়ণ-সংহিতা হইয়াছে, মহাভারত-সংহিতা হইয়াছে পদাবলীর সংহিতা কীর্ত্তনের পালাহিসাবে গ্রথিত হইয়াছে, তেমনি মনসামঙ্গল কাব্যের সংহিতাও রচিত হইয়াছে। শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন,—মনসামঙ্গলের এই সংহিতাকে লোকে বাইশা

বলিত। বাইশার অর্থ বাইশজন কবির রচনাসংগ্রহ। অবশ্য এই বাইশের অর্থ বহু। বাংলার প্রত্যেক অংশে সেই অঞ্চলের কবিদের রচনা সংগ্রহ করিয়া সেই অঞ্চলে গাওনার জন্য এই বাইশা রচনা করা হইত।

বাইশা রচনার জন্য এই মূলকাব্যগুলি যেমন একদিকে অনাদৃত হইয়াছে—অন্যদিকে ভণিতাতেও গোল বাধিয়াছে। গায়নগণ ইচ্ছামত ও সুবিধামত যে কোন রচনায় যে কোন কবির ভণিতা বসাইয়া দিয়াছে। অনেক সময় বড় কবির রচনায় নিজেদের ভণিতাও যুক্ত করিয়াছে। একই কাহিনী লইয়া সকলেই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন —রচনার ভঙ্গী ও ধারাও প্রায় একই প্রকারের, তাঁহাদের হৃদয়াবেগের প্রকাশও গতানুগতিক। ফলে, মনসামঙ্গলকে বহু কবির রচনার সম্মিলনে গুম্ফিত একখানি মহাকাব্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

সমগ্র বঙ্গদেশই সর্পসংকুল। এখন যেমন ম্যালেরিয়া বঙ্গদেশে মহাশত্রু, প্রাচীন কালে সর্পই ছিল তেমনি মহাশত্রু। সেজন্য সমগ্র দেশে সর্পদেবতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। সর্পদেবতা প্রকৃতির আর একটি রুদ্রাণী মূর্তি। বাংলার পদ্মা প্রকৃতির একটি রুদ্ররূপ। আশ্চর্যের বিষয়, সর্পদেবতা মনসারও একটি নাম পদ্মা! বাঙালী বুঝিয়াছিল, প্রকৃতির এই রুদ্রাণী মূর্তির সহিত সংগ্রাম অসম্ভব। পূজার দ্বারা তাহাকে প্রসন্ন করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। এইভাবে দেশে মনসা পূজার প্রচলন হইয়াছে। পূজার সঙ্গে সঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি। চান্দ সদাগরের মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীটি এই কাব্যের উপজীব্য হইয়াছে বলিয়াই এই কাব্য এত বেশী জনবল্লভ হইতে পারিয়াছে। এই কাহিনীটির জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। বাঙালীর পারিবারিক জীবনের সঙ্গে এই কাহিনীটির গভীর সংযোগ আছে বলিয়া ইহা বাঙালীর

হৃদয় হরণ করিয়াছে। ফলে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় মনসামঙ্গলই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। এমন কি, মনসাপূজা ও মনসামঙ্গলগান বঙ্গদেশে প্রধান ধর্ম্মাচরণের অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছিল —বাঙ্গালী প্রকৃত ধর্ম্মের কথা যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল। বৃন্দাবন দাস তাই তাঁহার কাব্যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে মনসাপূজার প্রাদুর্ভাব ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে। মনসামঙ্গল কাব্য উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা রচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহার প্রধান শ্রোতা ও উপভোক্তা ছিল নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা। পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ও কীর্ত্তনের বহুল প্রচারের ফলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্য হইতে মনসামঙ্গলের প্রভাব একটু একটু করিয়া অপসারিত হইয়াছে উচ্চতর সাহিত্যরসের আস্বাদ পাইয়া তাহাদের আর মনসামঙ্গলের প্রতি অনুরাগ থাকিল না। মনসামঙ্গলের গান আজিও নিম্নশ্রেণীব হিন্দুবা শুনিয়া আনন্দলাভ করে। মনসা-পূজা, মনসার মেলা, মল্লপ্রতিযোগিতা, সাপুড়িয়াদের সাপখেলা ইত্যাদির সহিত মনসার ভাসান গান উৎসবের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া আছে।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে মনসামঙ্গলের প্রভাব বহুল পরিমাণে সঞ্চারিত হইয়াছে। চাঁদের তেজস্বী চরিত্রের আদর্শ, বেহুলার অলোকসামান্য সতীত্বের আদর্শ, সতীত্বের কঠোর পরীক্ষা, আদর্শের জন্য আত্মনিগ্রহ-ভোগ, দেবদেবীর মায়াময় ছলনাবৈচিত্র্য, বণিকসমাজের ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও প্রভাব সঞ্চার করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বাংলার বহির্বাণিজ্যের যে স্বপ্নকল্পনা ও কবিপদ্ধতি মনসামঙ্গলে বর্ণিত হইয়াছে—চণ্ডীমঙ্গলে তাহাই অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের কাহিনীটির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে শ্রীমান্ আশুতোষ ভট্টাচার্য যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বেশ সুচিন্তিত। তাঁহার আলোচনা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে, এ কাহিনীর ঐতিহাসিক কঙ্কালটি লখীন্দরের কঙ্কালের মত রূপে রসে মেদে মজ্জায় লালিত্যে ও লাবণ্যে এমনই পীনকলেবর লাভ করিয়াছে যে সেটিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। মনসামঙ্গলের উপাদান গোড়া হইতেই অবাস্তব, অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত। উপাদানগুলির অধিকাংশ আহৃত পৌরাণিক চিত্তের স্বপ্নলোক ও কল্পলোক হইতে। ইহা দেবদেবী, নরনারী, সর্প ও অন্যান্য ইতর জীবের সম্মিলিত একটা অভিনব পৌরাণিক ব্যাপার। হনুমানও রামায়ণের শাখা হইতে লম্ফ দিয়া এই পুরাণের শাখায় আশ্রয় লইয়াছেন। এই কাব্যে স্বর্গ ও মর্ত্তের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই—স্বর্গ ও মর্ত্য বঙ্গোপসাগরের এপার ওপারের মত। চাঁদ সদাগর সত্যশিবের ভক্ত না হইলে হয়ত সেখানে বাণিজ্য করিতে গিয়া ইন্দ্রকে পাটের কাপড় বিক্রয় করিয়া আসিতে পারিত। স্বয়ং ধন্বন্তরি ওঝারূপে এখানে বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ ও পুত্রবধূ উষাই লখীন্দর ও বেহুলা—ইহারা শাপভ্রষ্ট। সর্পেরা কাঁদে, হাসে, কথা কয়—আততায়িতার নবনব হেতুর সন্ধান করে। বেহুলার অলৌকিক শক্তির সীমা নাই—সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদীরও এরূপ অলৌকিক শক্তি ছিল না। এই সমস্তের মধ্যে ঐতিহাসিকতার সন্ধান বৃথা। মনসামঙ্গলের যে পদ্মাপুরাণ নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহা যথাযথই বটে। ঐতিহাসিকতার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে পদ্মপুরাণে আর পদ্মাপুরাণে বিশেষ প্রভেদ নাই।

সংস্কৃত পুরাণেরও কতক অংশ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—লৌকিক অংশ কতকটা পুরাণের; কতকটা রূপকথার সগোত্র। সেইজন্যই

পৌরাণিক অংশের সহিত ইহার মিলনসামঞ্জস্য ঘটিতে পারিয়াছে। বঙ্গদেশে যে সকল রূপকথা প্রচলিত ছিল তাহাদের প্রভাব মনসা-মঙ্গলের লৌকিক অংশকে প্রভাবিত করিয়াছে— উপাদানও যোগাইয়াছে। রাজপুত্র, সাধুপুত্র, ও কোটালপুত্রের দেশবিদেশে অভিযান ও দূরদূরান্তে বাণিজ্যযাত্রাই চান্দসদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় কতকটা অর্ধবাস্তব রূপ লাভ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। বেহুলার যে সকল অসাধারণ শক্তির কথা কাব্যে আছে, তাহাও যেন রূপকথা হইতেই সঞ্চারিত। বেহুলার জলযাত্রায় যে সকল বিপৎপাত, বিভীষিকা ও পরীক্ষার কথা আছে, সেগুলিও রূপকথারই অঙ্গ। নেতার ব্যাঘ্ররূপ ধারণ, চিলের আকার ধারণ, পুত্রকে মারিয়া ফেলিয়া পুনরায় জীবনদান ইত্যাদি রূপকথারই উপজীব্য। সাঁতালী পর্বতের বিচিত্র বাসরঘর রূপকথার রাজ্যেই সম্ভব! এইরূপ রূপকথার টুকরা টুকরা অংশ ইহার মধ্যে অনেক। বেহুলার জননী ও শাশুড়ী রূপকথার জননীর সুরেই বিলাপ ও আক্ষেপ করিয়াছে। বেহুলার ভাইরা রূপকথার ভাইদের ভঙ্গীতেই বেহুলাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছে। চান্দসদাগর যে-সকল দেশে ঘুরিয়াছে সে সকল দেশ ভূভারতে নাই—রূপকথার ভূগোলে আছে। সিদ্ধ করা ধান, হলুদের এবং ভাজা কলাইএর অংকুরোদ্গম, বিনা অগ্নিতে রন্ধন, লোহার কলাই সিদ্ধ করা ইত্যাদির কথা রূপ-কথাতেই প্রচলিত ছিল।

তবু সন্ধান করিলে কোন ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যাইবে না তাহা বলা যায় না। রূপকথার কাহিনীর মূলেও দুই একটি ঐতিহাসিক নরনারীর অস্তিত্ব থাকে। শ্রীমান আশুতোষ যেটুকু ঐতিহাসিকতার ইঙ্গিত দিয়াছেন সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে আমাদেরও দ্বিধা নাই।

বণিক জাতির মধ্যে বোধহয় চন্দ্রধর বা চান্দ সদাগর নামে একজন

বিখ্যাত সাধু বা শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি 'ধনে জনে রূপে শীলে' একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি সম্ভবতঃ বণিকসমাজের নেতা ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি শৈব ছিলেন এবং স্ত্রীদেবতার পূজার বিরোধী ছিলেন। মনসারূপা মহামায়ার উপাসক ব্রাহ্মণ্যসমাজ সম্ভবতঃ সমগ্র বণিকসমাজকে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে দীক্ষিত করিতে চাহিয়াছিল। চন্দ্রধরকে দীক্ষিত করিতে পারিলে সমগ্র বণিকসমাজের সাম্প্রদায়িক মতের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিবে এই বিশ্বাসে বোধহয় চন্দ্রধরকে বশে আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল। স্বাধীনচেতা সদাগরের ধর্মবিশ্বাস অটল ছিল—কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে না পারিয়া বোধ হয় তাহার উপর অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল।

কোন শিবভক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তির পুত্র সম্ভবতঃ বাসরঘরেই সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ হারায়। এই আকস্মিক মৃত্যু মনসার কোপের ফল বলিয়া লোকে সম্ভবতঃ মনে করিয়াছিল। এই শিবভক্ত, চান্দসদাগরও হইতে পারেন—অন্য কোন শৈব সাধুও হইতে পারেন। কাহিনীতে এই ঘটনার সঙ্গে চান্দ সদাগরের সংযোগ ঘটিয়াও যাইতে পারে।

মানুষের অত্যাচারে না হইলেও দৈবদুর্ঘনাতেও চান্দের দশাবিপর্য্যয় হইতে পারে। বাণিজ্যতরীগুলি দৈবদুর্বিপাকে ডুবিয়াও যাইতে পারে।

কোন ব্যক্তি সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণ হারাইলে পূর্বকালে তাহাকে দগ্ধ করা হইত না—কলার ভেলায় চাপাইয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইত। নদীর দুই ধারের কোন না কোন গ্রামের ওঝার চোখে পড়িলে সে হয়ত মন্ত্রবলে বাঁচাইয়া দিতে পারে, সেই ভরসায় এই প্রথা অবলম্বিত হইত। এমনও হইতে পারে এইরূপ একটি যুবকের সংজ্ঞাহীন দেহ জলে ভাসাইয়া দিলে তাহার সাধ্বী পত্নী নদীর তীরে তীরে শবের অনুসরণ

করিয়া কোন ওঝার সাহায্যে স্বামীকে বাঁচাইয়া ফিরিয়াছিল। এই সাধ্বী যুবতী ঐ শিবভক্ত সাধুর পুত্রবধূও হইতে পারেন—চান্দ সদাগরের পুত্রবধূও হইতে পারেন, অথবা তিনটি কথাবস্তু হয়ত পৃথক পৃথক, একসংগে জুড়িয়া একটি কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। তারপর সেই কাহিনী পুষ্পিত পল্লবিত হইয়া বেহুলার কাহিনীর রূপ ধরিয়া থাকিবে। বাসর ঘরেই বিবাহরাত্রেই যে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তির পুত্রকে সর্প দংশন করিয়াছিল ইহা হয়ত ঐতিহাসিক সত্য। কারণ, বঙ্গদেশে ফুলশয্যার পূর্ব রাত্রিকে কালরাত্রি বলা হয় এবং আজিও বরবধূকে একত্র বাস করিতে দেওয়া হয় না। এইরূপ একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। মন্ত্রৌষধের দ্বারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ওঝারা বাঁচাইতেপারিত—ইহা আজিও অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন ক্ষেত্রে আরোগ্যালাভের কথা শোনা যায়। তাহা যদি সত্য না-ও হয়—সাহিত্যে মানুষের অসাধ্য কার্য্যকে সাধ্য বলিয়া বর্ণনা করিবার প্রথা চিরদিনই প্রচলিত আছে। বাঙ্গালী চিরদিনই অদৃষ্ট গণনায় বিশ্বাস-পরায়ণ। জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনাটা বোধ হয় কাব্যের অলংকার হিসাবেই আসিয়াছে।

মনসামঙ্গলের চরিত্রগুলির নামকরণ এক এক গ্রন্থে এক এক রূপ। ভৌগোলিক সংস্থান ও বেষ্টনীর বর্ণনা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। চাঁদসদাগর ও বেহুলা ঐতিহাসিক চরিত্র বলিয়াই মনে হয়। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে চান্দের এইভাবে উল্লেখ আছে।

যেবা চান্দ সদাগর তাঁর নাতি আছে বর চাঁপা নগরীতে তার পুরী।
তা-সনে করিয়া কাজ সভাতে পাইবে লাজ জাতিনাশ কৈল বিষহরী।

* * *

কুলশীলধন মানে চান্দ নহে বাঁকা
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা।

*　　　*　　　*

চম্পাইনগরবাসী চান্দ সদাগর।
ছয় রাঁড় ল'য়ে তার ঘর স্বতন্তর।
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা।
সর্বাঙ্গে ধবল হৈল অতি পাপমনা।

*　　　*　　　*

চান্দ সদাগরে দিল সাজানিয়া দোলা।

ভারতচন্দ্রও চান্দ সদাগরকে ইতিহাসোক্ত ব্যক্তি মনে করিতেন।

রহে চম্পানগর ডাহিনে কতদূর।
চান্দ বেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর॥
জানু মানু ছিল যাহে মনসার দাস।
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈল বাস॥ (অন্নদামঙ্গল)

চান্দ কোথাকার শ্রেষ্ঠী বণিকদের নেতা ছিলেন বলা বড়ই কঠিন। বঙ্গদেশের বহুস্থল চান্দের নিবাসস্থল বলিয়া দাবী করে। কাহিনীর উক্ত ভৌগোলিক পরিচয় হইতে মনে হয়; চান্দের বাড়ী গন্ধবণিকগণের দ্বারা অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলেই ছিল। শ্রীমান আশুতোষ বলেন—চান্দের বাড়ী সম্ভবতঃ বিহার অঞ্চলেই ছিল। এ বিষয়ে তিনি অনেকগুলি যুক্তি দেখাইয়াছেন। মনসামঙ্গলে যে সকল আচার-অনুষ্ঠানের কথা আছে সেগুলি কিন্তু বাঙালীর নিজস্ব। সেগুলিকে পরবর্তী সংযোগ ও লোকসাহিত্যসুলভ আভরণ মনে করিলেও চলে। কিন্তু কাহিনীটির কল ধারার সঙ্গে যেরূপ বিবিধ জলধারার সংযোগ এবং যেরূপ বাণিজ্যসম্ভারের পরিচয়, তাহাতে পূর্ববঙ্গ না হউক, অন্ততঃ পশ্চিম বঙ্গই চান্দের লীলাভূমি

বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া ইহা সর্পসংকুল দেশের কাহিনী। বিহার কি বাংলার মত সর্পসংকুল? সাঁতালী পাহাড় কি সাঁওতালী পাহাড়?

শ্রীমান আশুতোষ মনসা ও শিবের যে দ্বন্দ্বের কাহিনী দাক্ষিণাপথের লোকসাহিত্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় এই কাহিনী দ্রাবিড় প্রভাবান্বিত বাংলাদেশেও হয়ত প্রচলিত ছিল—অথবা দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছে। কাহিনী এক দেশ হইতে অন্যদেশে অতি দ্রুতগতিতে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কি করিয়া দেশান্তরে আসিয়া পড়ে, তাহা সীমান্ত প্রদেশের লোকেরাই ভাল করিয়া বলিতে পারে। তবে দুটি জিনিস আমাদের চিত্তকে দক্ষিণাভিমুখী করে। একটি—নারীর নির্ভীক স্বাধীনতা এবং দেবালয়ে দেবদাসীর নৃত্যের অনুরূপ বেহুলার দেবসভায় নৃত্য। এ দুটি বঙ্গদেশের নিজস্ব নয়।

কবিকংকণ, চান্দ সদাগরকে বাঙালী ঐতিহাসিক চরিত্র স্থির করিয়া ধনপতি সদাগরের সামসময়িক করিয়া তুলিয়াছেন। কাব্যোক্ত ব্যক্তিকেই কবিকংকণ ঐতিহাসিকতা দিয়াছেন—এইরূপই মনে হয়।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে মনে হয়—মনসামঙ্গলের কাহিনীতে বঙ্গ, বিহার ও দক্ষিণাপথ তিন স্থানেরই দান আছে। কোন কোন কবিও আপন গ্রন্থে বিহারকেই চান্দের লীলাভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—কাজেই বিহারের কথা একেবারে উপেক্ষা করা যায় না।

বাঙালী কবিরা কাব্যের নূতন কথাবস্তুর উদ্ভাবন করিতে পারিতেন না। একটি কোন কথাবস্তু বা কাহিনী পাইলেই দলে দলে কবিরা যুগে যুগে তাহাই অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিতেন। কেহ বলিতেন—দেবীর স্বপ্নাদেশ হইয়াছে, কেহ বলিতেন পূর্বের কবিদের কাব্য

সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, কেহ বলিতেন প্রতিপালকের আদেশে লিখিতেছেন। মোটকথা—নূতন কাহিনী তাঁহাদের মাথায় আসিত না, আর আসিলেই বা কি? তাহা যদি কোন দেবতার মহিমা প্রচারের সহিত জড়িত না হয় তবে ত দেশে সমাদৃত হইবে না। দেবতার মহিমাপ্রচারের সহিত জড়িত কোন কাহিনী যদি দেশে পূর্ব হইতে প্রচলিত থাকে এবং তাহা গাহিয়া প্রচার করিবার জন্য গায়ন-সম্প্রদায় যদি প্রস্তুত থাকে, তবে নূতন করিয়া সেই কাহিনী অবলম্বনে কাব্যরচনাই স্বাভাবিক। এজন্য কবিদের অভিনব কথাবস্তু উদ্ভাবন বা আহরণের অবসর ও প্রবৃত্তিও হয় নাই।কোন গ্রন্থেরই যখন মুদ্রিত হইবার সুযোগ ছিল না—এবং এক অঞ্চলের গায়কসম্প্রদায় যখন সহজে অন্য অঞ্চলে যাতায়াত করিতে পারিত না—তখন প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচিত হইবারই কথা। এক একখানি গ্রন্থের এক একটি জেলা বা পরগনা ছিল শাসনভূমি বা বিহারক্ষেত্র। এজন্যও একটি কাহিনী লইয়া দেশে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

চান্দ সদাগরের কাহিনী সর্পসংকুল, মনসাভয়গ্রস্ত সমগ্র বঙ্গদেশেই সহজে প্রচার লাভ করিয়াছিল। সেজন্য বঙ্গের প্রত্যেক অঞ্চলেই মনসামঙ্গলের কবির উদ্ভব হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গবাসীর একাধারে রসতৃষ্ণা ও ধর্মতৃষ্ণা দুইই নিবৃত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সমগ্র দেশে মনসা পূজার পদ্ধতির সহিত ইহার প্রচারের সংযোগ আছে। মনসা পূজার আকর্ষণে ইহার প্রচার হইয়াছে, আবার ইহার প্রচারের ফলে মনসাপূজার প্রথাও দেশময় ছড়াইয়া গিয়াছে।

নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল

নারায়ণদেবকে মনসামঙ্গলের আদিকবি কাণা হরি দত্তের পরবর্ত্তী এবং বিজয় গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া মনে করা হয়। নারায়ণ দেবের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের নামগন্ধও নাই। সেজন্য ইঁহাকে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া ধরার পোষকতাই হয়। নারায়ণদেবের যে পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার কতটা প্রাচীন, কতটা অপ্রাচীন, কতটা কবির নিজস্ব, কতটা গায়নরা প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে তাহা বলা শক্ত। তবে ইহার অনেক অংশ ভিন্ন ভিন্ন কবির ভণিতা-যুক্ত। এই কবিগণের রচনা—নারায়ণের মূলকাব্যে গায়েনদের দ্বারা সংযোজিত হইয়াছে—তাহা ভণিতা দেখিয়াই বুঝা যায়।

নারায়ণদেবের কাব্যে লক্ষপতি ধনপতির কথা এবং বীরসিংহ ও মাধব ভাটের নামোল্লেখ আছে—তাহাতে বুঝা যায় ধনপতির কাহিনী ও বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ও কবির পরিচিত ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রিত পুঁথিখানি খণ্ডিত। বহু অপরিহার্য্য অঙ্গ ইহাতে নাই। যেমন—চান্দ সদাগরের উদ্যানবাটিকাধ্বংস, ধন্বন্তরি বধ, চান্দের মহাজ্ঞানহরণ, ছয় পুত্রের মৃত্যু, ঝালুমালুর পূজা, হাসন-হোসেনের পালা ইত্যাদি। এইগুলির বর্ণনা পুঁথি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি চিরপ্রচলিত পদ্ধতিও বাদ গিয়াছে, যেমন—বারোমাস্যা-বর্ণন, কাঁচলি চিত্রণ।

এই পুঁথিতে প্রথমে লখীন্দরের জন্ম হইতে তাহার মৃত্যুর কথা

বিবৃত করিয়া পরে চান্দসদাগরের বাণিজ্য ও নিগ্রহের কথা বলা হইয়াছে তারপর লখীন্দরের পুনর্জীবনের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্বর্গারোহণের কথা বিবৃত হইয়াছে। মনসামঙ্গলের প্রচলিত পৌর্ব্বাপর্য্য ইহাতে রক্ষিত হয় নাই।

এই কাব্যে পৌরাণিক অংশ সংক্ষিপ্ত। মনসাদেবীর মোটামুটি উপাখ্যান দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও মহাভারত হইতে লইয়া কবি নিজের ভাবে কিছু যোগবিয়োগ করিয়া রূপান্তরিত করিয়াছেন। নারায়ণদেবের কাব্যে মুসলমানজাতির কোন প্রসঙ্গ নাই—আরবী, পার্শী শব্দের প্রভৃত প্রয়োগও তাই নাই। মুসলমানের অত্যাচারের কোন কাহিনীও নাই, তবে একস্থলে মুসলমানের অত্যাচারের সম্ভাবনার উল্লেখ আছে।

কবি অনেক স্থলে রঙ্গরসিকতা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে তাহা জমে নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন—নারায়ণ দেবের কাব্যে বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে, একথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

চান্দের বাণিজ্যযাত্রা হইতে সেকালের ইতিহাস কিছুই পাওয়া যায় না। সিংহলের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে একটা কাব্যপদ্ধতি (Poetic Convention) রূপে চলিয়া আসিতেছে। সিংহল এবং দক্ষিণ দেশ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায় না। কবির কাছে সমুদ্র কতকগুলি দহে খণ্ডিত নদীধারামাত্র। দক্ষিণদেশের যে সকল কুপ্রথার কথা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে সেগুলি সম্পূর্ণ কল্পিত। দক্ষিণ পাটনের রাজা ও রাজ অমাত্যদের নিতান্ত নির্ব্বোধ বানানো হইয়াছে —তাহাও কবির রঙ্গরসসৃষ্টির একটা কৌশলমাত্র। চান্দ সদাগরের

ডিঙ্গাগুলি যেন একএকটি জাহাজ। চান্দ তাহাতে হাতী-ঘোড়াও লইয়া যাইতেছে। বাণিজ্যদ্রব্য-বিনিময়ে বিন্দুমাত্র বাস্তবতা বা যথাযথতা নাই। কবি দক্ষিণদেশে কি কি জন্মে তাহা জানিতেনও না। সে দেশ যে নারিকেল বা গুবাকেরই দেশ, তাহাও তিনি জানিতেন না। যে সকল দ্রব্য দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় কিছুতেই তাজা থাকিতে পারে না—সেই সব জিনিসেই কবি ডিঙ্গা ভরিয়াছেন। কবির কাছে দক্ষিণদেশ রাক্ষস ও বর্ব্বরের দেশ এবং সে দেশে সোনা, হীরা, মুক্তা, প্রবালের ছড়াছড়ি।

সেকালের শ্রেষ্ঠী-সমাজেরও সত্য পরিচয় এই কাব্যে পাওয়া যায় না। চান্দের ঐশ্বর্য্যের কথা এতই অতিরঞ্জিত যে, বাস্তবতার সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ নাই। এদিকে তাহার অনাড়ম্বর পারিবারিক জীবনের সহিত চান্দ কিংবা সাহে সদাগরের ঐশ্বর্য্যের কোন সামঞ্জস্য হয় না।

চান্দের বিড়ম্বনার মধ্যে দুই-একটি বাস্তবচিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু লাথি, কিল, চাপড়ের অতিবৃষ্টিতে সেগুলিও ছিন্নভিন্ন। বেহুলার পরীক্ষার মধ্যে বিন্দুমাত্র বাস্তবতা নাই। সেকালে সতীত্বের এইরূপ পরীক্ষা সমাজে প্রচলিত ছিল—কেহ যদি মনে করেন, তবে তিনি ঐতিহাসিক যুগের লোক নহেন—তিনি পৌরাণিক যুগের লোক—তিনি 'লোহার চালের ভাত' খাইয়া থাকেন। এই সকল পরীক্ষা সমাজে কোন দিন প্রচলিত থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু সাহিত্যে চিরকালই প্রচলিত আছে। এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে অনিরুদ্ধ-জায়া উষা—কোন সদাগরের কন্যা বা পুত্রবধূ কোন কালেই পারে না। বেহুলার রন্ধনে না থাকিলেও একমাত্র তারকারাণীর রন্ধনে বাস্তবতা আছে। সেকালের লোকেরা কি কি খাইত, তাহার পরিচয় এই রন্ধনে পাওয়া যায়।

একমাত্র ইতিহাস এই কাব্যে যাহা পাওয়া যায়—তাহা দেশে চণ্ডী-পূজক-সম্প্রদায়ের সহিত মনসাপূজকসম্প্রদায়ের দ্বন্দ্বের।

অন্যান্য কবিরা যেমন দেবদেবীর স্তব বন্দনার দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন—নারায়ণ তাহা করেন নাই। সম্ভবতঃ মুদ্রিত পুঁথিতে স্তব-বন্দনাগুলি বাদ গিয়াছে। যে ভাবে পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে—তাহাতে মনে হয়, কাব্যের প্রথমাংশ হারাইয়া গিয়াছে।

পুষ্পবাড়ীর পথে পারের ঘাটে চণ্ডীর ডোম্‌নীবেশে শিবের ছলনার প্রসঙ্গটিকে নারায়ণদেব বিজয়গুপ্তের চেয়ে রসালো করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চণ্ডী পারের কড়ি চাহিতেছেন—'শুক্‌নো হাড়ের ঝুলি লাড়ি ত্রিপুরারি। ঝলমলি লাড়ি বলে হের আছে কড়ি॥' ডোম্‌নীকে শিব আলিঙ্গন চাহিলেন। ডোম্‌নী বলিতেছে :—

বালকের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দেখি পাকা বেল॥
আমি ভর যুবতী তুমি জিস্ত বুড়া।
দন্ত-পড়া বাঘে যেন কামড়ায় মুড়া॥

অবশ্য এ রসিকতা কবির মৌলিক নয়। কবি এই প্রসঙ্গে রস-রঙ্গের ছড়াছড়ি করিয়া সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য কবিরা এতদূর অগ্রসর হন নাই।

ডোম্‌নী, কুচনী বা বাগ্‌দিনী বেশে চণ্ডী শিবকে ছলনা করিতেছেন—বিবিধ মঙ্গলকাব্যে এ কথা আছে। ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ নীচজাতীয় নারীগণের সাহচর্য্যে সাধনা করিতেন—তাঁহারা ইন্দ্রিয়াতীতা বা স্পর্শাতীতা নৈরাত্মাদেবীকে অস্পৃশ্যা ডোম্‌নীরূপে পরিকল্পিত করিতেন—চর্য্যাপদে এ কথার বার বার উল্লেখ আছে। স্পৃশ্যা-স্পৃশ্যবিচার, গম্যাগম্য-বিচার প্রচলিত সংস্কারের অঙ্গীভূত। সর্ব্ব সংস্কার-

মুক্তির মধ্যে এ সমস্ত বিচার নাই। মহাদেবই সর্বসংস্কারমুক্তির মূর্ত্তিমান প্রতীক্। তাই মহাদেবকে অবলম্বন করিয়া এই সকল গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রাচীন বৌদ্ধতন্ত্রে সংস্কারমুক্তিকেই নির্বাণ বলা হইয়াছে। অর্বাচীন বৌদ্ধতন্ত্র এই সংস্কারের ব্যাখ্যা পরিবর্ত্তন করিয়া সর্ববিধ সামাজিক ও সাংসারিক সংস্কার হইতে মুক্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। ইহার ফলে খাদ্যাখাদ্যবিচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্যবিচার, গম্যাগম্যবিচার ইত্যাদি সমস্তই বর্জনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধ সংস্কার-মুক্তিবাদের প্রভাবেই শিবের ডোম্‌নী, কোচনী, বাগ্দিনী ইত্যাদির সহিত সংসর্গের কথা মঙ্গলকাব্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

নারায়ণদেবের মতে নেতার জন্ম মহাদেবের নেত্রজল হইতে নয়, তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে। নেতের বসন দিয়া শিব ঘাম মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম নেতা। জন্মিয়াই পূর্ণ যুবতী হইয়া নেতা রথে চড়িয়া কৈলাসে যাইবার পথে অষ্টাবক্রমুনিকে উপহাস করিয়াছিল। তাঁহার অভিশাপে নেতা কনিষ্ঠার দাসী, স্বামিহীনা এবং দেবতাদের রজকী হইয়াই থাকিল। নেত্রবতী নেত্র-জল-জাতা হইলেও একটু পৌরাণিক গন্ধ থাকিত—নেতের বসনের ঘর্ম হইতে জন্মিয়া নেতা খাঁটি বাঙালী ঘরের কন্যা হইয়া পড়িয়াছে।

নারায়ণদেব চণ্ডী ও পদ্মার বিবাদ সংক্ষেপেই সারিয়াছেন—তবে চণ্ডী যে কুশ দিয়া পদ্মার এক চোখ কাণা করিয়া দিয়াছিলেন, একথা বোধহয় তিনিই প্রথম বলিয়াছেন। ইহা হইতেই পদ্মা 'কাণী' আখ্যা পাইয়াছেন চান্দ সদাগরের মুখে।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে মনসার বিবাহ, পুত্রলাভ, স্বামিকর্ত্তৃক পরিত্যাগ, সমুদ্রমন্থন ইত্যাদি কাহিনী নাই।

লখীন্দর-বেহুলার বিবাহচিত্রে কবি এয়ো ও বৃদ্ধাদের লইয়া কিছু রঙ্গ রসিকতা করিয়াছেন—তাহা আদৌ জমে নাই, কুরুচিরই পরিচায়ক হইয়াছে। নারায়ণদেব বেহুলা-লখীন্দরকে বিবাহ-রাত্রিতে লোহার বাসরঘরে পাঠান নাই। ফুলশয্যার রাত্রিটা দুইজনের প্রেমালাপেই কাটিল। এমন কি—

বেহুলার বদনে চুম্ব দিলেন প্রচুর।
লখাইএর গালে বেহুলার সিঁথের সিন্দুর॥

কবি কালীনাগীর আস্ফালনটা নিদর্শনা অলঙ্কারের মালিকার সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন—

হেন পদ্মা সনে কেবা করিয়াছে বাদ।
শৃগাল হইয়া সিংহ জিনিবারে সাধ॥
ব্রহ্মার হাতের কমণ্ডলু কেবা লবে হরি।
যমরাজার কালদণ্ড কে করিবে চুরি॥
কে চাহে পৃথিবীখান ফেলাতে উড়াইয়া।
আঁচলেতে অগ্নি বান্ধে মরিতে পুড়িয়া॥
কাহার পানে একদৃষ্টে দেখিলেক শনি।
কেবা খণ্ডাইতে পারে বিধাতার বাণী॥
ভেক হৈয়া চাহিল জিনিতে বিষধর।
মাকড় হইয়া চাইল জিনিতে সাগর॥

সনকার দুঃখকাহিনীর মধ্যে তাহার বিরহের দুর্দ্দৈবের উল্লেখ মাত্র আছে। ধন্বন্তরি বধ, হাসন-হাসেনের পূজা, বা 'ঝালোমালোর পূজার জন্য পৃথক্ উপাখ্যান নাই—মনসার খেদের মধ্যেই উল্লেখ আছে।

বাসরঘরের ছিদ্রের উল্লেখ আছে কিন্তু কি ভাবে এই ছিদ্র রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল—সে কথা নাই।

বাসরঘরে লখীন্দর বেহুলাকে ভাত রাঁধিয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু বেহুলা বলিল- -"এখানে রাঁধিবার সুযোগ নাই। দুধ, মর্ত্তমান কলা ও ইক্ষুরস আছে—তাহাই খাও।" লখীন্দর তাহাই খাইলেন।

নারায়ণদেব বাসরঘরে যাহা স্বাভাবিক তাহারই বর্ণনা করিয়াছেন, তৃষিত লখীন্দর বেহুলার যৌবন মাধুরী সম্ভোগ করিতে চায়। বেহুলা কাকুতিমিনতি করিয়া বলিল—"কালরাত্রি কোন কর্ম্ম নহেক উচিত।" ইহাতেও লখীন্দরের চিত্ত স্থির হইল না। তখন বেহুলা নাগভয়ের উল্লেখ করিয়া 'রাগ'-জয় করিলেন। মৃত্যুভয় জন্মিলে কামভাব স্বভাবতই প্রশমিত হয়।

মরণকথা শুনিয়া লখাইএর গদগদ মন।
অলস হইয়া পাশে করিল শয়ন॥

লখীন্দরের রূপ দেখিয়া বিশেষতঃ নববরবধূকে ঘুমে অচেতন দেখিয়া কালীনাগীর চিত্ত বিগলিত হইল। সে ডাকিতে লাগিল—"উঠ লখাই বাণুয়া নন্দন।"

'জাগ জাগ অয়ে ত্বরা পাইক প্রহরী।
কাল নাগ মার তোরা মাথায় দিয়া বাড়ি॥
জাগ জাগ অয়ে ত্বরা নেউল এক্ষণ।
আঁধারে বুলিয়া নাগ কররে ভক্ষণ॥

কালীনাগী কিছুতেই দংশন করিতে না পারিয়া মনসার কাছে ফিরিয়া গিয়া অক্ষমতা জানাইল। শুনিয়া—'কান্দে পদ্মা অঝোর নয়ানী।' কাজেই কালীনাগী ফিরিয়া আসিয়া বাসরঘরে প্রবেশ করিল এবং এবার দংশন করিয়া ফিরিয়া গেল। কবি দেখাইলেন—সর্পীরও দয়া আছে,—দেবীর দয়া নাই। কালীনাগী দংশন করিয়া ঘরেই থাকিল, পলাইল না। বেহুলা জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাটারি

দিয়া কাটিতে গেল। কালী বলিল—"সতি, আমার দোষ নাই। মনসার আদেশে আমাকে এ কাজ করিতে হইয়াছে।" আশ্চর্য্যের বিষয়—

নাগের ক্রন্দন শুনি মনে গলে সুন্দরী,
যত্নে নাগ না করিল বন্দী।

এত বড় দুর্ঘটনার সময়েও বেহুলা অপ্রকৃতিস্থা হয় নাই। বেহুলার আক্ষেপ মর্ম্মস্পর্শী। সে রাধিকার ভাষায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—

হার কর ছারখার কঙ্কণ কর চুর।
মুছিয়া ফেলাও আজি সিঁথের সিন্দূর॥

নারায়ণদেবের কাব্যের বাসরগৃহ-প্রসঙ্গটার বর্ণনা অন্যান্য কবিদের কাব্য হইতে কতকটা স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে কবির কিছু নিজস্বতা আছে।

চান্দ সদাগর লখীন্দরের মৃত্যুতে হাহাকার করিল না। সে আস্ফালন করিয়া বলিল—

যদি কালীর লাইগ পামু একবার।
কাটিয়া শুধিব আমি মরা পুত্রের ধার॥
ডাল মুল গেল মোর মধ্য হৈল সার।
অখনে কালীর সঙ্গে চাপিয়া করোঁ বাদ॥
চণ্ডীর ইঙ্গিত পাইয়া কাটিমু পদ্মারে।
এহি কোপে শিব যেন পাছে কাটে মোরে॥

চান্দের চরিত্রের তেজস্বিতার চরম ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। শেষে সে বলিল—

যে করিমু কাণীরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসৃষ্ট পুত্র ভাসাও নিয়া গাঙ্গে॥

বেহুলার খেদের মধ্যে একটি অতি সাধারণ কথা আছে—"তুমি

আমার হাতের রান্না ভাত খাইতে চাইয়াছিলে—রাঁধিয়া খাওয়াইতে পাইলাম না—

আলস্থে কলার প্রভু করাসু তোমারে।"

তাহা ছাড়া, আলিঙ্গন চাহিলে—

"কামদেবে হরিয়া লইল দ্বারে পাইয়া রতি।" বেহুলার এই আক্ষেপে বাস্তবনিষ্ঠতা আছে। বেহুলা পতির মৃতদেহ লইয়া কলার ভেলায় জলযাত্রা করিল। নারায়ণদেব বিপদ্ আপদ প্রলোভন পরীক্ষার কথা খুব বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন—এই সমস্ত বিবরণে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে সর্ব্বত্র মিল নাই। তারপর নেতার সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় উপস্থিত হইল। এখানে বেহুলাকে নৃত্য করিতে হইল। দেবসভাকে মুগ্ধ করিবার জন্য বেহুলাকে প্রাণপণে সাজিতেও হইল। বেহারিয়া ছান্দে সে সোনার চাকিবলী পরিল, গলায় শতেশ্বরী হার, দশ আঙ্গুলে মাণিক্য অঙ্গুরী, বাহুতে চাবিয়ানি তাড়, নাসিকা দুয়ারে রক্তগজমতি পরিল, আভের কাঁকুই দিয়া সিঁথি পাট করিল, দুই নয়নে সুরঙ্গ সুরমা আঁকিল, পারিজাত ফুল দিয়া খোপা বাঁধিল,—

পঞ্চবর্ণে থোপ দিয়া খোঁপা বান্ধিল সুন্দর।
মধু মাসে দেখি যেন কামটঙ্গী ঘর॥

তারপর বিচিত্র কাঁচলী দিয়া বক্ষ আচ্ছাদন করিল। মঙ্গল কাব্যে যে কাঁচলীর কারুচিত্রবর্ণনা অপরিহার্য্য,—কবি এইখানেই তাহার বর্ণনা সারিয়াছেন।

রুনু ঝুনু বাদ্য করে নূপুর চরণে।
সংসার মোহিত করে বেউলার সাজনে॥

শিবের সমক্ষে বেহুলা নৃত্য করিবে। নারদ চণ্ডিকার কাছে গিয়া কোন্দল বাধাইবার ফন্দী করিলেন।

হরষিতে চলিলা নারদ মুনিবর।
কন্দলের ঝুলি লইয়া কান্ধের উপর ॥
যে দিন নারদ মুনি কোন্দল না পায়।
ঘরের রুয়া খসাইয়া দোকাটি বাজায় ॥
যে দিন নারদ মুনি কোন্দলের না পায় আশ।
সেই দিন মহামুনি করে উপবাস ॥

নারদ চণ্ডীকে বলিল—

এক নটী আনিয়াছে দেব মহেশ্বর।
সুখে বসি নৃত্য দেখে বাহির দখল ॥
নটীর সঙ্গে প্রীত কৈল ভাঙ্গড় শিবাই।
তার কড়াটেকের রূপ তোমার ঠাঞি নাই ॥

এই বলিয়া নারদ চণ্ডীকে ক্ষেপাইয়া দিল। চণ্ডী দেবসভায় আসিয়া শিবকে যার-পর-নাই গালাগালি কবিলেন—তারপর বেহুলার পানে চাহিয়া বলিলেন—

কহ, তুষ্ট হইবা পাইলে কোন্ ধন?

বেহুলা সুযোগ বুঝিয়া স্বামীর পুনর্জ্জীবন প্রার্থনা করিল। তবু শিবের আজ্ঞায় বেহুলাকে নৃত্য করিতে হইল। শিব তুষ্ট হইয়া মনসাকে ডাক দিলেন—মনসা জ্বরের অজুহাতে আসিতে চাহিল না।

শেষে নারদের পীড়াপীড়িতে মনসাকে আসিতে হইল। দেব-সভায় চণ্ডীর সঙ্গে মনসার তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। শিব এদিকে বেহুলার রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—বেহুলা,

যদি আলিঙ্গন দাও তুমি—
জিয়াইব লখীন্দর, পাঠাইয়া দিব ঘর,
সদয় হইয়া তবে আমি।

মনে রাখিতে হইবে এ শিব কুমারসম্ভবের শিব নহেন।

চণ্ডী কুপিত হইয়া নির্লজ্জ স্বামীকে বলিলেন--

"শোকে মরে কাঁচা রাঁড়ী তার সনে চতুরালি
তপস্বী তোরে বলে কোন্ ছারে।"

শিব লজ্জা পাইয়া বলিলেন—"না—না, বেহুলা, অনিরুদ্ধ ও বাণের সম্পর্কে নাতনী কিনা—তাই 'চব্বূট' করিতেছিলাম।" যাহাই হউক শেষ পর্য্যন্ত শিব ও চণ্ডীর অনুরোধে মনসা লখীন্দরকে বাঁচাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন। লখীন্দর বাঁচিয়া উঠিল—কিন্তু তাহার দেহে বসন নাই।

লখাই ন্যাঙ্‌টা দুঃখিত সভার ভিতর।
এই সমে গাইনে পাইল প্রসাদ বিস্তর॥

লখীন্দরের অঙ্গে বস্ত্র নাই বলিয়া গায়েন সকলের কাছে বস্ত্র চাহিত—তখন একে একে অনেকে বস্ত্র দিত। এই বস্ত্রগুলি গায়েনের প্রাপ্য হইত।

নারায়ণদেব লখীন্দরের পুনর্জীবনের পর চান্দ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার বর্ণনা করিয়াছেন। সকল মঙ্গলকাব্যের বাণিজ্যযাত্রার কথা একরূপ। কবিদের ভৌগোলিক ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাবই এইগুলিতে সূচিত হয়। নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলেও সমুদ্রের প্রকৃত-রূপ ফুটে নাই—সমুদ্র নানা দহে খণ্ডিত নদী ছাড়া আর কিছুই নয়। চণ্ডীমঙ্গলের মত এখানেও জোঁকদহ, কড়িদহ, কাঁকড়াদহ ইত্যাদি পথে পড়িতেছে এবং সদাগর মামুলি উপায়ে আত্মরক্ষা করিতেছে। অন্যান্য মনসামঙ্গলের মত এই কাব্যেও চান্দ মনসার মায়াসৃষ্ট পূজামন্দির ধ্বংস করিয়া অপরাধের ভরা পূর্ণ করিতেছে।

দক্ষিণদেশ সম্বন্ধে আমাদের কবিদের ধারণা অদ্ভুত। এ দেশের

রীতিনীতি কত জঘন্য তাহার বর্ণনা অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের মত ইহাতেও আছে। কোন দেশে—

কনিষ্ঠ ভায়ের বধূ ভাসুরকে মারে টালা।
চান্দ বলে ঐ রাজ্যে যাইব কোন শালা॥

কোন রাজ্যে আবার—ধান্যের চাউল কিছু নাহি পায় তত। জন্মাবধি খায় তারা মরিচের ভাত॥

ইহা ছাড়া—অনেক কুপ্রথার কথা আছে—যাহা সম্পূর্ণ কবি-কল্পিত, সত্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।

নারায়ণদেব চান্দকে বিভীষণের লঙ্কারাজ্যেও আনিয়াছেন। এই লঙ্কাপুরী সম্বন্ধে কবি রামায়ণ পড়িয়া যাহা ধারণা করিয়াছেন কাব্যে সেই কথাই বলিয়াছেন। সকল স্থানই সুবর্ণময়, মৃত্তিকা কোথাও নাই। লোকগুলিও রাক্ষস। চান্দ রামচন্দ্রের অযোধ্যা হইতে আসিতেছেন, বলিয়া রক্ষা পাইলেন—অধিকন্তু পঞ্চরত্ন উপহার পাইলেন।

তারপর চান্দ দক্ষিণ পাটনে গেলেন। এখানে কবি সুপারি ও নারিকেল লইয়া কিছু রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে দেশে নারিকেল ও গুয়া পথে ঘাটে ছড়াছড়ি, সেই দেশে কবি এই ফল দুটি একেবারে অজ্ঞাত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। গুয়া খাইয়া কোটাল ত মূর্চ্ছিতই হইল—তাহাতে তত ক্ষতি ছিল না। মনসার ছলনায় নারিকেল লইয়া বাধিল বিভ্রাট, রাজা মনসার দেওয়া স্বপ্নে জানিলেন, নারিকেল বিষফল। চান্দ রাজাকে নারিকেল উপহার দিলে একজন বৃদ্ধ লোককে খাইতে দেওয়া হইল। সে শুক্‌না নারিকেলে দাঁত বসাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও মূর্চ্ছিত হইল। সে মরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া চান্দকে বন্দী করা হইল—বৃদ্ধ দ্বারীর পত্নী আসিয়া—

'চান্দের বুকেতে গিয়া মারিলেক লাথি।'

অযথা চান্দের অপমান করা ছাড়া ইহা কিছুই নয়। চান্দ কারাগারে বন্দী হইল। কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় মুক্ত হইল। চণ্ডীর কৃপার প্রয়োজন ছিল না। কারণ, চান্দের একজন সহচর নারিকেল ও ডাব কাটিয়া রাজা ও রাজ-অনুচরগণকে খাওয়াইয়া প্রমাণ করিল—নারিকেল বিষফল নয়। এই ব্যাপার লইয়া কাব্যের অঙ্গপুষ্টি বালকোচিত—বালকগণেরই উপভোগ্য। নারিকেল-প্রসঙ্গ বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণেও আছে, কিন্তু তাহার জন্য চান্দকে লাথি খাইতে অথবা বন্দী হইতে হয় নাই।

বাণিজ্যদ্রব্যবিনিময়-ব্যাপারে নারায়ণ কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। বণিকপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতে এইরূপ বদলের একটা করিয়া তালিকা আছে। ইহাতেও তালিকা আছে—কিন্তু তালিকাটি বেশ সরস করিয়া রচিত। এই শ্রেণীর সকল কাব্যেই বাঙ্গালী সদাগরকে বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত এবং অন্য দেশের রাজা ও রাজ-অমাত্যদের অতি নির্ব্বোধ বানানো হইয়াছে। নারায়ণদেব চান্দ সাধুকে এতই অসাধু বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন যে, শঠতার দ্বারা অর্জ্জিত ধনে পূর্ণ তাহার চৌদ্দ ডিঙ্গা সাগরের তলে ডুবিলেও কোন দুঃখ হয় না। যত তুচ্ছ তরী-তরকারীর বদলে চান্দ ঝুড়িঝুড়ি মুক্তাপ্রবাল লইয়া নৌকা বোঝাই করিল। দেশের রাজাকে এতই নির্ব্বোধ বানানো হইতেছে যে সে ওলকচুর বদলে সমান তৌলে হীরা দিতেছে। অবশ্য এ রাজা সেই স্বপ্ন-পুরীর-রাজা—যে পুরীর পথের কাঁকরই হীরা-মুক্তা।

কাব্যের এই অংশ কাব্যরসানুগও নয়, পুরাণানুগও নয়, নীতি-শাস্ত্রানুগও নয়—বালরঞ্জন রূপকথার সগোত্র।

নারায়ণদেবের কাব্যে চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবাইবার আজ্ঞা শিব ও চণ্ডীর কাছ হইতে মনসা অতি সহজেই পাইতেছেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে এত সহজ হয় নাই। শিবের কাছে ঐহিক ধনের

মূল্য না হয় বিশেষ কিছু নাই—চণ্ডী এত সহজে রাজী হইবেন কেন? মনসাকে চণ্ডী দুই চোখে দেখিতে পারেন না। ডিঙ্গা ডুবাইতে হনুমানকেই স্মরণ করার প্রথা, নারায়ণদেব ভীমকেও আনিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যে ডিঙ্গা ডুবাইতে নদ-নদীর সাহায্য লওয়া হয়। কারণ, সমুদ্রের জলের গভীরতা ডিঙ্গা ডুবাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়—এইরূপ কল্পনা করা হয়। এই সূত্রে ভারতবর্ষের নদীগুলির একটি তালিকা দেওয়া হয়।

ডিঙ্গা ডুবাইবার আগে মনসা আর একবার চান্দকে বলিলেন—এখনও আমাকে উপাস্যা দেবী বলিয়া স্বীকার কর।

"নিকটে আসিয়া কাণী নাও তুমি ফুল পানি"—বলিয়া চান্দ অনুরোধ করিল।

মনসা নিকটে আসিলে চান্দ হিন্তালের লাঠি লইয়া তাড়া করিল।

ডিঙ্গাবুড়ানোর পর মনসার অবিশ্রান্ত পীড়ন আরম্ভ হইল। মানসিক বেদনা দিয়া যখন চান্দকে জব্দ করা গেল না—তখন শারীরিক পীড়ন আরম্ভ হইল। সব মনসামঙ্গলেই এই পীড়নের কথা আছে। নারায়ণদেবের কাব্যে এই পীড়নের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। দৈহিক পীড়ন অপেক্ষা অবমাননাই বেশী। কবি প্রাণ ভরিয়া চান্দের লাঞ্ছনা—ততোধিক অপমান করিয়াছেন। নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলে চান্দ একজন মহাপুরুষ বা মহাবীর নহেন—'আবুধিয়' একগুঁয়ে, একরোখা, জেদী, গোঙার-গোবিন্দ লোকমাত্র। কবির উপাস্যা দেবী মনসা। সেই মনসাকে যে 'লঘুজাতি কাণী' বলিয়া ঘৃণা করে—কবির কোন দরদ বা শ্রদ্ধা সে পাইতে পারে না। তাই চান্দের লাঞ্ছনা ও পীড়নে কবি কোথাও বেদনা বোধ করেন নাই—সর্ব্বত্রই আনন্দ পাইয়াছেন এবং চান্দের অবমাননা লইয়া রঙ্গ-রসেরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

চান্দের অপমান ও লাঞ্ছনার চরম দেখানো হইয়াছে চান্দ যখন প্রায় দিগম্বর বেশে শীর্ণ-জীর্ণ ক্ষুধার্ত্ত দেহে চোরের মত উদ্যানের পথে নিজের গৃহে প্রবেশ করিতেছে। নিজেরই দাসী-চাকর এবং নিজেরই পুত্র-বধূদের দ্বারা অস্বাভাবিকরূপ লাঞ্ছনার কথা বর্ণনা করিয়া কবি আনন্দ পাইয়াছেন—

গোটা মাথা ভিতর কৈল শরীর বাহিরে।
দুর্ব্বলী মারিল লাথি গর্দ্দান উপরে॥
বাপ বাপ করি পড়ে চান্দ অচেতন হৈয়া।
ছয় পুত্রবধূ তারে ধরিল আসিয়া॥
কেহ মারে লাথি চড় কেহ ঝাঁটার বাড়ি।
আগুন হাতে লইয়া কেহ পোড়ায় গোঁফ দাড়ি॥
কেহ চুলে ধরি মারে নেয় ছেঁচুড়িয়া।
বজ্রলাথি মারে কেহ বুকেতে বসিয়া॥
বান্দী বেটী বসিলেক সদাগরের বুকে।
বারে বারে লাথি মারে গালে আর মুখে॥
বড় ঘরের দাসী বসিতে জানে ভাও।
চান্দর মুখের উপর মেলিল দুই পাও॥
তাহা দেখিয়া নারীগণ পিক দিয়া হাসে।
দুই পায়ের গোড়া চান্দের মুখের পরে ঘসে॥
পায়ের ধূলা ঝাড়ে বেটী শিরের উপরে।
কল্যাণ কল্যাণ বলি আশীর্ব্বাদ করে॥

কৃত্তিবাসের নিজস্ব রামায়ণে পাতালে বলিরাজগৃহে রাবণের লাঞ্ছনাও এত নিদারুণ নয়। সদাগর বলিল—

টাকার চাউল যখন কাঠাব উপরে,
পাঁচ কাহন কড়ি দিয়ে কিনেছি তোমারে।
এখন বান্দী বেটি তুই আমার এই লাঞ্ছনা করিলি।

সেকালের লোক ইহাতে ব্যথা পাইয়াছিল কিনা জানি না। একালের পাঠকের পক্ষে ইহা অসহ্য, যেমন অভব্য, তেমনি অশ্লীল।

কবি আরো জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন—চান্দ ও লখীন্দরের মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া। চান্দ গৃহে ফিরিয়াছেন—পিতা-পুত্রে পরিচয় নাই—পিতা লখীন্দরকে দেখিয়া (সে তখন বারো বৎসরের বালকমাত্র) ভাবিল, পর-পুরুষ কেন তাহার অন্দরে। লখাইও চান্দকে মাতার শয্যায় দেখিয়া মাতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান। বিজয় গুপ্তও ইহা লইয়া একটু রসিকতা করিয়াছেন—কিন্তু নারায়ণদেব ইহা লইয়া একটা গজকচ্ছপের যুদ্ধের অবতারণা করিয়া অত্যন্ত ইতর রুচির পরিচয় দিয়াছেন। পিতাপুত্রের যে পরিচয় সর্ব্বপ্রথমেই হইবার কথা—তাহা হইল মস্ত বড় লড়াইয়ের পর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নারায়ণদেবের চান্দ গোঁয়ার-গোবিন্দ। চৌদ্দ ডিঙ্গায় যে সকল লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছিল—তাহাদের আত্মীয়স্বজন যখন চান্দের কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল—

ক্রন্দন শুনিয়া চান্দ দন্ত কড়মড়ি,
যত লোক কান্দে মারে দোহাতিয়া বাড়ি।

লখীন্দরের কন্যা-নির্ব্বাচন-প্রসঙ্গে মাধব ভাটের সঙ্গে চান্দের কথোপকথনটি বেশ সুরচিত। "মাধব ভাট কাঞ্চননগরেতে বৈসে। পূর্ব্বে বীরসিংহ রাজা আছিল সেহি দেশে।" বিদ্যাসুন্দরের যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহাতে বীরসিংহ রাজার সভায় মাধবভাটের অবস্থিতির কথা ছিল। ভারতচন্দ্র এই নাম দুইটি গ্রহণ করিয়াছেন।

বিধবা-যোগিনীসাজে বেহুলাকে মনসার ছলনা ও অভিশাপের প্রসঙ্গটি সকল মনসামঙ্গলেই আছে—নারায়ণের রচিত প্রসঙ্গটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বেহুলা চরিত্রের তেজস্বিতা চমৎকার ফুটিয়াছে।

বেহুলা চৌদ্দ ডিঙ্গা ও চান্দের সাত পুত্র লইয়া ফিরিয়া আসিয়া একেবারে আপনাদের বাড়ীতে উঠিল না। অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যের মত এই কাব্যেও বেহুলা ডোম্‌নীবেশে শ্বশুরগৃহে আসিল। এই ডোম্‌নীবেশ ধারণেরও একটা সার্থকতা আছে। যে বেহুলা মৃতদেহ আগুলিয়া এতকাল রহিল সে ডোম্‌নী ছাড়া আর কি? যে মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে খেয়া পারাপার করিল সে ডোম্‌নী ছাড়া আর কি? বেচিবার জন্য সে আনিল বিচনী (ব্যজনী)। এই বিচনীর উপরে বহুবিধ চিত্র অঙ্কিত। তন্মধ্যে একটি চিত্রে মনসার চরণ অঙ্কিত আছে—তাহা দেখিয়া চান্দসদাগর একেবারে অগ্নিশর্ম্মা। বিচনীর উপর লাথি মারিতে লাগিল—থুথু দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বেহুলা পলাইল। সে পলাইয়া সনকার কাছে গেল। সনকা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বেহুলা বলিল—'সে ধর্ম্মের ঘাটে খেয়া দেয়—সে ডোম্‌নী'। সনকার সন্দেহ হইল—বেহুলা যে নিদর্শনগুলি রাখিয়া গিয়াছিল সনকা দেখিল সেগুলি প্রকাশ পাইতেছে। বুঝিল তাহার পুত্র লখীন্দরকে বাঁচাইয়া বেহুলা ফিরিয়াছে। তখন সনকা বেহুলার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বেহুলা বলিল—সকলকে ফিরাইয়া আনিয়াছি—বিষহরীর পূজা না করিলে আমি সকলকে লইয়া আবার ফিরিয়া যাইব। চান্দ বলিল—আমার ধনজনে কাজ নাই, আমি কাণীর পূজা করিব না। বেহুলা ঘাটে ফিরিয়া গিয়া ডিঙ্গার মুখ ঘুরাইল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

কোপ করি বিহুলাএ ডিঙ্গা বাহি যাএ
প্রজাগণ গিয়া তবে চান্দেরে বুঝাএ।

সনকা বলিল—'মরিব মরিব আমি কাটারি করি ভর।' চান্দের শ্বশুর রঘুদেব বলিল—"ব্রহ্মবধ দিব আমি তোমার উপর।" চান্দের খুড়া আসিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। চান্দ তখন ইঙ্গিতে পূজার আয়োজন করিতে বলিল। সনকা পদ্মাবতীকে আহ্বান করিল। পদ্মা বলিলেন—চান্দসদাগর আগে হিন্তালের লাঠি জলে ফেলিয়া দিক্, তবে আমি নামিতে পারি। চান্দ বলিল—পদ্মা, তোমাকে আমি পূজা করিতে পারি—কিন্তু পিছু ফিরিয়া বাম হস্তে পূজা করিব। যে হস্তে শিবকে পূজা করি, সে হস্তে তোমাকে পূজিতে পারিব না। যদিও তুমি শিবেরই কন্যা, তবু তুমি পতিতা,—

জাতি, হীন জাতি তুমি না কর বিচার।
যেই পূজা পূজে তুমি যাও খাইবার।
পঞ্চ কুলীন মধ্যে আমি যে কুলীন,
কোন কালে কোন কর্ম্ম না করেছি হীন।

চান্দের বক্তব্য এই—"তুমি নিম্নশ্রেণীয় হিন্দুদের দ্বারা পূজিত দেবতা, যে কেহ তোমাকে আহ্বান করে তুমি তারই পূজা লও—আমি উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, তোমাকে পূজা করিলে আমি সমাজে হীন হইব।"

পদ্মা বলিলেন—'মহাদেবের শিষ্য তুমি আমার হও ভাই—আমাকে এই ভাবে কটু কথা বলা তোমার উচিত নয়।'

তুমি পূজিলে মোকে পূজিবে সর্ব্বলোকে।
তে কারণে এতেক বলিএ তোমাকে॥

পদ্মার বক্তব্য—ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের পূজা পাইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। মধ্যস্তরের হিন্দুগণের—বিশেষতঃ বৈশ্যগণের পূজা পাইলেই

যথেষ্ট হইবে। চান্দ বৈশ্যসমাজের সমাজপতি—ধনবান্ ব্যক্তি। সে পূজা করিলেই মনসা লক্ষ লক্ষ হিন্দুর পূজা পাইতে পারিবেন। মনসার এই আবেদনে চান্দের চিত্ত বিগলিত হইল।

দুইজনের এই বাক্যবিনিময়ের কথা ছাড়িয়া দিলে আসল কথাটা কি? চান্দ এখন বৃদ্ধ হইয়াছে, মনের ও দেহের বল এখন কমিয়া আসিয়াছে, দারুণতম নির্য্যাতন সে সহ্য করিয়াছে. দেবতার সঙ্গে বাদ করিয়া সে দুঃখ-বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু পায় নাই। চান্দ যে শিবের উপাসক, সে শিব ত ভক্তজন সম্বন্ধে উদাসীন। তিনি তাঁহার উপাসককে রক্ষা করিবার জন্যও ব্যস্ত নহেন। তিনি ঐহিক কোন ইষ্টই সাধন করেন না। তাঁহার দান পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক। তাহাতে অমৃত লাভ হয়,—কিন্তু মৃত্যু বারণ হয় না।

তারপর চান্দ পুত্র-বধূ বেহুলার অসাধ্য-সাধন লক্ষ্য করিল—মনসার কৃপাতেই তাহার সাত পুত্র পুনর্জ্জীবিত—ধনরত্ন-লোক-লস্কর সহ চৌদ্দ ডিঙ্গার পুনরুদ্ধার। বেহুলাকে উপেক্ষা করা যায় না—পুনর্জ্জীবিত সন্তানগণকেও উপেক্ষা করা যায় না। মনসার অনিষ্ট সাধনের শক্তিই এত কাল দেখিয়া আসিয়াছে—তাহার ইষ্টসাধনের শক্তিও চান্দ এবার লক্ষ্য করিল। যাহা কিছু হারাইয়াছিল সমস্তই আজ তাহার দুয়ারে উপস্থিত। এই সমস্তকে নিজের জেদের জন্য বিদায় দেওয়া মহাদানবের কাজ,—মানবের কাজ নয়।

ইহার উপর স্ত্রী, পুত্রবধূগণ, আত্মীয়-বন্ধু, পাত্র-মিত্র ও প্রজাগণের কাতর প্রার্থনা। একেবারে অষ্টবজ্রের মিলন। ইহার পরও যদি চান্দ হিন্তালের লাঠি ঘুরাইয়া বলে—ধন-জন, স্ত্রী-পুত্র, পুত্রবধূ, অনুচর সমস্ত যাক্—আমি আমার জেদ লইয়াই থাকিব—তাহা হইলে চান্দ আর মানুষ থাকে না—দৈত্য-দানবই হইয়া পড়ে।

মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল— বেহুলা লখীন্দরের ব্রতও ফুরাইল। এইবার পুত্র পুত্রবধূ লইয়া চান্দের সুখে ঘরসংসার করিবার কথা। কিন্তু বেহুলা এত কাল কোথা ছিল ঠিক নাই—তাহার সতীত্বের পরীক্ষার প্রয়োজন। চান্দ বেহুলাকে অষ্ট পরীক্ষা দিতে বলিল। বেহুলা একে একে অদ্ভুত পরীক্ষাগুলি দিয়া প্রত্যেকটিতে সগৌরবে উত্তীর্ণ হইল। এইরূপ পরীক্ষাদান মঙ্গলকাব্যের একটি কবিপ্রসিদ্ধ রীতি। পাঠকগণকে খুল্লনার পরীক্ষার কথা স্মরণ করিতে বলি। শেষ পরীক্ষায় বিজয়িনী হইয়া বেহুলা অন্তর্হিতা হইল। মনসা রথ পাঠাইলেন। সেই রথে বেহুলা ও লখীন্দর স্বর্গে চলিয়া গেল।

স্বর্গে যাইবার আগে বেহুলার ইচ্ছা হইল, মা-বাবাকে দেখা দিয়া যাই। তখন দুইজনে যোগিবেশ ধরিয়া 'জয় গোরক্ষনাথ' বলিয়া সাহে বেণের গৃহে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া আত্মপরিচয় লিখিয়া রাখিয়া দুইজনে অন্তর্হিত হইল। এই ব্যাপারটার সমস্তটাই যেন স্বপ্ন।

নারায়ণদেব যেন এই স্বপ্ন বেহুলার মাতাপিতাকেও দেখাইলেন। তাহারা স্বপ্ন দেখিল—তাহাদের কন্যা-জামাতা যেন ছদ্মবেশে তাহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া গেল। তাহারা তাহাদের চিনিতে পারিল না—চলিয়া গেলে তাহাদের পরিচয়পত্রী পাইয়া অর্থাৎ স্বপ্নভঙ্গের পর 'হায় হায়' করিতে লাগিল। এই মধুর স্বপ্ন যেন তাহাদের শোককে দ্বিগুণিত করিয়া দিল।

যোগী ও যোগিনীবেশে লখীন্দর ও বেহুলা মাতাপিতাকে দেখা দিয়া গেল—ইহাতে চমৎকার কবিত্ব ফুটিয়াছে। বেহুলা মাকে যে বার্ত্তা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা যোগিনীবেশেই বলিবার কথা। "মিথ্যা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মা আর কাঁদিও না। আমি বাণরাজার কন্যা উষা,

আমার স্বামী অনিরুদ্ধ। আমরা শাপভ্রষ্ট হইয়া আসিয়াছিলাম। আমাদের ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, এখন চলিলাম। আমাদের জন্য শোক করা বৃথা।

সাত ভাইএর দিব্য লাগে যদি কর ক্রন্দন।
তোমার কন্যা নহি আমি স্বর্গ বিদ্যাধরী।
তাল ভাঙ্গি স্বর্গ থেকে আনিল বিষহরী॥

মা তোমার উদরে বাস করিয়া তোমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়াছি—

পুনঃ পুনঃ মা তোমায় জানাই প্রণাম।
বড় দয়ার আমি বিপুলা মোর নাম॥
ইহ জন্মে তোমা সনে আর দেখা নাই।
অপরাধ ক্ষম মোর স্বর্গপুরে যাই॥
মায়া বাড়াইবা বলি না দিনু পরিচয়।
দেবীর বেশে দেখা দিতে জন্মিল বিনয়॥"

পাছে মায়া বাড়িবে বলিয়া বেহুলা ছদ্মবেশে মা বাপকে দেখা দিয়াই অন্তর্হিতা হইল—কিন্তু জানাইয়া গেল যে চিরবিদায়ের আগে আমি তোমাদের মুখ দেখিয়া গেলাম। ইহা কবিত্বের দিক হইতে বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

চান্দ মহাসমারোহে লক্ষ বলি দিয়া মনসার পূজা করিল—মনসার আনন্দ আর ধরে না। মহিষ, ছাগল, মেষ, হরিণ, হংস, পারাবত ইত্যাদি মনসার বলি। বরাহ বাদ গেল—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা বরাহ বলিদানও দেয়।

এইরূপ বলিলুব্ধা দেবতার পূজার সঙ্গে বৈদিক দেবতাদের পূজার বিরোধ থাকিতে পারে না। কারণ, পৌরাণিক যুগে যজ্ঞে পশুবধ করিয়াই তাঁহাদের পূজার প্রথা ছিল। বৈষ্ণবদের এইরূপ পূজায়

আপত্তি থাকিবার কথা। সে আপত্তি যে ছিল, তাহা চৈতন্যভাগবত হইতেই বুঝা যায়। শিবের পূজায় বলি দেওয়ার কথা নয়—তিনি বিল্বপত্র ধুতুরাতেই তুষ্ট, তিনি রাজসিক পূজা চাহেন না। কাজেই পশুবলি তাঁহার পূজায় চলে না। শৈবধর্ম্মের সহিত বলিমূলক উপাসনার বিরোধ হইবার কথা। ধর্ম্মঠাকুরের কাছে এ দেশের অর্দ্ধ-বৌদ্ধ অর্দ্ধহিন্দু নীচশ্রেণীর লোকেরা বলিদান দিত বা দেয়। যে সকল বুড়ো শিবের মন্দিরে বলিদান হয়, রাঢ় দেশে সে সকল বুড়ো শিব ধর্ম্ম-ঠাকুরেরই রূপান্তর মাত্র। চণ্ডীর পূজায় বলি দিতে হইত। চণ্ডী মনসার মতই নানাবিধ বলির পক্ষপাতিনী। চণ্ডীও একসময় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দেবতা ছিলেন—পরে তিনি সুরথরাজের চণ্ডীর সহিত একাত্মিকা হইয়া উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদেরও পূজ্যা হইয়াছিলেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে পূজাপ্রচারই চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের উপজীব্য। চণ্ডীর পক্ষে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মন্দিরে স্থান লাভ যত সহজ, মনসার পক্ষে তত সহজ নয়। চণ্ডী শিবজায়া মহামায়ার সঙ্গে একাত্মিকা হইয়া যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, মনসা সে মর্য্যাদা লাভ করেন নাই। তবে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর দ্বারা পূজিতা হইবার জন্য মনসাকে শিবের দুহিতার রূপ ধরিতে হইয়াছে। শিবের সহিত মনসার বিবাদ নাই, শিব কাহারও সহিত বিবাদে প্রস্তুত নহেন। চন্দ্রধর শৈব বলিয়াই যে তাহার সহিত মনসার বাদ, তাহা নহে। শৈব চন্দ্রধর মনসার পূজা না করিতে পারেন—তাঁহার উদ্দেশে এত গালাগালি করিবেন কেন? ইহার কারণ, চণ্ডীর সহিত মনসার বিবাদ। এ দেশে যেন দুই বলিভোগিনী দেবতার মধ্যে বলি লইয়া বিবাদ বাধিয়াছিল অর্থাৎ চণ্ডীর উপাসকগণ ও মনসার উপাসকগণের মধ্যেই বাদ-বিসংবাদ চলিতেছিল। এই বিবাদই চণ্ডী ও মনসার "বিমাতা ও

সপত্নীপুত্রী" সম্বন্ধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং দুইজনের মধ্যে সাহিত্যেও বিবাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

নারায়ণদেব দেখাইয়াছেন—চন্দ্রধর শিবজায়া চণ্ডীর (লৌকিক মঙ্গলচণ্ডী নহেন) উপাসক ছিলেন বলিয়া চণ্ডীর প্রতিদ্বন্দ্বিনী মনসার বিরোধী ছিলেন। চান্দ মনসাকে বলিতেছেন—

"তোমার সঙ্গে কোন্দল বাড়াইল চণ্ডী।
তোমারে পূজিতে মাও হইল পাষণ্ডী ॥

"মহাদেবের সন্তান শিষ্য আমি—আমার বাপও পাগল—মাও পাগল, আমিও পাগল। হিন্তালের লাঠি চণ্ডী মা আমার হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল—

তোর ঘরে দেখি কেন মনসার বাস ?
কালরূপ ধরি তোর করিব সর্ব্বনাশ ॥"

কবি নারায়ণদেব চান্দের মতিপরিবর্ত্তন যে ভাবে দেখাইয়াছেন—তাহা রসবিরোধী হয় নাই, বরং রসের দিক হইতে যথাযথই হইয়াছে।

চান্দের মনুষ্যত্বের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখানো উচিত ছিল—কবি তাহার বাণিজ্য-ব্যাপারে ও তাহার নিগ্রহের মধ্যে দেখান নাই—তাহাই ক্ষোভের বিষয়।

কবিদের বর্ণনায় বেহুলার বয়স মাত্র বারো বৎসর। এমনভাবে তাহার চরিত্র, রূপ ও আচরণের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে যেন সে পূর্ণ যুবতী। বেহুলা যেভাবে বিবাহের রাত্রিতেই স্বামীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং যে ভাবে সে স্বর্গপুরী হইতে স্বামীকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে, তাহাতে তাহার পক্ষে দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়সের কল্পনা সম্পূর্ণ অসমঞ্জস।

সব চেয়ে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে তাহার পরীক্ষায়। বারো বছরের বালিকার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য আট আটটি সাংঘাতিক ব্যবস্থা। যে বালিকা নিজের সতীত্ববলে মৃত পতি, ছয় ভাসুর ও লোক-লস্কর সহ চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরাইয়া আনিল তাহার আবার পরীক্ষা! চাঁদকে এমনি কঠোর-প্রকৃতি ও নির্ব্বোধ মানুষ করিয়া তোলা হইয়াছে যে চাঁদ আট-আটটি কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা করিল। বলা বাহুল্য, মঙ্গলকাব্যের পদ্ধতি রক্ষার জন্যই এই সমস্ত পরীক্ষার বর্ণনা।

এই পরীক্ষার অবতারণা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সাহিত্যের রসপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। বেহুলা সাতটি পরীক্ষায় একে একে উত্তীর্ণ হইয়া যেন অভিমানভরে অষ্টম পরীক্ষার সময় অন্তর্হিতা হইল। এ যেন নির্ব্বোধ কঠোরহৃদয় লোকভীরু চাঁদের চরম দণ্ডবিধান,—মায়ামুগ্ধ নরনারীদের চরম শিক্ষাদান।

সমস্তটুকুই যেন স্বপ্ন। লখীন্দর বিবাহ-রাত্রে কালগ্রাসে পতিত হইল—বেহুলা কলাগাছের ভেলায় স্বামীর মৃতদেহ লইয়া নিরুদ্দেশ হইল। ইহা বেহুলার একশ্রেণীর অনুমরণ, অগ্নিপথে নয়—বারিপথে। শোকার্ত্ত চাঁদ ও সনকা দারুণ শোক-শেল বক্ষে পুষিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। একদিন সনকা যেন স্বপ্ন দেখিল—বেহুলা লখীন্দরকে এবং তাহার অন্য ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া ফিরিয়া আসিল। ঘাট হইতে তাহাদের মহাসমারোহে ফিরাইয়া আনিল। এমন সময় স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। চাঁদও একদিন স্বপ্ন দেখিল—শুধু লখীন্দর ও অন্য পুত্রগণ নয়, তাহার চৌদ্দ ডিঙ্গা ধনসম্পদ ও লোকজন মায় ধন্বন্তরি ওঝাকে পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া বেহুলা ফিরিয়া আসিল। বেহুলা বলিল—বাবা, তুমি যদি মনসা পূজা কর—তবে এই সমস্ত ফিরিয়া পাইবে। শোকার্ত্ত চাঁদ যেন মনসাপূজায় স্বীকৃত হইল। বেহুলাকে ঘরে লইবার

আগে সে আটটি পরীক্ষা চাহিল। বেহুলা অষ্টম পরীক্ষা দিতে 'তোলায়' উঠিল—এমন সময় স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। সমস্তটাই যেন স্বপ্ন।

শোকাহত মাতাপিতা জাগরণেও কতবারই ভাবে—'আহা, যদি কোন দৈববলে মৃত সন্তান ফিরিয়া আসিয়া আবার "মা বাবা" বলিয়া আহ্বান করে।' স্বপ্নেও তাহারাই দেখে—সন্তান যেন ফিরিয়া আসিয়াছে, সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া দুঃখকে দ্বিগুণিত করে মাত্র। এই-রূপ স্বপ্ন স্বভাবসঙ্গত। এই স্বপ্নটিকেই যেন কবিরা স্বর্গের সূত্রে সত্যের সঙ্গে গাঁথিয়া এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। লখীন্দর বেহুলার মহাপ্রস্থান চান্দসদাগরের স্বপ্নভঙ্গমাত্র। স্বপ্নের শক্তিও অল্প নয়, এইরূপ একটা স্বপ্ন জীবনের গতি-প্রকৃতিকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে। চান্দ স্বপ্নে মনসা পূজা করিয়াছে, স্বপ্ন ভঙ্গের পর জাগিয়া উঠিয়া সে যেন মনসা পূজা করিতে সম্মত হইল। সুখের স্বপ্ন তাহার হৃদয়ে এমন একটা মাধুর্য্যের সঞ্চার করিল যে, তাহার মনে বিদ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি বিদূরিত হইল। মধুর স্বপ্নের সহিত জড়িত হইয়া গেল মনসাপূজা। তাই যেন স্বপ্নের মর্য্যাদারক্ষার জন্য চান্দ মনসাপূজায় সম্মত হইল। এইরূপ একটা ব্যাখ্যা স্বতই মনে আসে।

চণ্ডীমঙ্গলে দেখানো হইয়াছে—শৈব ধনপতি ডাকিনী দেবতা বলিয়া চণ্ডীর পূজা করিতে চাহিতেছে না। মনসামঙ্গলের চান্দ সদাগরও শৈব, কিন্তু চণ্ডীর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ত নাই-ই—বরং শিবের জায়া বলিয়া সে চণ্ডীরও উপাসক।

চান্দ মনসাকে শেষ পর্য্যন্ত বলিয়াছে "চণ্ডীরই আদেশে আমি তোমার ঘট ভাঙ্গিয়াছি, তোমার সঙ্গে বাদ করিতে আমার শক্তি নাই।

আপনার দোষে পাইলাম আপনি সাজাই।"

মনসামঙ্গলে চণ্ডী আর ডাকিনী দেবতা নহেন—আদ্যাশক্তি মহামায়া; এখানে ডাকিনী দেবতা বরং মনসা। শেষপর্য্যন্ত মনসাও আর ডাকিনী দেবতা থাকিলেন না—তিনি শিবদুহিতার পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিলেন।

কবির কাব্যের ভাষা সাধারণ মঙ্গলকাব্যেরই ভাষা—বাঙ্গালী-মাত্রের পক্ষেই অধিগম্য। পশ্চিমবঙ্গে অপ্রচলিত এমন কতকগুলি শব্দ ও ক্রিয়া-বিভক্তি আছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য বক্তব্য বুঝিতে কষ্ট হয় না। পঞ্চমীর বিভক্তি বুঝাইতে হনে, হন্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিগণের রচনার ভাষার সঙ্গে মাঝে মাঝে মিল দেখা যায়। যেমন—

১। বালকের মুখে যেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে যেন দেখি পাকা বেল॥

২। সাগর শুকাল মাণিক লুকালো হারান্ন কর্ম্মদোষে॥

ইত্যাদি অংশে বৈষ্ণব কবির ভাষার প্রভাব দেখা যায়।

ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে গ্রন্থখানি রচিত। ছন্দের বৈচিত্র্য ইহাতে নাই। পয়ার ও ত্রিপদীর চরণগুলিতে অনিয়মিত অক্ষরবিন্যাস হইয়াছে, ক্বচিৎ কোথাও নিয়মিত। আমার মনে হয়, কবি ইহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন—গায়েনরা ও লিপিকররাই ইহার জন্য দায়ী। গায়েনরা ছন্দের ত্রুটি সুরের টানে সারিয়া লইত। ছন্দ বিকৃত করিয়াছে তাহারা,—ছন্দের ত্রুটিও সারিয়াছে তাহারা। লিপিকরের লেখায় ত্রুটিগুলি অবিকৃত থাকিয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত চরণগুলি পড়িলে কবির যে ছন্দোবোধ যথেষ্টই ছিল তাহা বুঝা যায়—

১। জালুয়া ছাড়িল জাল—হালুয়া এড়িল হাল।

২। বুকে ঘাও মারে সন্কা মুখে রাও নাই।

৩। আমা সনে বাদ যার জীবনে কি সাধ তার ?

অনিয়মিত পয়ারের বহু পংক্তিই ধামালী ছন্দের চরণ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন—

মায়ের কাণের সোণার দিকে সদাই করে মন।
বারে বারে বানিয়া বেটা করে বিড়ম্বন ॥
চণ্ডী বলে তোমার কথা সমঝিলাম মাও।
আজ্ঞা দিলাম ডুবাইতে চান্দর চৌদ্দ নাও ॥

পুঁথিতে আছে—তোমার সঙ্গে কোন্দল বাড়াইয়া পার্ব্বতী
তোমারে পূজিতে মাও হইল পাষণ্ডী।

এই "পার্ব্বতী" স্থলে কবি নিশ্চয়ই "চণ্ডী" লিখিয়াছিলেন—কারণ, তাহার পরই রহিয়াছে—"চণ্ডী বোলে তোর ঘরে মনসার কেন বাস।" পার্ব্বতী স্থলে চণ্ডী হইলে মিল ঠিক থাকে। গায়েনের ছন্দোবোধের অভাবেই চণ্ডী পার্ব্বতী হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

নারায়ণদেবের দুইটি চরণ এই—

পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া যেন পড়িলেক মুণ্ডে। স্তব্ধ হৈল সদাগর রাও নাহি তুণ্ডে ॥

কবিকঙ্কণ, বিজয় গুপ্ত, ভারতচন্দ্র ইত্যাদি কবির রচনায় ঠিক মুণ্ডে তুণ্ডে মিল দিয়া এই ধরণের চরণ বারবার দেখা যায়। নারায়ণ যখন এই কবিদের পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন এইরূপ চরণের প্রবর্ত্তক নারায়ণ দেবকেই বলিতে হয়।

স্থলে স্থলে মৌলিক অলঙ্কারের নিদর্শনও পাওয়া যায়। যেমন—

১। মুড়া মুড়া করিলেক ক্ষুর নাহি হাটে।
খিল ভূমির চাষে যেমন মুড়া হাল ফোটে ॥

২। আমি ভর যুবতী তুমি জিস্ত বুড়া।
দন্তপড়া বাঘে যেন কামড়ায় মুড়া ॥

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল

পৌরাণিক অংশ

মনসার সহচরী নেত্রবতী (নেতা) বিষহরী মনসাকে বলিলেন—

"মর্ত্তভুবনে চল যাই।

মর্ত্তভুবনে যাইয়া ছাগ মহিষ বলি খাইয়া

সেবকেরে বর দিতে চাই।"

মনসা নেতার কথায় মর্ত্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য নামিলেন।

কবি গ্রন্থারম্ভে মনসার বন্দনার সঙ্গে এক কবিতাতেই জগৎকারু, আস্তিক, ব্যাস, বশিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু দেবদেবীর বন্দনা গাইয়া লইলেন, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্ম্মমঙ্গলের মত পৃথক পৃথক বন্দনা রচনা করেন নাই। এই সঙ্গে কবি জনকজননীকেও বন্দনা করিয়াছেন। সুকুমার বাবু বলিয়াছেন, 'জনকজননীর বন্দনা পশ্চিমবঙ্গের কবিদেরই বৈশিষ্ট্য।' দেখা যাইতেছে—বরিশালের কবিও জনকজননীর বন্দনা গাহিয়াছেন।

দেবী স্বপ্ন দিলেন—'কানা হরি দত্তের গীত লুপ্ত প্রায়, তাহা ছাড়া মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য—অতএব তুমি আমার গান গাও।' এই স্বপ্ন দিয়া মনসা একটা গানের খসড়াও করিয়া দিলেন।

বিজয় গুপ্তের মনসা সর্পভয়বারিণী মাত্র নহেন। যাহার ঘরে মনসার গুণ গীত হইবে তাহার সর্ব্ববিধ কল্যাণ হইবে অর্থাৎ মনসা এখানে চণ্ডীর মতই বরপ্রদা দেবী।

অপুত্রর পুত্র হবে নির্ধনের ধন। রোগীর রোগ দূর হয় বন্দী বিমোচন।
নারী যার ঘরে নাই নারী হয় ঘরে। মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় মোর বরে॥

শুধু তাহাই নয়—

শ্রীপদ্মাপুরাণ পুঁথি থাকে যার ঘরে। গৃহদাহ নাহি হয় মনসার বরে।

বিজয় গুপ্ত কোন রাজা বা ভূস্বামীর অনুগ্রহ ভিখারী ছিলেন না—কোন রাজা বা ভূস্বামীকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তিনি স্তব রচনা করেন নাই। তিনি ছিলেন প্রজাসাধারণের কবি। প্রজা-সাধারণের পক্ষ হইতে তিনি সেকালের সুলতান হোসেনশাহের গুণগান করিয়াছেন।

"সুলতান হোসেন শাহ নৃপতি-তিলক
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাম প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিল পৃথিবী।
রাজার পালনে প্রজা সুখ ভুঞ্জে নিতি!"

এই গুণগান স্বতঃস্ফূর্ত্ত। হোসেন শাহ্ যে সত্যই প্রজারঞ্জক ছিলেন ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হয়।

সকল মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্যপ্রচারে হনুমান, বিশ্বকর্ম্মা ও নারদের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। বিজয় গুপ্ত মনসার জন্মের আগেই নারদের সাহায্য লইয়াছেন। 'ত্রিভুবন বেড়ায় মুনি কোন্দলের আশে।' এখানে নারদ হরগৌরীর মধ্যে একটা কোন্দল বাধাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু আপাততঃ কোন্দল বাধিল না। কোন্দলের দেবতা মনসার জন্ম হইল।

মনসার জন্ম-ব্যাপারে ও শিবের সহিত মনসার প্রথম পরিচয় ব্যাপারে কবি ভব্যতা রক্ষার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অমার্জ্জিত রুচির অন্তরালে কবির সত্যনিষ্ঠা উঁকি দিতেছে।

চণ্ডীর অভিমানের বর্ণনাটি কবি বেশ সরস করিয়া রচনা করিয়াছেন—চণ্ডী একেবারে পল্লীচণ্ডী হইয়া বলিতেছেন—

নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে পরাণে চমক লাগে।
চড়িয়া বেড়ায় দুষ্ট বলদ তাহারে খাউক বাঘে।
আগুন লাগুক কাঁধের ঝুলি ত্রিশূল নিক চোরে।
গলার সাপ গরুড়ে খাক যেমন ভাণ্ডিলা মোরে।
ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা পড়িয়া ভাঙুক লাউ।
কপালে দ্বিতীয়ার চাঁদ তারে খাউক রাউ।

শিবের সম্বল ত সাপ, ত্রিশূল, হাড়মালা, বুড়া বলদ আর ঝুলি। এই গুলিও ধ্বংস পাক,—এই গালি দেওয়া ছাড়া অন্য কোন গালি দেওয়ার উপায় নাই। শিবের অশিব কামনার চমৎকার ব্যবস্থা করিয়াছেন কবি

ছলনা করিয়া চণ্ডীর খেয়ারী সাজা এবং শিবের বিড়ম্বনা লইয়া গুপ্তকবি একটি সরস কাহিনীর সৃষ্টি করিয়াছেন। ভোলানাথ শিবের বিড়ম্বনায় বাঙ্গালী পাঠক চিরদিনই আনন্দ পাইয়াছে। গুপ্ত কবির এই কাহিনীতে কৌতুকরঙ্গ প্রচুর। খেয়ারী বেশে চণ্ডী শিবকে বলিতেছেন—

গণিয়া বাছিয়া আগে পারের কড়ি দে।
কড়ি না পাইলে তোরে পার করিবে কে?
পারের কড়ি তুমি যদি নাহি দেও শিব।
ত্রিশূল শিঙ্গা সব বিত্ত কেড়ে তোমার নিব।
কটীধড়া নিয়া যাব হংস বাঁধিবার।
ডমরু দিয়া খেলিবে ছেলেরা আমার।
ঝুলিতে ভরিয়া মোর তুষ ঘসী রাখিব।
কমণ্ডলু নিয়া মম অম্বল ঢালিব॥

কিন্তু শিবের মত নিঃস্ব ত্রিভুবনে নাই। কোথায় পাইবে সে পারের কড়ি?

ঝুলি নাড়ে চাড়ে শিব ঝুলিতে নাই কড়ি।
ক্রোধ করি ভাঙ্গ ধুতুরা খায় সের চারি ॥

তারপরে যে কাণ্ড ঘটিল তাহাতে চণ্ডিকা খণ্ডিতা হইয়া শিবকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। নির্লজ্জ ভোলানাথের তাহাতেই কি লজ্জা আছে

কবি তারপর সেকালের একটি লৌকিক চিত্র মনসা-গঙ্গাকে অবলম্বন করিয়া দিয়াছেন। গঙ্গা চণ্ডীর সপত্নী—মনসা সপত্নীসুতা। গঙ্গাও মনসার সৎমা। পল্লীসমাজের সতা-সৎমার সংসারে যে কোন্দল ঘটে, সেই কোন্দল দেবীদের মারফতে দেখানো হইয়াছে। রচনায় একটা সরল মাধুর্য্য আছে। এই কোন্দলের পরিণামটা ভালই হইল। চণ্ডীর প্রহারে পদ্মা জর্জ্জরিত হইল—তাহার ধৈর্য্যের বন্ধন আর রহিল না। গঙ্গার অনুরোধেও চণ্ডী নিবৃত্ত হইল না—এবং গঙ্গাকে গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। তখন পদ্মা নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া চণ্ডীকে দংশন করিল। চণ্ডীর তাহাতে চৈতন্য হারাইয়া চৈতন্য হইল। শিব আসিলেন। শিবের অনুরোধে পদ্মা চণ্ডীকে বাঁচাইয়া দিলেন। পদ্মার বিক্রম হাড়ে হাড়ে বুঝিয়া চণ্ডী পদ্মাকে কন্যা বলিয়া গ্রহন করিলেন। এদিকে চণ্ডী শিবের পরদার-লোভের জন্য বিরূপ হইয়া ছিলেন—শিবের সঙ্গে চণ্ডীর পুনর্মিলন খুবই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডী প্রাণ পাইয়া মান অপমান ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য গূঢ়তর। চণ্ডীর চেয়েও যে পদ্মার শক্তি-বিক্রম বেশি, চণ্ডীকেও যে পদ্মার করুণায় পুনর্জীবন লাভ করিতে হইল—তাহা দেখাইয়া কবি পদ্মার মহিমাই প্রচার করিয়াছেন। গুপ্ত কবি যখন মনসার মঙ্গলগান শুনাইতে চাহিয়াছেন—তখন এদেশে চণ্ডীর প্রচণ্ড প্রতাপ। সেই চণ্ডীর চেয়েও যে মনসার প্রতাপ অনেক

বেশি—কবি তাহা ঐ দ্বন্দ্বে মনসাকে বিজয়িনী করিয়া দেখাইলেন।

নারদের ঘটকালিতে জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ হইল। কিন্তু এ বিবাহ সাময়িক উত্তেজনার ফল মাত্র। একরাত্রিতেই মুনিব মোহ কাটিয়া গেল। এ বিষয়ে মনসা ও বেহুলার দশা একই। জরৎকারু বাসররাত্রিশেষেই বিদায় লইল। মনসা তাহার বরে আটটি পুত্র লাভ করিল। মনসার বিক্রম দেখিয়াও চণ্ডীর চৈতন্য হইল না। মনসা অষ্ট পুত্রের জননী হইল দেখিয়া আবার তাঁহার হিংসার উদয় হইল। চণ্ডী—মনসার স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া দিলেন। মহাদেব তখন সুরভিকে ডাকিয়া একটি নদীকেই দুগ্ধে ভরিয়া দিলেন। চণ্ডীর মায়ায় দুগ্ধনদী বিষের নদী হইয়া গেল, মহাদেব সেই বিষ গণ্ডূষে পান করিলেন। বিষপান করিয়া মহাদেবের প্রাণ যায়-যায়। চণ্ডী নিজের দুর্বুদ্ধিতে স্বামিহন্ত্রী হইয়া পড়িলেন। আবার মনসাব মহিমা-কীর্ত্তনের সুযোগ হইল। বিষহরী শিবের বিষ হরণ করিয়া শিবকে বাঁচাইয়া দিলেন। কবি দেখাইলেন,—শিবের বিক্রমের চেয়েও মনসার বিক্রম বেশী।

এই কাহিনীর মধ্য দিয়া মহাদেবের কন্যাস্নেহ ও দৌহিত্রদের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশিত হইয়াছে। শিবের বাৎসল্যের কথা অন্য কোন কাব্যে নাই। বাংলা সাহিত্যে শিবকে ঠাকুর-দাদার দলে দাঁড় করানো হইয়াছে। নাতিরা ঠাকুরদাদাকে লইয়া যেমন রঙ্গরসিকতা ও হাসি মস্করা করে—কবিরা শিবকে লইয়া তাহাই করিয়াছেন। ঠাকুর-দাদা যেমন নাতিদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া নাতিদের রঙ্গরসিকতা ও উপদ্রবে আনন্দই পান—বঙ্গ সাহিত্যে শিব যেন সেইরূপ আনন্দই পাইতেছেন এইরূপ দেখানো হয়। কিন্তু সত্যসত্যই শিব ঠাকুরদাদা (মাতামহ) হইয়া পড়িয়াছেন—গুপ্ত কবির এই মনসামঙ্গলে।

নাতিদের প্রতি তাঁহার স্নেহের অবধি নাই। বিশেষতঃ কন্যা অভাগিনী বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিবার জন্য শিবের চেষ্টারও অবধি নাই।

অষ্ট পুত্র বলবন্ত দেবী বিষহরী পালন করেন শিব অনুরূপ করি।

বাপের গৌরবে পদ্মার কাহাকেও আর ভয় নাই।

কবি তারপর সমুদ্র মন্থনের কাহিনী উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহারও মুখ্য উদ্দেশ্য বিষহরীর মহিমা কীর্ত্তন! সমুদ্রমন্থনে যখন হলাহল উঠিল—সে হলাহল পান করিলেন মহাদেব। বিষপানে আবার শিবের শবত্ব লাভ হইল। দেবতারা শিবের শব বেষ্টন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন—কিন্তু প্রতিকারের ক্ষমতা কাহারও ছিল না। একমাত্র বিষহরীই শিবকে বিষদাহ হইতে বাঁচাইতে পারিলেন। আর একবার বিষহরীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের অবসর ঘটিল। কাহিনীর গৌণ উদ্দেশ্য, আর এক পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন। ইন্দ্র লক্ষ্মীকে সম্বোধন করিয়া বড় সত্য কথাই বলিলেন—

তুমি যারে দৃষ্টি কর সেই গুণবান। সেই সে কুলীন ধন্য সেই যে প্রধান॥
নির্গুণ পুরুষে যদি কর দৃষ্টিপাত। বৃহস্পতি শুক্র হয় তাহার সাক্ষাৎ॥

লক্ষ্মীর কাহিনীটি যে কাব্যের পক্ষে অবাস্তব নয়—তাহা অন্য ভাবেও কবি লিখিয়াছেন—

যেইজন শুনে এই অমৃত কথন। ইন্দ্রের সমান সুখী হয় সেই জন॥
যাহাদের সদনে এই গীতের প্রচার। কোন কালে লক্ষ্মী না ছাড়ে তাহার॥
নায়কের কোঙর হউক চিরজীবী। পুত্রপৌত্রে সুখে থাকুক পৃথিবী॥
তাহার পূরুক আশা যত মনোরথ। পরমায়ু হউক তাহার অষ্টোত্তর শত॥

এত বিড়ম্বনাতেও চণ্ডীর চৈতন্য হইল না। পদ্মা নিজের বাপের ঘরে থাকে বিমাতা চণ্ডীর তাহা একেবারেই ভাল লাগিল না। বাংলার

লৌকিক ও পারিবারিক জীবন এই প্রসঙ্গে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিমাতা যে কত নিষ্ঠুর হইতে পারে—কবি চণ্ডীর চরিত্র দিয়া এখানে তাহা দেখাইয়াছেন। যে দেশে চণ্ডীর পূজা চলিতেছে, মনসার পূজা সে দেশে চলে তাহা চণ্ডীভক্তগণের একেবারে অসহ্য। দেশের লোকের এই মনোভাব এখানে চণ্ডী ও মনসার দ্বন্দ্বে দেখানো হইয়াছে। এখানে কবি চণ্ডীর চরণে মনসার অনুনয়-বিনয়ের মধ্য দিয়া কবিত্বেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। মনসা বলিতেছেন—

জনমদুঃখিনী আমি দুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল ॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম্মফলে ॥
কারে কি বলিব মোর নিজকর্ম্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল।
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুনগো জননী।
বিধাতা করিল মোরে জনমদুঃখিনী ॥
কোলের বালিকা হয়ে বুঝাই তোমারে।
তোমার উদর ছাড়া কে জানিতে পারে।
মায়ে ঝিয়ে বিসংবাদ কেবা নাহি করে।
ক্রোধ সম্বরিয়া মাগো রাখহ আমারে ॥

চণ্ডীর দয়া হইল না। চণ্ডী তাহাকে বনবাস দিতে চাহিলেন—শিব আপত্তি করায় চণ্ডী বাপের বাড়ী যাইবার ভয় দেখাইলেন। বাধ্য হইয়া মহাদেব মনসাকে বনবাস দিলেন। বনই সর্পদেবতার উপযুক্ত স্থান।

কবি মনসাকে নানা ভাবে এমনই লাঞ্ছিতা রূপে চিত্রিত

কবিয়াছেন যে পরবর্ত্তী জীবনে মনসা হিংস্রা ও নিষ্ঠুরা হইয়া উঠিবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ।

মনসাকে বনবাস দিতে গিয়া শিবের চোখেও জল পড়িতে লাগিল। কবি সন্তানবাৎসল্যে রুদ্রকেও বিচলিত করিয়াছেন—

"মা ভাই নাই কেহ সেই দুঃখে দহে দেহ
আমি বিনা আর কেহ নাই।
আমি যে গৌরীর বশ লোকে ঘোষে অপযশ,
তোমা বনে পাঠাল সতাই ॥
কারে কি করিব রোষ আমার কর্ম্মের দোষ
আমি কিবা কহিব তোমারে।
দিয়া তোমা বনবাসে কি মতে যাইব দেশে
এখন কি হইবে আমারে।

মনসা যে উত্তর দিলেন—তাহাতে তাঁহার মহিমাই প্রকাশিত।

মনসা বলেন বাপ, না করিও মনস্তাপ
সতাইরে না বলিও মন্দ।
কারে কি কহিতে পারি স্বামী ছাড়ে নিজ নারী
সকলি মোর কপাল নির্বন্ধ।

শিব কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রনীরে নেত্রবতীর জন্ম হইল। নেতা মনসার সহচরী ও নেত্রী হইয়া মনসার সঙ্গে বনেই থাকিল।

নারদের কাজ হইয়া গিয়াছে—এইবার বিশ্বকর্ম্মার পালা। মনসা বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। তিনি মনসার জন্য জয়ন্তীপুরী নির্ম্মাণ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা মনসার ঘটও নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এইবার মনসা তাঁহার নিজের পূজাপ্রচার—বিশেষতঃ রুধিরতৃষ্ণানিবারণের

জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। তাঁহার প্রথম পূজারী হইল—কতকগুলি রাখাল। কৌশলেই তাহাদের কাছ হইতে পূজা আদায় করিলেন।

রুধির ভক্ষিয়া দেবীর আনন্দিত মতি।
রাখালের তরে বর দিলা পদ্মাবতী।

তারপর গোপালক যাত্রাবর তাঁহার পূজারী হইলেন। রাখালের দল ছিল চণ্ডাল—চণ্ডালের পূজা লইতে দেবীর কোন আপত্তি ছিল না। ইহা হইতে বুঝা যায়—মনসা দেবী প্রথম প্রথম নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই দেবতা ছিলেন—তারপর উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা তাঁহাকে ধীরে ধীরে উপাস্যা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

যাত্রাবরের নেতৃত্বে রাখালরা খুব ধুম করিয়া মনসার পূজা করিতে লাগিল। হাসান হোসেন কাজী দুই ভাই-এর তাহা সহ্য হইল না। কবি এখানে মুসলমানদের অত্যাচারের বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা সকল মনসামঙ্গলে আছে—ভারতের অন্নদামঙ্গলেও আছে। এই বর্ণনা সেকালের ইতিহাসেরই এক পৃষ্ঠা। কিন্তু এই অত্যাচারের যে প্রতিশোধের কথা কবি ফলাও করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ইতিহাসের বস্তু নয়—তাহা কবির প্রতিচিকীর্ষু মনের কল্পনার সৃষ্টি। অক্ষম নিরুপায় হিন্দুসমাজ তাহার উপাস্যা দেবীর মারফতে সাহিত্যের মধ্য দিয়া এইভাবে মনের ক্ষোভ মিটাইয়াছে। কেবল প্রতিহিংসার ব্যবস্থা করিয়াই কবিরা ক্ষোভ মিটান নাই—আততায়ী মুসলমানদের দ্বারা দেবীর পূজা করাইয়া ছাড়িয়াছেন। বিজয়গুপ্ত কাজীদের দ্বারাই একার্য্য করাইয়াছেন, ভারতচন্দ্র স্বয়ং ভারতসম্রাটকেই পূজার মণ্ডপে টানিয়াছেন। কাজীর উপদ্রব চৈতন্য ভাগবতেও এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সেখানেও কাজীকে কাল্পনিক দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যকে মানিয়া লইতে হইয়াছে।

কবি বলিয়াছেন—হাসান হোসেন মনসার পূজা করিতে লাগিল। বাংলাদেশে গ্রামে গ্রামে যে মনসা পূজা উপলক্ষে উৎসব হয়—তাহার প্রমোদাংশে হিন্দুদের প্রতিবেশী মুসলমানেরাও আজিও যোগদান করে। ইহাই হাসান হোসেনের পূজা।

তারপর উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের স্ত্রীলোকেরা ঘটস্থাপন করিয়া মনসার পূজা করিয়া থাকে। সেকালে নারীগণের মধ্যে এই পূজার প্রচার হইয়াছিল। সনকার পূজা ইহাই প্রমাণ করে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ্যসমাজ মনসাকে পৌরাণিক দেবীর মধ্যে গণ্য করিয়া শাস্ত্রীয় বিধানে পূজা করে নাই। চান্দসদাগর হিন্দুসমাজের মধ্য স্তরেরলোক। এই মধ্যস্তরের হিন্দুসমাজের পুরুষরাও এই পূজা স্বীকার করে নাই। মনসা ব্রাহ্মণ্য সমাজের উপাস্য হইতে চাহেন নাই—তিনি মধ্যস্তরের হিন্দুদের পূজা পাইলেই যথেষ্ট মনে করিতেন। মধ্যস্তরের হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন চান্দসদাগর, এই চান্দসদাগর পূজা করিলেই জগতে তাঁহার পূজা প্রচলিত হইবে মনসাদেবী ইহাই মনে করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, চান্দ ছিলেন শৈব সম্প্রদায়েরও একজন অধিনায়ক। তিনি পূজা না করিলে পূজা স্বীকৃত বা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। শিব বলিলেন—

চান্দ যদি তোমা পূজা করে একচিতে।
তবে যে তোমার পূজা হবে পৃথিবীতে॥

এদিকে চান্দের পত্নী সনকা মনসার ঘট পাতিল। চান্দ নারী-দেবতা ও নারীর দেবতাকে স্বীকার করিবে না। সে সনকার ঘট পায়ে করিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। ইহা লইয়া চান্দের সঙ্গে মনসার বিবাদ বাধিল। মনসা প্রথমে চান্দের নন্দনবাড়ী ধ্বংস করিল। বৃক্ষলতা জীবজন্তু সবই মরিল। চাঁদের বন্ধু শঙ্কর গারুড়ী গরুড়-মন্ত্রে আবার সমস্ত পুনর্জ্জীবিত করিল।

মনসা এখন শঙ্কর গারুড়ী বা ধন্বন্তরির প্রাণ হরণের চেষ্টা করিল। শঙ্কর নেতার শিষ্য। নেতা তাহার মৃত্যুর সন্ধান দিল না। মনসা মালিনীবেশে শঙ্করকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করিল। তাহা সফল হইল না; গোয়ালিনী বেশে গিয়া বিষমিশ্র দধি খাওয়াইয়া আসিল তাহাতেও ওঝার কিছু হইল না,—তখন শঙ্করের পত্নীর সহিত সখীত্ব স্থাপন করিল। ওঝার পত্নীকে উপদেশ দিল ওঝার মরণের উপায়টা জানিয়া লইবার জন্য। ওঝাপত্নী পীড়াপীড়ি করিয়া ওঝার মৃত্যু কি ভাবে হইবে জানিয়া লইল। সেই সময় মনসা লুকাইয়া শুনিয়া লইল। তক্ষক ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় মঙ্গলবারে ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশন করিলে ওঝার মৃত্যু হইবে। মনসা নির্দ্দিষ্ট দিনে তক্ষককে দংশনের জন্য পাঠাইল, ওঝা নিদ্রিত ছিল—এদিকে ঔষধের ঝুলি মনসা হরণ করিল। এইরূপ অতি হীন কৌশলে মনসা ওঝার প্রাণ হরণ করিল।

এই প্রসঙ্গে গোয়ালিনীবেশের ছলনা লইয়া কবি অনেক রঙ্গ-রসিকতা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে মতঙ্গমুনি ও পতিব্রতার অতি জঘন্য কাহিনীটা বিবৃত হইয়াছে। সর্পাজীব ও সর্প-বৈদ্যদের মৃত্যু সাধারণতঃ সর্পদংশনেই হইয়া থাকে। এই কথাটাই ওঝার সর্পদংশনে মৃত্যুর কাহিনীতেই বলা হইয়াছে। নারীগণের কাছে কোন গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে নাই—কবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন—

স্ত্রীর ঠাঁই মর্ম্ম বলে তাহার জীবন বিফল।
স্ত্রীকে যে আপন বলে সেজন বর্ব্বর।

কবি বলিতে চাহিয়াছেন—মনসার মত হতভাগিনী কেহ নাই। বাসরঘরেই স্বামীর দ্বারা সে পরিত্যক্তা।—জন্মাবধি কাহারও স্নেহ-

মমতা সে পায় নাই—বিমাতার নির্য্যাতনের অবধি ছিল না—দেব-দেবীদের মধ্যে তাহার স্থান হইল না—শেষে পিতাও বিমাতার অনুরোধে তাহাকে বনবাস দিল। এই মনসার একমাত্র সান্ত্বনা—তাহার পূজাপ্রচার। স্বর্গে দেবদেবীর মধ্যে তাহার স্থান হয় নাই—মর্ত্তে কি করিয়া সে দেবী বলিয়া স্বীকৃত ও পূজিত হইবে—ইহাই একমাত্র জীবনের আকাঙ্ক্ষা। দেবাদিদেবের দুহিতা হইয়া সে চির অনাদৃতা কেন থাকিবে? তাহার দেবীত্ব প্রতিষ্ঠায় কেহই তাহাকে সাহায্য করিল না। কাজেই নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইল। এই শক্তি—ছল, বল, কৌশল।

মনসার ছলনায় ওঝার মৃত্যু ও কমলার আক্ষেপ—অনুতাপের দৃশ্যটি করুণ। এই দৃশ্যে গুপ্তকবি কিঞ্চিৎ কবিত্বের সঞ্চার করিয়াছেন।

ওঝা ত মরিল—এখন চাঁদকে কি করিয়া জব্দ করা যায়? মনসার মনে স্বস্তি নাই—নিজের বিষেই মনসা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

> পদ্মাবতী বলে স্নান ভোজন না রোচে।
> কোন মন্ত্রণা করিলে এই দুঃখ ঘোচে।
> নিশ্বাস ছাড়িয়া পদ্মা হইল ঘরের বাহির।
> নয়নের জলধারে তিতিল শরীর॥
> আঁচলে মুছিল নেতা নয়নের পানি।
> মনোদুঃখে মনসার মুখে নাহি বাণী॥

চাঁদের মহাজ্ঞান থাকিতে চাঁদের কোন ক্ষতি করাই সম্ভব হইবে না। এই মহাজ্ঞানহরণের জন্য মনসা যে ছলনার আশ্রয় করিল—তাহাতে চাঁদেরও চরিত্রমর্য্যাদা ম্লান হইয়া গেল। বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের শোচনীয় কাহিনী মনে পড়ে। মীননাথের মহাজ্ঞান

এমনি করিয়া মহামায়ার মহামায়ায় কদলীপাটনে বিনষ্ট হইয়াছিল। মনসা নটীর বেশ ধরিয়া চাঁদকে কামমোহিত করিয়া তাহার মহাজ্ঞান হরণ করিল। মনসার ছলনার দৃশ্যটিতে কবি রসসঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। একটা বিরাট পুরুষের এইরূপ পদস্খলন যে কত বড় Tragedy কবি তাহা দেখাইয়াছেন।

এটা যেন একটা জাতীয় দুর্ঘটনা। কবি একটি প্রবল মনোবৃত্তি হইতে আর একটি প্রবল মনোবৃত্তিতে প্রয়াণের যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন তাহাতে দক্ষ শিল্পীর কৃতিত্ব পরিস্ফুট হইয়েছে—কোপজলে নিভাইল মদন অনল। গঙ্গার বিদায়ের পর গঙ্গাতীরে স্তম্ভিত শান্তনুর মত চাঁদ দাঁড়াইয়া রহিল।

মহাজ্ঞান হারাইয়া চাঁদ যে অনুতাপ করিতে লাগিল—তাহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। কিন্তু চাঁদ তাহাতেও দমিল না।

সাধারণ জন নহে চাঁদ মহাবীর। হেন নিধি নিল তবু আছয়ে সুস্থির ॥
মহাজ্ঞান গেল চান্দর টুটিলেন বল। অধিক পদ্মার সঙ্গে বাধিল কোন্দল ॥

মনসার হিংস্রতা বাড়িয়া গেল। মনসা চাঁদের ছয় পুত্রের ভাতে বিষ মাখাইয়া আসিল। ছয় পুত্র একদিনেই মারা গেল। পুত্রহারা সনকার বিলাপ একদিন মঙ্গলসঙ্গীতের মারফতে বাংলা দেশের আকাশ বাতাসকেও বিচলিত করিয়াছিল।

এদিকে মনসা তাহাতেও চাঁদকে বশীভূত করিতে পারিল না। তখন পূজাপ্রচারের জন্য ঝালু ও মালু জেলেকে ধরিল।

ঝালু মালু মনসার বরে ধনেশ্বর হইল। তাহারা একেবারে "লক্ষ ছাগ দিল উৎসর্গিয়া।" চাঁদ হেঁতালের লাঠি হাতে মালুর বাড়ীতে মনসার ঘট ভাঙ্গিতে গেল। মনসা ঘটটিকে লুকাইয়া ফেলিল। চাঁদ গালি দিতে দিতে চলিয়া আসিল। সনকা

বিষহরীর ব্রতদাসী—তাহার প্রতি মনসার একটা কর্ত্তব্য আছে! তাহাকে মনসা স্বপ্ন দিল ঝালুর বাড়ীতে গিয়া পূজা দাও আমি তোমাকে বর দিব। সনকা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া ঝালুর বাড়ীতে পূজা দিয়া পুত্রবর চাহিয়া লইল।

ঝালুমালুর উপাখ্যান হইতে মনে হয়—এদেশে হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরে মনসাপূজাপ্রচারের আগে জালিয়া কৈবর্ত্তশ্রেণীর (ঝল্লমল্ল?) লোকদের মধ্যে তাঁহার পূজার প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মনসার তৃপ্তি নাই— চান্দের পূজা চাই। সনকার গর্ভে তিনি অনিরুদ্ধকে শাপভ্রষ্ট করিয়া প্রেরণ করিলেন। কেবল অনিরুদ্ধের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বলিয়া অনিরুদ্ধের পত্নী উষাকেও শাপভ্রষ্ট করিয়া সায়বেনের ঘরে প্রেরণ করিলেন। এজন্যও মনসাকে অনেক ছলকৌশল অবলম্বন করিতে হইল। মঙ্গলকাব্যে একটা যুদ্ধ বর্ণনা না করিলে কাব্য সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। এখানে যমরাজের সঙ্গে মনসার নাগসৈন্যের একটা মহাযুদ্ধের বর্ণনা করা হইয়াছে।

ছয় পুত্র হারাইয়া চান্দের গৃহে মন টিকিল না। চান্দ বহির্বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পাটনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। একটা অজুহাত হইল—

ধনে মহাধনী হইলে সর্ব্বলোকে যশ।
বাহুতে অর্জ্জিয়া ধন খাইতে বড় রস।

নিজের বাহুবলে ধন অর্জ্জনের জন্য চান্দ চৌদ্দ ডিঙ্গা সাজাইয়া বাণিজ্যের জন্য সঙ্কল্প করিলেন। লখীন্দর তখন সনকার গর্ভে। ধনপতি সওদাগরের মত চান্দ পত্রী লিখিয়া রাখিয়া গেলেন।—

আমার বচন প্রিয়া রাখিও হৃদয়। লখীন্দর নাম থুও যদি পুত্র হয়॥

কন্যা হৈলে নাম থুও প্রিয় শশিকলা।
এতেক বলিয়া পত্র সোনার হাতে দিলা।

তারপর চাঁদের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনার মতই। সমুদ্র এই বর্ণনায় চণ্ডীমঙ্গলের মতই নদীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের বিশালতা বা বিরাটত্ব কিছুই নাই। চাঁদ পথে কমলে কামিনী দেখিল না বটে—কিন্তু ধনপতির পুত্র শ্রীপতির মনসাপূজার মন্দির দেখিল। চাঁদের মনে হইল

আমারে ভাণ্ডিয়া কানী ভাল পাইয়াছে ঠাঁইখানি
বর্ব্বর ভাঁড়াইয়া পূজা খায়।

চাঁদ ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। সমুদ্রচরের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনসার ঘট ভাঙ্গিয়া দিল।

মঙ্গল কাব্যের কবিরা অজ্ঞাত রহস্যময় দেশে বণিকদের বাণিজ্যে পাঠাইতেন। বিদেশ সম্বন্ধে কবিদের কোন প্রত্যক্ষ ধারণা ছিল না। বিদেশ মাত্রই ছিল তাঁহাদের কাছে আজব দেশ! বিদেশের আচার আচরণ সম্বন্ধে কবিরা আজগুবি ধারণা পোষণ করিতেন। যত জঘন্য সামাজিক প্রথা বিদেশী লোকদের ঘাড়ে চাপাইতেন। গুপ্ত কবিও সেই পদ্ধতি অনুসারে দক্ষিণ ভারতের লোকদের পশ্বাচারী ও কদাচারী বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা অনেকটা রঙ্গরসের সৃষ্টির জন্য। চাঁদ দক্ষিণ পাটনে গেলেন। সেখানকার কোতোয়াল দই মনে করিয়া—

চূণ খাইয়া জিহ্বার গেল ছাল। থুথু করে ফেলে বলে ঘটিল জঞ্জাল॥

দেশের লোক পান খাইতে জানে না। কোতোয়াল চাঁদের ডিবায় পান খাইয়া রাজ দরবারে গেল।

চারিভিতে লোক সব কানাকানি করে।
আজ কেন কোতোয়ালের মুখে রক্ত পড়ে॥

কবি বরিশালের লোক। তাঁহার দেশে নারিকেল অজস্র। তাঁহার বিশ্বাস দক্ষিণ ভারতেও বুঝি নারিকেল নাই। দক্ষিণ ভারত হইতেই যে নারিকেল আসিয়াছে তাহার সন্ধান তিনি জানিতেন না। সাধু রাজাকে নারিকেল উপহার দিলেন—উহাকে বিষফল মনে করিয়া রাজা অনেক কাণ্ড করিলেন। নারিকেল লইয়া কবি সুলভ রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

পণ্যবিনিময় বাণিজ্যের প্রধান অঙ্গ। এই পণ্যবিনিময়ের ছড়া চণ্ডীমঙ্গলে আছে। বর্ব্বর দেশের রাজাকে ঠকাইয়া বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালী বণিক কিরূপে অতি সুলভ দ্রব্যের বিনিময়ে দুর্লভ বস্তু লাভ করিতেছে —গুপ্তকবি তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন।

চাঁদ নারিকেলের বদলে শঙ্খ, মূলার বদলে গজদন্ত, হরিদ্রার বদলে সোনা, কলাইএর বদলে প্রবাল এবং চটের বদলে পট্টবস্ত্র পাইয়া নৌকাবোঝাই করিতেছে। রাজাকে চট পরাইয়া কবি কৌতুক রসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

চট পরিয়া রাজা ডাক দিয়া আনে খোজা আবাসে পাঠাল কতখান।
রাণীরে বলিও বাণী পরুক পাটের ভূমি যেন দেখি জুড়ায় পরাণ।

চণ্ডীমঙ্গলেও চট লইয়া এই কৌতুকের কথা আছে।

গুপ্তকবিও পণ্যবিনিময়ের একটি ছড়া রচনা করিয়াছেন—বাউস বদলে স্বর্ণকলস, বারকোস বদলে পিতলের থালা, কুকুর বদলে ঘোড়া, কবুতর বদলে ময়ূর, কাক বদলে কাকাতুয়া, টিয়ার বদলে শুকপাখী, মৃগ বদলে মুক্তা, মুসূরীর বদলে রক্ত হিঙ্গুল, ছাগল বদলে হরিণ ইত্যাদি, Barter and exchange এর ফর্দ্দ দেখিয়া হয়ত চিন্তাশীল থিসিস-(Thesis)লেখক বলিলেন—বাঙ্গালী জাতি বাণিজ্য ব্যাপারে বড়ই বুদ্ধিমান ও সুদক্ষ ছিল। ভারতবর্ষের কোন জাতিবাণিজ্যে

বাঙ্গালী জাতির সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু হায়, মঙ্গলকাব্যে বাণিজ্য বেসাতির কথা পড়িলে মনে হয়—বহির্বাণিজ্যে বাঙ্গালী প্রায় একালের মত সেকালেও অজ্ঞ ছিল। বাণিজ্য-ব্যাপারে বাঙ্গালীর যদি যথেষ্টরূপ জ্ঞান থাকিত—তাহা হইলে তাহাদের কবি বাণিজ্যযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া বাণিজ্যের সর্ব্ববিষয়ে এমন করিয়া কল্পনার সাহায্য লইতেন না, অন্যান্য দেশকে এমন বর্ব্বর মনে করিতেন না এবং নিজের অনভিজ্ঞতাকে এমন করিয়া ছন্দে অমর করিয়া রাখিতেন না।

মনসার প্রত্যেক লাঞ্ছনার পূর্ব্বে চাঁদ নূতন করিয়া অপরাধ করে, নূতন করিয়া মনসার অপমান করে। দক্ষিণ পাটন হইতে ফিরিবার প্রাক্‌কালে চাঁদ সকল দেবদেবীর পূজা করিল—কিন্তু মনসাকে বাদ দিল। মনসা জরতীবেশ ধরিয়া চাঁদকে অনুনয় করিয়া বলিল।

মোর তরে কোপ এড় সাধুর কুমার।
মোর তরে ফুলজল দেও একবার॥
মোর পূজা করি চাঁদ সুখে চলি যাও।
কান্তারে বসিয়া আমি ভরাইব নাও।
চাঁদ বলে কাণী তোর লাজ নাই চিতে।
কোন মুখে আইলি তুই মোর পূজা পেতে।
যেই হাতে পূজি আমি শঙ্কর ভবানী।
সেই হাতে পূজা খাইতে চাহ দুষ্ট কাণী॥
যেই হাতে পূজি আমি দেবী দশ ভূজা।
কোন মুখে চাও তুমি সে হাতের পূজা॥

এই বলিয়া চাঁদ মনসাকে মারিতে গেল।

ত্রাসে ধায় পদ্মাবতী আলু থালু চুলি।

মনসা প্রতিশোধ লইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। চাঁদের চৌদ্দ

ডিঙ্গা ডুবাইতে হইবে। চাঁদ শিব দুর্গার আশ্রিত। তাঁহাদের আদেশ না পাইয়া কি করিয়া ডিঙ্গা ডুবানো চলে? চাঁদ যাঁহার ভক্ত তিনি ইষ্টানিষ্টে উদাসীন, নিঃসম্বল বৈরাগী—তিনি ভক্তের ঐহিক সুখ সম্পদের জন্য আকুল নহেন—তিনি তাহাকে পরমপদ ও দিব্যজ্ঞান দান করেন। তাই শিবের সেবা করিয়া চাঁদ তাঁহার ঐহিক সম্পদ রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভক্ত, নিঃসম্বল হইলেই তাঁহার প্রিয়তর ও নিকটতর হয়। এই সত্যটি কবি অন্যভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। মনসা ডিঙ্গা ডুবাইবার অনুমতির জন্য শিবের কাছে গিয়া নিজের অপমানের কাহিনী বিবৃত করিলেন।

এতেক শুনিয়া কহিলেন শূলধর।
তুমি মর নহে মরুক চাঁদ সদাগর॥
তোমাদের যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।
মনে ইচ্ছা হয় মোর হই দেশান্তরী॥
দূরে ঘোচ পদ্মা তুই হেতা হতে যা।
চাঁদ খাক তোর মাথা তুই তারে খা॥

মনসা শিবের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। শিবের কন্যাস্নেহ উথলিয়া উঠিল। শিব শেষে অনুমতি দিলেন—যাও ধনসম্পদ্ ডুবাইয়া দাও গিয়া কিন্তু,—জল মধ্যে তার যেন প্রাণ রক্ষা পায়।

অবশ্য মনসাও চাহে না চাঁদ মরে। চাঁদ মরিলে তাঁহার পুজা প্রচার করিবে কে? মনসা সাহস পাইয়া ডিঙ্গা ডুবাইতে গেল। গঙ্গার সাহায্য চাই। চাঁদ গঙ্গার ভক্ত। গঙ্গা রাজী হইলেন না। অভিশাপের ভয় দেখাইয়া মনসা বিমাতা গঙ্গাকে সম্মত করিল। তারপর মঙ্গল কাব্যের ডিঙ্গা ডুবানোর পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কবি সমস্ত নদনদীকে, উনপঞ্চাশ বায়ুকে ও মেঘগণকে আনাইলেন। ১৩টি

ডিঙ্গা একে একে ডুবিল। মধুকরে চাঁদ নিজে আরোহী। চাঁদ যে ডিঙ্গায় আরোহী সে ডিঙ্গা কিছুতেই ডুবিবে না—চাঁদের পিতা মহাদেবের কাছে এই বর পাইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, নিজে চণ্ডী তাহার কাণ্ডারে বসিয়া আছেন।

মনসা চণ্ডীকে বলিল—তুমি যদি নৌকা ছাড়িয়া না যাও তাহা হইলে তোমার কার্ত্তিকগণেশকে বিষদৃষ্টিতে মারিয়া ফেলিব। সন্তানের অমঙ্গলের ভয়ে মা চণ্ডী মধুকর ছাড়িয়া পলাইলেন। এখন চাঁদ নৌকায় থাকিলে নৌকা ডুবে না। তখন মনসা মঙ্গলকাব্যের চির সহায় হনুমানকে স্মরণ করিল। গড়িবার কাজ যেমন বিশ্বকর্ম্মার, ভাঙ্গিবার বা নষ্ট করিবার কাজ তেমনি হনুমানের। হনুমান আসিয়া চাঁদকে জলে ফেলিয়া দিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। নৌকা ডুবাইবার আগে মনসা আর একবার চাঁদকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

পদ্মা বলে বাপ তুমি হও হীনজন।
কি কারণে গালি মোরে পাড় সর্ব্বক্ষণ।
অহঙ্কার ত্যজি যদি এখনো দাও ফুল।
কাণ্ডারে বসিয়া নিয়া দিব দেশকূল।
চাঁদ বলে কাণী তোর মুখে লাজ নাই।
কপট করিয়া কথা কহ মোর ঠাঁই।

চান্দ জলে ভাসিতে ভাসিতে দেবতাদের গালি দিতে লাগিল—"এত দেবের মধ্যে মোরে কাণী করে বল!" দেবতারা দৈববাণীতে বলিলেন—"পদ্মাবতী পূজা কর চাঁদ সদাগর।" তাহার উত্তরে চাঁদ বলিল—

কোন জনে আমারে কহিল হেন কথা।
নিকটে পাইলে তার ভাঙ্গিতাম মাথা॥

এমন বিপদেও চান্দ মনসার পূজা করিতে রাজী হইল না।

নাগরথে পদ্মাবতী চাহেন কৌতুকে।
চিৎ হইয়া ভাসে চান্দ সমুদ্রের বুকে।

এই চিত্র খুবই নিষ্ঠুর—কিন্তু অপূর্ব্ব।

চান্দকে প্রাণে মারা চলে না। কাজেই চান্দ শেষ পর্য্যন্ত কূলে উঠিল। কটিতে বস্ত্র নাই। বিষহরী ব্রাহ্মণীবেশে গিয়া একহাত বস্ত্র দিয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিল।

এইবার মনসার নিগ্রহ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া উঠিল। ক্ষুধায় কাতর চান্দ কলার বাকল সংগ্রহ করিল; মনসা গাভীরূপ ধরিয়া তাহা খাইয়া গেল। একমুঠি চাউল জোগাড় করিল, মনসা দাঁড় কাক হইয়া লইয়া গেল; একটি মাছ জোগাড় করিল—মনসা চিল হইয়া ছোঁ দিয়া লইয়া গেল। কাঠ কাটিতে গেল—সেখানে ভীমরুল হইয়া চান্দের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল; কাঠের বোঝা কুমারকে বিক্রয় করিল—কাঠের বোঝা সাপের বোঝা হইয়া গেল—কুমার তাহাকে ধরিয়া দারুণ প্রহার করিল; দাড়ি কামাইতে বসিল—নেতা নাপিত হইয়া কামাইতে আসিল—অর্দ্ধেক কামাইয়া সে প্রস্থান করিল; কলাইক্ষেতে কলাই খাইতে গিয়া আবার কানমলাই খাইল। একজন চাষীর ক্ষেতে ধান নিড়াইতে গিয়া বিষহরীর মায়ায় ধানই উপড়াইয়া ফেলিল—সেজন্যও নিদারুণ প্রহার লাভ করিল। বন্ধুর বাড়ীতে চাঁদ আশ্রয় পাইল—সেখানেও নিগ্রহ আরম্ভ হইল। হাতের ভাত মুখে যাইবার আগে উড়িয়া যাইতে লাগিল। কোনপ্রকারে জীর্ণ-শীর্ণ দেহে অতি কষ্টে অকথ্য লাঞ্ছনা সহ্য করিতে করিতে চাঁদ নিজের গৃহসংলগ্ন পুষ্পবনে উপনীত হইল।

কবি এখানে চাঁদের মর্য্যাদা একেবারে বিস্মৃত হইয়া মনসার

কৌতুকে কুতুকী হইয়াছেন। চাঁদের দাসী ফুল তুলিতে আসিয়া চাঁদকে চোর মনে করিয়া ধরিয়া ফেলিল---তারপর "মনসুখে করে আগে চরণ প্রহার। দাসীর প্রহারে চাঁদ হইল জর্জ্জর। প্রাণ রাখ রাখ বলি ডাকে উচ্চস্বর।" শুধু তাই নয়—কলার ছোট দিয়া পিঠমোড়া করিয়া সাধুকে বাঁধিয়া দাসী সনকার কাছে লইয়া গেল।

না চিনিয়া সনকা বলিল ছুরি আন।
হাতে ধরি চোর শালার কাট দুই কাণ।

চাঁদের এই যে লাঞ্ছনা ইহা মনসার দ্বারা সম্পাদিত নয়। এই লাঞ্ছনার দ্বারা কবি তাঁহার কাব্যকেই কলঙ্কলাঞ্ছিত করিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের মাধুর্য্য কিছুই বাড়ে নাই, কবির মনসাভক্তির আতিশয্যই প্রকাশিত হইয়াছে।

চান্দ যখন বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে, তখন লখীন্দরের জন্ম হইল।

বেহুলার সহিত লখীন্দরের বিবাহও বিষহরীর চক্রান্তে ঘটিল। বিষহরী নারদকে স্মরণ করিলেন—নারদ গণক সাজিয়া লগ্ন স্থির করিলেন। বিবাহের রাত্রে সর্পদংশনে লখীন্দরের মৃত্যু হইবে—চান্দ ইহা শুনিয়াছিলেন–কিন্তু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। বেহুলা মরা বাঁচাইতে পারে, ইহা জানিতে পারিয়া চান্দ হয়ত কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, লোহার কলাই সিদ্ধ করিতে পারে যে নারী, সে যে সামান্য নয়—চান্দ তাহা বুঝিয়াছিল।

বিষহরী লখাইএর ললাট-লিপির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। ছদ্মবেশে গিয়া বেহুলা লখীন্দর দুইজনকেই অভিশাপ দিয়া আসিল। চান্দ সাঁতালী পাহাড়ে লোহার বাসরঘর তৈয়ার করাইল। বিষহরী ছদ্মবেশে "কামারদের সর্দারকে একটি ছিদ্র রাখিবার জন্য আদেশ দিল। "কর্ম্মকার

ধর্ম্মভীরু লোক—সে কিছুতেই এ কার্য্য করিতে রাজী নয়। শেষে প্রাণের ভয়ে রাজী হইল।

লখীন্দরকে বিবাহযাত্রায় বিদায় দেওয়ার সময় সনকার প্রাণের কথা কবি মর্ম্মস্পর্শী ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। যে যাত্রা অশুভ সে যাত্রার প্রারম্ভে যে সকল দুর্নিমিত্ত ঘটিবার কথা জ্যোতিঃশাস্ত্রে আছে—মঙ্গলকাব্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া লখীন্দরের বিবাহযাত্রাকালে সেগুলি একত্রে গ্রথিত করা হইয়াছে। সকল কাব্যেই এইরূপ অশুভ সূচনার বিবৃতি আছে। এই অংশ কাব্যের অপেক্ষা পঞ্জিকার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের কথায় সংখ্যার লেখাজোখা' নাই। সকল সংখ্যাই 'বহু' বুঝাইতে ব্যবহৃত।

দ্বারেতে পাইক আছে লাখ দুই তিন।
দশ হাজার ঢোল বাজে পাঁচ হাজার কাঁসি॥

সুপুরুষদর্শনে নারীদের রূপমুগ্ধতা ও স্বপতিনিন্দা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য্য প্রথা। ইহা সুরুচির পরিচায়ক নয়। ইহাতে নীচ-শ্রেণীর একটা কৌতুকরসের সঞ্চার হয়। অবশ্য ইহাতে নায়কের রূপের চমৎকারিতা প্রকাশ পায়। গুপ্তকবি চিরপ্রচলিত প্রথারই অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিশেষ রসসঞ্চার করিতে পারেন নাই। তবে বিগত-যৌবনাদের আক্ষেপ বা আত্মসান্ত্বনার যে বর্ণনাটি আছে তাহা বেশ সরস হইয়াছে। দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া পঞ্চশরে দগ্ধ যত বণিকের নারী স্বীকার করিল—

বেহুলা যেমন কন্যা লখাই তেমন বরা।
পাতিল জুখিয়া যেন কুমারের শরা।

মনসার আর তর সহে না। দেবদেবীরা বিবাহ দেখিতে গিয়াছে,

শুনিয়া মনসাও গেল। লখীন্দরের মাথায় ছাতা ভাঙ্গিয়া পড়িল। মনসা পাঠাইল নাগচ্ছত্র। নাগচ্ছত্র দেখিয়া লখীন্দরের মূর্চ্ছা ও মৃত্যু হইল। বেহুলার সঙ্গে তখনো বিবাহ হয় নাই। বেহুলাকে এখানে আর মানবী রাখা হয় নাই—তাহাকে দেবকন্যাতে পরিণত করা হইয়াছে। কারণ, বেহুলা অনায়াসে মনসার পুরীতে গিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রথায় আত্মপীড়নের দ্বারা মনসাকে তুষ্ট করিয়া মৃতসঞ্জীবনী বিয়নী ও অমৃতজল লইয়া আসিল এবং তদ্দ্বারা লখীন্দরকে পুনর্জ্জীবিত করাইল। কয়েক ঘণ্টা পরেই লখীন্দরের মৃত্যু হইবে —তখন বেহুলার এই মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আর কাজে লাগিবে না। অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার লইয়া কাব্যরচনায় কোন দোষ হয় না, তাহাতেও রসসৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যেও শৃঙ্খলা এবং বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তিকর একটা সুসঙ্গত ক্রম থাকা চাই। নতুবা রসসঞ্চার হয় না। কবি এখানে পুরাণের স্বৈরাচারকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন।

কাঁচলি রচনা কি যে এমন একটা বিচিত্র ব্যাপার তাহা বুঝা যায় না। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যে এমন কি শিবায়নেও কাঁচলির কারুকার্য্যের একটা বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এজন্য বিশ্বকর্ম্মার শরণ গ্রহণ করা হয়। বেহুলা মনসার সঙ্গে দেখা করিয়া এই অপূর্ব্ব কাঁচলি একখানি পাইলেন। এই কাঁচলির কথা একটা প্রথার অনুবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই নয়।

লখীন্দর লোহার বাসরে শায়িত। বেহুলা জাগিয়া আছে। একে একে অষ্টনাগকে দুধকলা দিয়া সে বন্দী করিল। কবি বাসর-ঘরে বেহুলাকে দিয়া ভাত রাঁধাইয়াছেন কেন, ইহার সার্থকতা বুঝা গেল না। যাহাই হোক, অনেক নাগ ফিরিয়া গেল—শেষে মনসা কালী নাগকে

স্মরণ করিল। বেহুলা জাগিয়া থাকিতে কালী নাগিনীর ক্ষমতা নাই যে দংশন করে। নেতা বেহুলার চোখে ঘুম আনাইয়া দিল। কালী নাগিনী বাসরের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ করিল। কিন্তু এই নাগিনীরও অন্তরে দয়া আছে। দংশন করিতে আসিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কবি এই চিত্রটিকে সরস করিয়াই অঙ্কন করিয়াছেন। কালীনাগের বিলাপ—

মুই হেন অভাগিনী হেন ছার নাহি জানি।
ছার কার্য্যে কেন আমি আসি।
ফিরিয়া ঘরেতে যাই পদ্মারে বড় ডরাই
খাইতে পরাণে দুঃখ বাসি॥
মুই যদি জানি সাঁচে নির্ব্বন্ধেতে এই আছে,
তবে আমি রহিতাম ভাঁড়ি।
আসিতাম রাত্রিভাগে দেখিয়া যে দুঃখ লাগে
হেন কন্যা হইবেক রাঁড়ী।

"তুমি পাষরী মনসা, তোমার নিজের পেটের ছেলেও ত আছে! —দুঃখিনী জননীর একমাত্র পুত্রকে হত্যা করিতে তোমার দয়া হয় না? আমি নাগিনী, আমারও মনে দয়া জন্মিতেছে—আহা, এমন মায়ার পুতলী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ বিষে বিবর্ণ হইয়া যাইবে?"

নাগিনীর চোখে জল পড়িতে লাগিল। কিন্তু তবু পদ্মার আদেশ পালন করিতেই হইবে। নিরপরাধ এই মহাপুরুষকে কি করিয়া দংশন করি, এই ভাবিতে ভাবিতে নাগিনী লখীন্দরের পায়ের কাছে গেল। লখীন্দর ঘুমের ঘোরে নাগিনীর উপর পা রাখিল। তখন নাগিনী দোষ পাইয়া দেবতাদের সাক্ষী করিয়া দংশন করিল।

জোড়হস্তে বলে নাগ শুনহ গোঁসাই।
পদ্মার বোলে কামড়াই মোর দোষ নাই।

এ যেন মহাভারতের বৃকোদরের বিকর্ণ-বধ।

লখাই বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল। বেহুলা নিদ্রা যাইতেছে নেতার মায়াপ্রভাবে। বেহুলার কালনিদ্রা ভাঙ্গিল না। লখীন্দর বিলাপ করিয়া বলিল—

বেহুলা,—তোমার অঞ্চলের নিধি নিল চোরে।
বিয়া হইল আজু রাতি না চিনিলা নিজ পতি
নাগিনী দংশিয়া গেল মোরে॥
এ তোমার কেমন সাহস।
যার পতি সর্পে খায় সে কেমনে নিদ্রা যায়,
নারীর রাখিলে অপযশ।
হাতে নরসিং কাতি মিছা সে জাগিলা রাতি
কোনকার্য্যে এতেক প্রহরী।
জাগিয়া এতেক জন রাখিতে নারিলা ধন,
প্রভাতে নাগিনী করে চুরি॥
দংশিল দারুণ নাগে গারুড়িয়া কেবা জাগে
কুটুম্ব ব্যথিত আছে কে?
কালনিদ্রা পরিহর জাগিয়া জিজ্ঞাসা কর
আমারে জিয়াতে পারে কে?

বেহুলার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। লখীন্দর বিলাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুকালে মা বাপকে দেখিল না—পার্শ্বে শায়িতা নববধূকেও একটি বিদায়বাণীও বলিয়া যাইতে পারিল না। পিতা-মাতা ও নববধূর জন্য বেদনা

লখীন্দরের নিজের বিষের বেদনাকে ছাড়াইয়া উঠিল ; তাহার শেষ কথা—

ছয় ভাইয়ের শোকে মায়ের সদা তনু পোড়ে।
আমি বিনে জননী কেমনে রবে ঘরে।

মনসাই স্বপ্ন দিয়া বেহুলাকে জাগাইল—

উঠ উঠ বেহুলা গো গা তুলিয়া চাও।
লখীন্দর চলিয়াছে কত নিদ্রা যাও!

বেহুলা ধড়ফড করিয়া জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে কোলে করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল—

এ নব যৌবন মোর গেল ছার খার।
কপাল চিরিয়া দেখি কিবা আছে আর॥
আম ফলে থোকা থোকা নুয়্যা পড়ে ডাল।
নারী হইয়া এ যৌবন রাখিব কতকাল॥
সোনা নয় রূপা নয় অঞ্চলে বান্ধিব।
হারালাম প্রাণপতি কোথা গিয়া পাব॥

বেহুলার সব চেয়ে বেদনা এই—

বিয়ার রাতে প্রাণপতি মাগিল আলিঙ্গন।
লজ্জা করি অভাগিনী নাহি দিল মন॥

প্রভাত হইবামাত্র আইয়োদের দল সঙ্গে লইয়া সনকা বাসরের দ্বারে বরণ করিতে আসিল। তারপর—

মাথা হতে বরণকুলা ফেলে আছাড়িয়া।
ভূমেতে পড়িল রাণী হাহাকার করিয়া।

সনকার কণ্ঠে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জননী-হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়াছে। সনকা এয়োদের আহ্বান করিয়া বলিতেছে—,

তোমা সব সখীগণ হও একধার।
লখাইএর পাশে বসুক বধূ একবার।

তারপরই—

সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী।

এই চিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

চান্দ সদাগর দারুণ শোকশেলের আঘাত পাইলেন।

কিন্তু দ্বন্দ্বাতীত মহাপুরুষ—

স্বভাবে বৈষ্ণব সাধু যোগমন্ত্র জানে।
কারণ জানিয়া শোক পাশরিল মনে॥

চান্দ সনকাকে যাহা বলিয়া প্রবোধ দিল—তাহা ব্রহ্মজ্ঞ সিদ্ধ-পুরুষেরই উপযুক্ত কথা—

অস্থির হৈয়াছ প্রিয়ে কিসের কারণ।
শিব শিব বলি কর শোক সংবরণ॥
শীতল চন্দন যেন যেন আভের ছায়া।
কার জন্য কাঁদ প্রিয়া সব মিছা মায়া॥
মিছামিছি বল কেন তোমার আমার।
যে দিছিল লখীন্দর নিল সে আর বার॥

চান্দ বেহুলাকে বলিলেন—পারত সহমরণে যাও।

বেহুলা বলিলেন—আমি শব লইয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া জলযাত্রা করিব। পথে যদি কোন ওঝা ইঁহাকে বাঁচাইতে পারে তবে স্বামীকে সঙ্গে করিয়া আনিব—নতুবা চিরবিদায়।

কলার মান্দাস গড়া হইল। তাহাতে লখীন্দরের শব শায়িত হইল। বেহুলা তাহাতে উঠিতে গেল।

সোনা বলে বধূ তুমি আমার কথা রাখ।
লখাইএর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক ॥

বেহুলা শ্বাশুড়ীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিল—

মরা স্বামী লইয়া যাব দেবের সমাজ।
শিবপুরী গেলে মোর সিদ্ধ হবে কাজ ॥
পৃথিবীতে আশা করি রাখিব ঘোষণা।
জিয়াইব নিজ পতি ভাসুর ছয় জনা।
সতী পতিব্রতা মাতা ধর্ম্মেতে আগুলি।
আশীর্ব্বাদ করি দেও চরণের ধূলি ॥

এই বলিয়া সে তিনটি নিদর্শন রাখিয়া গেল—সেই নিদর্শন দেখিয়া বুঝিতে হইবে তাহার কতটা কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে।

বেহুলা কলার মাজুস বা মান্দাসে জলযাত্রা করিল। মনসা এই পথে কখনও সহায়তা করিতেছে, কখনও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার নিজেরই মতিস্থিরতা নাই। বেহুলা মনসার প্রসাদে অনেক বিপদ হইতে নিস্তারও পাইল। আবার মনসার আদেশে নেতা বাঘিনী ও চিল হইয়া লখীন্দরের মৃতদেহ হরণ করিবার চেষ্টা করিল। বেহুলা স্তবস্তুতি করিয়া নেতার হৃদয় বিগলিত করিয়া মৃত দেহটি বাঁচাইয়া চলিল। এই জলযাত্রার আরম্ভ হইতেই নেতা বেহুলার প্রতি দয়াবতী।

যেখানে স্বাভাবিকতা রক্ষার কোন বালাই-ই নাই—সেখানে লখীন্দরের মৃতদেহ অক্ষুণ্ণ রহিতে পারিত—তাহাতে কাব্য বীভৎসতা হইতে মুক্ত হইত। কিন্তু সম্ভবতঃ বীভৎস রসের সৃষ্টিই কবির উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া, বেহুলার পাতিব্রত্যের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের জন্যই লখীন্দরের শবকে গলিত, কৃমিসঙ্কুল ও হুঙ্কারজনক করিয়া

তোলা হইয়াছে। বেহুলা সমস্ত ঘৃণা, জুগুপ্সা জয় করিয়া গলিত শব লইয়াই একলক্ষ্যে চলিয়াছে। ইহাতে বেহুলার দৃঢ় সঙ্কল্প ও অবিচল আত্মবিশ্বাসের সহিত মনসার মাহাত্ম্যও দেখানো হইয়াছে। কেবলমাত্র পঞ্জরাস্থি হইতেই মনসা লখীন্দরকে পুনর্জীবন দান করিতে পারিতেছে।

নেতার সাহায্য ছাড়া বেহুলা এই অসাধ্য সাধন করিতে পারে নাই। বেহুলা অপূর্ব্ব নৃত্যকলার দ্বারা শিবকে মোহিত করিল। সদ্যোবিধবা শোকাকুলা বেহুলা এমন দেব-মনোমোহন নৃত্য করে কি করিয়া? ইহাতে কি তাহার পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই? এ প্রশ্ন হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর এই—সব চেয়ে পাতিব্রত্যের চরম নিদর্শন ইহাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। পতির পুনর্জীবনের জন্য বেহুলা এতই তন্ময় ও একনিষ্ঠ যে, দারুণ শোকের মধ্যেও সে নৃত্যকলার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। পতির জীবনের জন্যই পতিবিয়োগবিধুরা অপ্সরীর অভিনয় করিতেছে—ইহার চেয়ে করুণ দৃশ্য আর কি আছে?

নেতার মন্ত্রণা, দেবতাগণের অনুরোধ, চণ্ডিকার ক্রোধ, শিবের আদেশ, বহুলার অনুনয় বিনয় ও মনসার প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি—কিছুতেই মনসাকে বিচলিত করিতে পারিল না। শেষে চাঁদ পূজা করিবে এই আশ্বাস যখন শিব দিলেন, তখন মনসার চিত্ত কোমল হইল।

বেহুলা কেবল লখীন্দর নয়, ছয় ভাশুর ও চৌদ্দ ডিঙ্গী সমস্ত ফিরিয়া পাইল।

বেহুলার দুঃখের অবধি নাই, চাঁদের ও সনকার দুঃখেরও অন্ত নাই। কিন্তু এদিকে মনসার দুঃখেরও অন্ত নাই।

পদ্মা বলে বেহুলা তুমি প্রাণের দোসর।
মোর যত দুঃখ সকল তোমার গোচর।
যত দুঃখ দিক চাঁদ কহিতে না পারি।
লঘুর যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি।

বারোমাসে চাঁদের আচরণে কত দুঃখ পাইয়াছে মনসা তাহা বিবৃত করিল। এইসূত্রে মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যা রচনার পদ্ধতিটিকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বারমাস্যা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কবি এখন পর্য্যন্ত কোন অবসর পান নাই। মনসার দুঃখের কাহিনী বর্ণনায় এই অঙ্গটিকে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।

ধীরে ধীরে লখীন্দরের কঙ্কালে একে একে মাংস রক্ত মেদ মজ্জা চর্ম্ম কেশ লাবণ্যের সঞ্চার-বর্ণনায় কবির কৃতিত্ব আছে। লখাই পুনর্জীবিত হইল কিন্তু অঙ্গে বস্ত্র নাই। বেহুলা—আথেব্যথে ছিঁড়ি দিল নেতের অঞ্চল।

বেহুলা স্বামী ও ভাশুরদের লইয়া চৌদ্দডিঙ্গা ও ধনজনসহ চম্পকনগরীর ঘাটে ফিরিয়া আসিল। বেহুলা ডোমনী সাজিয়া শাশুড়ীকে ছলনা করিতে আসিল। এই চিত্রটি সুন্দর। সনকা বেহুলাকে চিনিতে পারিল। বেহুলা যে শেষ পর্য্যন্ত ডোমের ঘরে জাতি দিয়াছে সনকা তাহাই বুঝিল। তবু সনকা বলিল—

যে হৈল সে হৈল তোর কপালের লিখন।
লখাইএর বদলে দেখি তোমার চাঁদ বদন
মনের কথা মোরে অকপটে কহ। দূরে না যাইও তুমি এইখানে রহ।

এটুকু কি চমৎকার নয়?

সকলের মিলন হইল। কিন্তু বেহুলা চাঁদকে বলিল—এইবার মনসার পূজা করুন, মনসার দয়াতেই সব ফিরিয়া পাইয়াছি। শিবের

কাছে আমি প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, আপনাকে দিয়া মনসার পূজা করাইব।

অহঙ্কার করি যদি না পূজ বিষহরী। এইরূপে আর বার যাব দেবপুরী।

চাঁদ উত্তর করিলেন—

ধনজনে কাজ নাই যাউক আর বার।
পদ্মা না পূজিব আমি কহিলাম সার॥

তখন আকাশ বাণী হইল। চান্দ আকাশে চাহিয়া দেখিল—বিষহরী ও শিবসীমন্তিনী চণ্ডী অভিন্ন, স্বতন্ত্র নয়। 'যেই জন ভগবতী সেই বিষহরী।' কবি মনসা-মাহাত্ম্য-প্রচারের জন্য আর একটু আতিশয্যের সহিত চণ্ডীকে দিয়া বলাইলেন—"পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি।" চান্দের তখন চৈতন্য হইল—চান্দের বলিবার কথা—একথা আগে বলিলে ত এত দুঃখ পাইতাম না। চান্দ বলিল—

যেই মুখে বলিয়াছি লঘুজাতি কাণী। সেই মুখে ভস্ম দেও জগৎজননী॥

চান্দ বুঝিল যে দেবতাকে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এবং স্ত্রীলোকেরা মনসা বলিয়া পূজা করে—ই দেবতাকেই উচ্চশ্রেণীর হিন্দুপুরুষরা মহাশক্তি চণ্ডীরূপে পূজা করে। একই মহাশক্তির দুইটি বিভিন্নরূপমাত্র। অতএব—মনসাকে উপেক্ষা করা মোহ-ভ্রান্তি মাত্র এবং যাহারা মনসা বলিয়া মহাশক্তির পূজা করে তাহাদের ঘৃণা করাও মূঢ়তা। ইহা সমাজের এমন একটা স্তরের কথা যে স্তরে চণ্ডীদেবী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহামায়ার সহিত একাত্মিকা হইয়া সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের উপাস্যা হইয়াছেন, কিন্তু মনসা তখন পর্য্যন্ত দেবীরূপে নিম্ন·শ্রেণীর উপাস্যা হইয়াই ছিলেন। মনসামঙ্গলে চাঁদের পরাজয়ের দ্বারা দেখানো হইয়াছে মনসা ও চণ্ডী

একই মহাশক্তির বিভিন্ন রূপ মাত্র। এই সংশ্লেষাত্মক জ্ঞান যখন উচ্চতর সমাজের লোকের মনে উদিত হইল—তখন মনসাদেবী অন্ততঃ বৈশ্যসমাজের উপাস্যা হইলেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দেবতাকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও শেষ পর্য্যন্ত গৃহলক্ষ্মীদের অনুরোধে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদের স্বীকৃতির একটা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা দানও করিলেন। ইহাই মনসামঙ্গলের শেষ কথা।

বেহুলা নগরপ্রবেশের আগেই সতীত্বের একটা পরীক্ষা দিল—তারপর চান্দের জ্ঞাতিরা আবার তিনটি পরীক্ষা চাহিল। সীতা একবার পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তারপর রামচন্দ্র লোকতুষ্টির জন্য আবার যখন পরীক্ষা চাহিলেন, তখন তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। বেহুলার কাছে যখন মূঢ় লোকেরা পরীক্ষা চাহিল, তখন বেহুলা বলিল—"আর পরীক্ষার প্রয়োজন নাই—পৃথিবীতে থাকিলেই পরীক্ষা। আমি উষা, আমার স্বামী অনিরুদ্ধ। আমরা শাপভ্রষ্ট হইয়া জন্মিয়াছি—মনসাপূজা-প্রচারের জন্য। আমাদের কাজ শেষ হইয়াছে। আমরা চলিলাম।" স্বর্গ হইতে রথ আসিল—বেহুলা-লখীন্দর স্বর্গে চলিয়া গেল।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল পড়িলে অনেক অংশকে অবান্তর বলিয়া মনে হইবে। কতক অংশ মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত পদ্ধতিরক্ষার জন্য সংযোজিত হইয়াছে, কতক অংশ রসবৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য। কাব্যে নবরসের সমাবেশ করিতে হয়, ইহাই কবিদের ধারণা ছিল—সেজন্য যে সকল রস মূল আখ্যানবস্তুর পক্ষে অনুকূল নয়—সে সকল রসের জন্য অবান্তর ব্যাপারের অবতারণা করিতে হইয়াছে।

দেবদেবীর কামরূপধারণ ও ছদ্মবেশধারণ মঙ্গলকাব্যের একটি

পদ্ধতি। গুপ্ত কবির কাব্যে এই পদ্ধতির বারবার পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরে অথবা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব কবির কাব্যে যে ধরণের অশ্লীলতা আছে গুপ্তকবির কাব্যে তাহা নাই। গুপ্তকবির কাব্যের অশ্লীলতা পুরাণের অশ্লীলতার মত। পুরাণকাবরা যে ভাবে দেবমানবের ঐন্দ্রয়িক দুর্ব্বলতার কথা অকুণ্ঠিত ভাবে বর্ণনা কবিয়াছেন—গুপ্তকবি সেইভাবেই করিয়াছেন। বিনাইয়া বিনাইয়া কামকেলির কথা উপভোগ্য করিয়া কোথাও বর্ণনা করেন নাই।

তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় এই মনসামঙ্গলে শিবের দুর্দ্দশা হইয়াছে সব হইতে বেশি। মহাযোগী মহাবৈরাগী শিবকে গুপ্তকবি সাধারণ মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন, কন্যাবৎসলতায় তাঁহাকে বিগলিত করিয়াছেন। শিব যদি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ইষ্টানিষ্ট ও সুখদুঃখে উদাসীন মহাযোগী নাই হ'ন, তবে তিনি ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করেন না কেন? ভক্তকে রক্ষা করিবার শক্তি তাঁহার নাই কেন? তিনি যেন মনসারই অধীন—মনসার তেজোবিক্রমে তিনিও ত্রস্ত। আমি এজন্যও শিবের দুর্দ্দশার কথা বলিতেছি না। সাধারণ মানুষের সমতলে নামাইয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত কামবিহ্বল করিয়া তোলা হইয়াছে। যখনই তিনি কোন সুন্দরী নারী দেখেন, তখনই তাঁহার সংযমচ্যুতি হয়। নিজ কন্যা মনসাকে না চিনিতে পারিয়া তিনি তাহার প্রতিও কামাসক্ত হইতেছেন। কামবিহ্বলতার জন্য চণ্ডীর ছলনায় তাঁহার দুর্দ্দশার চরম হইয়াছে। বেহুলা যখন নৃত্য করিতেছিল—তখন কামে মোহিত হইলেন মহাদেব। তিনি বলিলেন—

ভাবিয়া দেখিলাম আমি তোমার গতি নাই।
যৌবনদান কর মোরে ভজ মোর ঠাঁই।
কার্ত্তিকের মাতা ঘরে আছে মহামায়া।
তাহা হইতে তোমার অধিক করিব দয়া॥

শিব-চরিত্রে এত বেশি মানবিক দুর্ব্বলতা কোন কাব্যে নাই।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে সংস্কৃতশব্দের আতিশয্য নাই—পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দেরও বাড়াবাড়ি নাই। প্রচলিত মঙ্গলকাব্যের ভাষাতেই ইহা রচিত। মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে তাহার ভাষাও আসিয়া পড়িয়াছে। কবি পূর্ব্ববঙ্গের, কিন্তু কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের। কাজেই কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের আবেষ্টনীও এড়াইতে হইয়াছে—পশ্চিম-বঙ্গের আবেষ্টনীও পরিস্ফুট হয় নাই। কাজেই আবেষ্টনীর দিক হইতে ইহা বাস্তবতা-বর্জ্জিত বলিলেই হয়।

অধিকাংশ শব্দই দুইবঙ্গেই প্রচলিত। সেজন্য বাংলার কোন অংশের পাঠকেরই অসুবিধা ঘটে না বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বুঝিতে। পরিহার, কপটপ্রবন্ধ, এড়িয়া, আথান্তর, সতাই, সোসর, থাথার, সুঠাম, উভ'লড়, উভরায়, রীত, আছুক, জুয়ায়, জেঠি, আচাভুয়া, ভাণ্ডিয়া, রাঁড়ী, গাবর, গাড়র, ঝিকর, আথেবাথে (আতিবিথি), ফাঁপর, কটক, গুয়া, কাণ্ডার, ডুকর, এয়ো (আইও), নিছনি, সিজানো, বিদ্যমানে, নেত, সাজো (সদ্য), দোসর, বিয়নী, ডিঙ্গা, আগুসার ইত্যাদি শব্দ সকল মঙ্গল-কাব্যেই পাওয়া যায়।

গুপ্ত কবির মনসামঙ্গল প্রধানতঃ পয়ারেই রচিত। এই পয়ারের চরণ সর্ব্বত্র ১৪টি অক্ষরগণনাগত মাত্রায় গঠিত নয়—মাঝে মাঝে আক্ষরিক মাত্রার স্থলে পাদকমাত্রা (Syllabic) আছে।

ইহার ফলে গুপ্তকবির পয়ার—ধামালী ও আসল পয়ারের

মাঝামাঝি। সেজন্য স্থলে স্থলে পূরা ধামালীর চরণই দাঁড়াইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর পয়ার পংক্তিতে ঘন ঘন হসন্ত অক্ষরের প্রয়ো আছে —সেখানে ছন্দ ধামালীরই রূপ ধরিয়াছে। যেমন—

সোনার খাটে। বৈস মাগো। রূপার খাটে। পাও
দণ্ডে দণ্ডে। দিব আমি। শ্বেত চামরের। বাও।
লোকের আগে। ভাণ্ডিয়া কৈলে। সকল বড়াই। ঘোচে।
কোথায় শুন্‌ছ। ডোমের অন্ন। দেবের মুখে। রোচে।
ভূতের সাথে। শ্মশানে থাক। মাথায় ধর। নারী
সবে বলে। পাগল পাগল। কত সৈতে। পারি।

পয়ার একঘেয়ে হইবে বলিরা গায়েনকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন 'পয়ার এড়িয়া ভাই বলহ লাচাড়ি।' লাচাড়ি বলিতে কবি ত্রিপদী ছন্দ বুঝিয়াছেন। যেখানে কোন বিলাপ বা করুণরসের রচনা করিতে চাহিয়াছেন, সেখানে 'পয়ার এড়িয়া বল করুণ লাচাড়ি' বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন।

ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল

ক্ষমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস (কেতকা—মনসা) দামোদর-তীরের কবি।—পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গলরচয়িতাদের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি ইনি আবির্ভূত হ'ন।

গ্রন্থে ইনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন—ইহাতে দেখা যায়, ইনি কবিকঙ্কণের মত সরকারী ও জমিদারী কর্ম্মচারীর দ্বারা নিগৃহীত হইয়া গ্রামত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন। জগন্নাথপুর গ্রামে গিয়া ইনি ভূস্বামী বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা তারকেশ্বরের শিবমন্দিরনির্ম্মাতা ভারামল্লের আশ্রয় ও তিনখানা গ্রাম লাভ করেন। মনসাদেবী ছদ্মবেশে ইহাকে তাঁহার মঙ্গলকাব্য রচনা করিবার জন্য আদেশ দেন। স্বপ্নাদেশ ত গতানুগতিক প্রথা। জমিদার বা সরকারী অমাত্যের দ্বারা কবিনিগ্রহও পশ্চিমবঙ্গে যেন একটা প্রথায় দাঁড়াইয়াছিল।

কবি তাঁহার কাব্যে কায়স্থজাতির জন্য দেবীর কাছে কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন—অতএব তিনি কায়স্থই ছিলেন।

'সমুদ্রমন্থন' দিয়া এই গ্রন্থের আরম্ভ। কবি এই মন্থনের সার্থকতা দেখাইয়াছেন—তাঁহার রচিত কাহিনীরই পোষকতার জন্য। ইহা অবান্তর উপাখ্যান মাত্র নয়।

কপিলার দুগ্ধে ক্ষীরোদসাগর পূর্ণ। মহাদেব বলিলেন—"এস দেবগণ, ইহাকে মন্থন করিয়া অমৃত ভক্ষণ করি।" প্রজাপতি বলিলেন—"তবে ইহাকে দধি সমুদ্রে পরিণত কর।" এজন্য চাই তেঁতুল। পাখী পাঠাইয়া দাও লঙ্কায়, লঙ্কা হইতে তেঁতুল লইয়া আসুক। টিয়া পাখী লঙ্কা হইতে তেঁতুল আনিয়া দিল, তাহাতে ক্ষীর সমুদ্র হইল দধি-

সমুদ্র। মঙ্গলকাব্যের প্রধান সহায় হনুমানের সাহায্যে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইল। দশম মন্থনে চান্দ সদাগরের জন্ম হইল। ক্ষেমানন্দের অদ্ভুত কল্পনা। ক্ষীরসমুদ্রমন্থনে চান্দের বদলে চান্দসদাগরেব উদ্ভব কল্পনা করিয়া কবি প্রকারান্তরে চান্দসদাগরকে একটি শরীরী মানব না বলিয়া একটি ভাববিগ্রহ বলিতে চাহিয়াছেন, চান্দসদাগর একটা আদর্শ—একটা মূর্ত্তিমান বিদ্রোহ মাত্র।

চান্দেরে দিলেন হর ব্রহ্মজ্ঞান কয়্যা।
মনসারে না মানিবি এই জ্ঞান পায়্যা।

গ্রন্থের আখ্যান বীজ এইখানেই উপ্ত হইল।

দ্বাদশ মন্থনে বিষের উদ্ভব হইল। এই বিষ সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করিতে উদ্যত। তখন মহাদেব নিজে এই বিষপান করিলেন। বিষপানে শিব হইলেন অচেতন—

শূল শিঙ্গা ঝুলি কাঁথা গড়াগড়ি যায় কণ্ঠেতে রহিল বিষ রহিল গলায়।
উগারিলে অঙ্গীকার হয়ত লঙ্ঘন গলায় গরল রহে হর অচেতন॥

ভবানী ছুটিয়া আসিলেন। ভবানী বলিলেন—

প্রেমের পশরা দিয়া পাথরে বান্ধিলে হিয়া ভরাডুবি করিলে শুখানে।
তারপর ভবানী বলিলেন—দেবগণ চিতা সাজাও, প্রভু যখন চলিয়া গেলেন—তখন এ দেহ রাখিব না।

আনিয়া চন্দনকাষ্ঠ জ্বালহ অনল।

কার্ত্তিক গণেশের পানে চাহিয়া ভিখারীর জায়ার মতই বলিলেন—
দুখীর দুলাল তোরা ভিখারীর পো দেবতার সভায় নাহিক মায়া মো।
অন্নের অভাব হবে অভাগিনী বিনে কেবা দিবে কোথা পাবে ভাই দুইজনে
যে কাব্যকল্পনায় মৃত্যুঞ্জয় শিবই মৃত্যুকবলে—তাহাতে কার্ত্তিক গণেশের অন্নাভাব হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

যাহাই হউক ভবানী ত অগ্নি প্রবেশ করিতে যাইতেছেন—এমন সময় তাঁহার মনে হইল—

সিজুয়া পর্বতে আছে মনসা কুমারী।
মনসা থাকিতে কেন তবে পুড়্যা মরি॥

তখন কার্ত্তিক গণেশকে ডাকিয়া বলিলেন—যাও বিষহরী দিদিকে "নিয়ে এস, তার মন্ত্রে বিষ ফুঞে হবে পানি।" গুহগজানন মনসার কাছে গিয়া সকল সংবাদ দিলেন। মনসা সুযোগ পাইয়া দুকথা শুনাইয়া দিলেন। বাপ মরিয়াছে শুনিয়া তাঁহার বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই। সৎমা (কালিনী সতাই) যে বিধবা হইয়াছে ইহাতেই সে সুখী। এই সৎমা— "অঙ্গার দহনে মোর চক্ষু কৈল কাণী।" "চণ্ডিকা রণ্ডিকা হৈল ঘুচিল সন্তাপ।" যাহাই হউক—শেষপর্য্যন্ত মনসা শিবকে বাঁচাইতে আসিলেন। যতই হউক বাপ ত বটে! মনসা ভাবিলেন—"আমাকে যেমন অনাদর করেছে বাপ-মা—তেমনি দেখুক আমার মহিমা কত।" শিবের বিষ হরণ করিয়া মনসার নাম হইল বিষহরী।

সমুদ্রমন্থনে চান্দ সদাগরের উদ্ভব হইলে তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া শিব বলিয়াছিলেন—মনসাকে কিছুতেই মানিও না। অধিকক্ষণ অতীত হয় নাই—শিবেরই এমন দশা হইল যে, মনসার দয়া বিনা মৃত্যুঞ্জয় হইয়াও তাঁহার পরিত্রাণ নাই। মনসার মহিমার ইহাই চরম দৃষ্টান্ত।

শিবের অঙ্গ হইতে বিষ সংহরণ করিয়া মনসা সর্পগণকে ডাকিয়া বণ্টন করিয়া দিলেন। সেই হইতে সর্পগণের এত তেজ। এইত গেল সমুদ্রমন্থন পর্ব্ব। তারপর উষা অনিরুদ্ধের পালা।

অনিরুদ্ধ ও উষাই লক্ষ্মীন্দ্র (লখীন্দর) ও বিপুলা (বেহুলা) রূপে অবতীর্ণ। কাজেই মনসামঙ্গলে ইহাদের পূর্ব্বকাহিনীর স্থান হইবার কথা। এই কাহিনী সকল মনসামঙ্গলে নাই। ক্ষেমানন্দের গ্রন্থে ইহা বিস্তৃত

ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে—তাহার ফলে কাব্যহিসাবে ইহাতে বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে—নানাবিধ রসের প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট অবসর ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ একটি অবিমিশ্র প্রেমকাহিনী এই প্রেমবিমুখ মনসামঙ্গলের কাব্যাঙ্গের ঐশ্বর্য্য বহু গুণে বাড়াইয়া দিয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী অন্নদামঙ্গলে রসৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে—উষা অনিরুদ্ধের কাহিনী মনসামঙ্গলে একই কাজ করিয়াছে। দুই কাহিনীর মধ্যে অনেকাংশে মিলও আছে।

বাণরাজা বহুদিন ধরিয়া শিবপূজা করিয়া শিবের কাছে বর চাহিয়া লইলেন—"প্রলয় যুদ্ধের কালে হয় যেন সহস্রেক হাথ।" আর তিনি প্রার্থনা করিলেন—

শিব যেন তাঁহার দ্বারী হ'ন। অদ্ভুত প্রার্থনা সন্দেহ নাই। বাণরাজের এককন্যা হইল তাহার নাম হইল উষা। উষাও শিবপূজা করিয়া শিবকে তুষ্ট করিলেন। শিব বর দিতে চাহিলে উষা বরে বরই চাহিলেন—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে।

এ দিকে বাণ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—যুদ্ধ চাই। যুদ্ধ না হইলে তিনি শিববরের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। এজন্য বাণ শিবকে বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। শিব এক ঢিলে দুই পাখী মারিলেন। উষাকেও বর জুটাইয়া দিলেন—যুদ্ধও বাধাইয়া দিলেন।

অনিরুদ্ধের জন্য উষার আকুল প্রতীক্ষা চমৎকার কাব্যরূপ ধরিয়াছে—উভয়ের মিলনও কাব্যে যথেষ্ট রসশ্রী সম্পাদন করিয়াছে।

উষার গর্ভসঞ্চারের পর হইতে কাব্যের উপাখ্যান পৌরাণিক কল্পলোক হইতে বাংলার বাস্তব লোকে অবতরণ করিয়াছে। রাজা

ক্রোধে বর্দ্ধমানের বীরসিংহের মতই অগ্নিশর্ম্মা। "রাজার আদেশ পায়্যা কোটালিয়া ধায়"

পেয়ে রাজ অনুমতি সাজে দুই সেনাপতি
মহাশব্দে বাজে কোলাহল।
রাউত চাপিয়া তাজী মাহুত কুঞ্জরে সাজি
মহিষে চাপিয়া মহাবল।
জয়ঘণ্টা ঘনবেণী ভীগাই কাঁসর সানি
নগর উথলে জয়ঢাকে।
বিচিত্র পাগড়ি মাথে ঢালখাঁড়া করি হাতে
হান হান কাট কাট ডাকে।

ভঙ্গবিভঙ্গ দুই সেনাপতির পতন হইলে বাণরাজ নিজে যুদ্ধে আসিলেন। এক অনিরুদ্ধ একদিকে, সহস্রবাহু বাণরাজ ও তাঁহার অসংখ্য সৈনিক অন্যদিকে।

কেহবা কামান দাগে
ভাঙ্গিল কামান কৈল খান খান অনিরুদ্ধে নাহি লাগে

এখানে স্মরণাতীত যুগের কাল্পনিক বাণরাজ একে বারে সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে চলিয়া আসিয়া কামান দাগিতে লাগিলেন।

বাণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার মনে ক্ষণে ক্ষণে রসাভাস হইতেছে। বৈরভাবের মধ্যে বাৎসল্য ভাবের মিশ্রণ ঘটিয়া যাইতেছে। রসের দিক হইতে এই অংশকে উপেক্ষা করা যায় না।

ক্ষণে ক্ষণে দয়া লাগে রহি রহি অনুরাগে
শ্যামল সুন্দর দেখি শিশু।

যুঝিবার কালে রায় তাহা জিজ্ঞাসিতে চায়
লাজে রাজা নাহি বলে কিছু।

বাণরাজ শেষপর্য্যন্ত চরম অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। ফলে, অনিরুদ্ধ হইলেন নাগপাশে বন্দী। সহস্রবাহু বাণ সহস্র সহস্র সৈন্য সামন্ত লইয়া একটি বালককে শেষ পর্য্যন্ত বন্দী করিলেন। ইহাতে তাঁহার বীরপৌরুষ তৃপ্ত হইল না—কোন প্রকারে আত্মরক্ষাই করা হইল।

নাগপাশে আবদ্ধ অনিরুদ্ধকে বাণ কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কে যে এই তরুণবীর, তাহা জানিবার আগ্রহও তাঁহার হইল না। বাণরাজ অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধে এতই উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন যে তরুণ বীরকে কারাগারে বন্দী করিয়াও তাঁহার পৌরুষ পরিতৃপ্ত হইল না—সে ঘর তুষের ধুঁয়ায় অন্ধকার করিয়া রাখিলেন। সহস্র-বাহুর শৌর্য্য বটে!

যাহাই হউক—অনিরুদ্ধ যত বড় বীর হউন, নাগপাশে বন্দী হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন নারদ বন্দিশালায় সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, দ্বারকায় সংবাদ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও হলধর যদুসৈন্য সঙ্গে লইয়া বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এত দিনে বাণের যুদ্ধসাধ মিটিল। এদিকে কবিও বাস্তব জগৎ হইতে আবার পৌরাণিক লোকে ফিরিয়া গেলেন।

কাশীরামের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মত যুদ্ধ বর্ণনা আরম্ভ হইল।

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে বাণ ও ষড়ানন দুইজনে পারিয়া উঠিলেন না। বাণ শিবকে স্মরণ করিলেন। শিব আসিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গেই যুদ্ধ বাধাইলেন। হরিহরের সংগ্রামে বিশ্ব লোপ পায়—তখন নারদ চণ্ডীর শরণাপন্ন হইলেন। চণ্ডী আসিয়া দুইজনের মধ্যে দিগম্বরী হইয়া দাঁড়াইলেন—লজ্জায় হরিহর রণে বিরত হইলেন।

এখানেও রসান্তরের দ্বারা বৈরভাবের নিরোধ।

রামেশ্বরের শিবায়নে উষা অনিরুদ্ধের কাহিনী ও হরিহরের সংগ্রাম-কথা বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

রথাশ্ব সারথি সব এককালে কেটে। বাণকে বধিতে বাসুদেব আইল ছুটে।
হেনকালে হৈমবতী হয়ে তার মাতা। মানবাগ্রে মুক্তকেশী বসনবর্জ্জিতা।
কঠোরী কাতর হয়ে কহিলা কৃষ্ণেরে। হাপুত্রীরে পুত্রের পরাণ দান দেরে।
বাসুদেব বিমুখ হইল অতঃপর। বুঝিয়া বিরথী বাণ রাজা গেল ঘর।

বাণের দর্প চূর্ণ হইল। উষা অনিরুদ্ধে দ্বিতীয়বার ঘটা করিয়া বিবাহ হইল। কিন্তু অনিরুদ্ধ শিবের কাছে অহঙ্কার প্রকাশ করায় শিবের শাপে চান্দসদাগরের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন—উষা হইলেন বেহুলা।

মনসা চণ্ডীর দ্বারা বিড়ম্বিতা, স্বামিপরিত্যক্তা, পিতা শিবের দ্বারা নির্বাসিতা—অথচ ইনি দেবতা, দেবাদিদেবের কন্যা। ইনি দেখিলেন—সকল দেবতারই পূজা হয়—তাঁহার কেন হয় না? সখী নেতাকে মনসা নিজের সংকল্প জ্ঞাপন করিলেন। নেতা বলিলেন—মানুষ যে দেবতার পূজা করে—তাহা বিনা কারণে নয়। সে পূজার বদলে—কিছু পায়। সকল দেবতাই তাঁহাদের ভক্তের কোন-না-কোন ইষ্ট সাধন করেন। তোমার ত কোন ইষ্ট সাধনের ক্ষমতা নাই। ভক্তির পূজা তুমি পাইতে পার না। তবে এক উপায় আছে। তুমি মানুষকে দুঃখ দাও—বিড়ম্বিত কর—তাহারা দুঃখবিড়ম্বনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া তোমার পূজা করিবে।

"অহি কুল দিয়া নরে বিড়ম্বিয়া লহ পুষ্প জল দান।"

মানুষ সহজে কাহারো কাছে মাথা নোওয়ায় না।

"বিড়ম্বনা বিনে এ তিন ভুবনে না পূজিবে কোন জনা।"

নেতার যুক্তির মধ্যে চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। আমরা ইষ্টের জন্য কতটুকু উপাসনা করি? তাহার চেয়ে ঢের বেশি করি অনিষ্টের ভয়ে। এইজন্য যম, শনি, নির্ঋতি, শীতলা ইত্যাদি দেবদেবীর পূজাপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগেও আমরা দেখিতে পাই,—যাহার অনিষ্ট করিবার শক্তি প্রভূত, সেইত মান পায়, তাহারই সবাই তোষামোদ করে।

নেতার উপদেশে কেতকা বা মনসা প্রথমে কচুয়ার তটে রাখাল বালকগণের পূজা পাইবার জন্য গেলেন। কবি এখানে রাখালবালক ও গাভীগণের বর্ণনায় বৈষ্ণবকবিদের গোষ্ঠবিহার লীলার অনুসরণ করিয়াছেন। বর্ণনা সুললিত ও সরস। নেতা বলিল—

"রাখাল বর্ব্বর জাতি নাহি জ্ঞান দিবারাতি
আত্মপর নাহি তার জ্ঞান।"

তাহাদের পূজা পাওয়া খুব সহজ হইবে। বিষহরী, নেতার উপদেশে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে রাখালগণকে ছলনা করিতে আসিলেন। মনসার জরতী-বেশের বর্ণনা—চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের চণ্ডীর জরতী বেশের কথা মনে পড়ায়। বর্ণনা একই ঢঙের।

বৃদ্ধারূপা মনসা দুগ্ধ চাহিলেন। রাখালেরা দুগ্ধ দিলনা, তাঁহার অপমান করিল। তাহার ফলে মনসা তাহাদের ষোলশত গাভী লুকাইয়া ফেলিলেন। রাখালেরা কাঁদিতে লাগিল। মনসা গাভীগুলি ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের পূজা আদায় করিলেন। মর্ত্ত্যে মনসার ইহাই প্রথম পূজা।

মনসার পূজা প্রচারে প্রধান বাধা ধন্বন্তরি। যেখানে যত সর্পদংশন হয়—ধন্বন্তরি ও তাহার ১২৬ জন শিষ্য সেখানে গিয়া সব আরোগ্য করিয়া দেয়। ধন্বন্তরি বা তাঁহার শিষ্যগণ জীবিত থাকিতে মনসাকে

ভয় করিবার কারণ নাই। মনসাকে ভয় না করিলে তাঁহার পূজা-প্রচারের অন্য উপায়ও নাই। অতএব আগে ধন্বন্তরি-বধ প্রয়োজন। কোন কোন মনসামঙ্গলে ধন্বন্তরি চাঁদ সদাগরের বন্ধু। ধন্বন্তরি জীবিত থাকিতে চাঁদের কোন অনিষ্ট করার উপায় নাই, তাই ধন্বন্তরি-বধের প্রয়োজন হইয়াছে।

ক্ষেমানন্দ ধন্বন্তরিবধের প্রয়োজন অন্য ভাবে দেখাইয়াছেন। ধন্বন্তরিবধের উপাখ্যান অন্যান্য সকল পুস্তকেই এক।

মনসা প্রথমে মালিনীবেশে বিষমালা দিয়া পরে গোয়ালিনীবেশে বিষদধি দিয়া—ধন্বন্তরির শিষ্যগণকে বধ করিবার চেষ্টা করিলেন। মনসার গোয়ালিনীবেশের ছলনাপ্রসঙ্গে আর একবার বৃন্দাবনের হাওয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহাতে যথেষ্ট রঙ্গরসিকতার অবসর ঘটিয়াছে। এই ব্যাপারে মনসার অধ্যবসায়ের অন্ত নাই—শঠতার চূড়ান্তও দেখানো হইয়াছে। মনসা ধন্বন্তরিকে ভুলাইতে পারেন নাই, তাঁহার সরলা পতিব্রতা পত্নীকে ভুলাইয়া তাঁহার সীমন্তের সিন্দূর টুকু লেহন করিয়া লইয়াছেন। পত্নীর সরলতা যে অনেক সময় পতির প্রাণহারিণী হইয়া উঠে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে মন্দোদরীর ব্রহ্মাস্ত্রের সন্ধান দেওয়ার মত এই উপাখ্যানে তাহা দেখানো হইয়াছে।

এই কাহিনীতে মহাদেবও তাঁহার দেবত্ব রাখিতে পারেন নাই। ধন্বন্তরিবধের জন্য মনসা উদয় নামক কালসর্পকে চাহিলেন—আর মহাদেব অতিসহজেই তাহাতে সম্মত হইলেন। ধন্বন্তরিবধ একটি করুণ কাহিনী। মালিনী বা গোয়ালিনী বেশে যাহা সম্ভব হইল না—তাহা ব্রাহ্মণীবেশেই সম্ভব হইল। বঙ্গসাহিত্যে এই ব্রাহ্মণীবেশ একটা মহাপাপাচরণের বেশ।

ধন্বন্তরি বধের জন্য দেবীকে যথাক্রমে সাতটি ছদ্মরূপ ধারণ করিতে

হইয়াছে—(১)মালিনী (২) গোয়ালিনী (৩) তরুণী ব্রাহ্মণী (৪) শ্বেতমাছি (৫) দুঃখী চেড়ী (৬) শঙ্খ চিল। (৭) বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী।

চাঁদ সদাগরের উৎপত্তি হইয়াছিল সমুদ্রমন্থনে। ঊষা ও অনিরুদ্ধ, বেহুলা ও লখীন্দর হইয়া জন্মিল—কাজেই চাঁদ বেহুলার উপাখ্যানটাকে কবি সম্পূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত করিয়াছেন। তাহার দ্বারা লৌকিক সঙ্গতি অসঙ্গতির বিচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

আমাদের মুদ্রিত পুঁথিতে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা হইতে চাঁদের কাহিনীর সূত্রপাত হইয়াছে। চাঁদ ছয় পুত্রকে আগেই হারাইয়াছে। চাঁদের আর দক্ষিণ পাটন বা সিংহলে যাইতে হইল না। পথেই মনসার আদেশে হনুমান সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিল। কাজেই অনেক প্রসঙ্গ বাদ গেল।

পশ্চিম বঙ্গের কবিদের একটা বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালদেশের মাঝিদের বাক্য ও আচরণ লইয়া—একটু রঙ্গরসিকতা করা। ক্ষেমানন্দ ডিঙ্গা ডুবানো ব্যাপারে অনেক প্রসঙ্গ বাদ দিয়াছেন—কিন্তু অত্যন্ত অনাবশ্যক হইলেও এই রসিকতাটুকু বাদ দেন নাই। রঙ্গরসিকতা এ-শ্রেণীর কাব্যের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ,—অথচ কবিদের মাথায় নূতন নূতন রসিকতার প্রসঙ্গ আসিত না। রসিকতার ভঙ্গীতেও বৈচিত্র্য নাই—সকলেরই ভঙ্গী, এমন কি ভাষাও এক।

চাঁদ দিগম্বররূপে কোনপ্রকারে ভাসিতে ভাসিতে কূল পাইল। মনসা তাহাকে মড়ার কানি দিলেন। তাই পরিয়া হোসা হাতে চাঁদ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে। মনসা চাঁদের পীড়নে গণেশকেও জড়াইলেন। মনসা গণেশের ইঁদুরটাকে চাহিয়া আনিয়া চান্দের ভিক্ষার চাউল হরণ করিতে পাঠাইলেন।

চান্দ নিরুপায় হইয়া বনে আশ্রয় লইলেন। সেখানে শিকারীদের

হাতে তাঁহার নির্য্যাতন চলিল। চান্দ বন ত্যাগ করিয়া মিতার গৃহে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখেন মিতা মনসার ভক্ত, সে নিত্য মনসা পূজা করে। চান্দ মনসার উদ্দেশে বলিল—

আমার মিতার ঘরে রয়েছ আমার ডরে বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কানি।
মোর মিতা তোর তরে কোন গুণে পূজা করে তার তত্ত্ব আমি নাহি জানি॥

চান্দ হিতালবাড়ি দিয়া মনসামূর্ত্তি ভাঙ্গিতে গেল। মিতা চান্দকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দিল। চান্দ কাঠুরিয়াদের সঙ্গ লইল, প্রচুর চন্দনকাঠ মাথায় লইয়া নগরে যাইতেছিল। মনসার আদেশে হনুমান গিয়া কাষ্ঠভারের উপরে বসিল। চান্দ আর ভার বহিতে পারিল না—তাহার অন্নসংস্থান বন্ধ হইল। তারপর চান্দ এক বামুনের চাকর হইল। কিন্তু ধান নিড়াইতে গিয়া আগাছার বদলে ধানগাছ উপড়াইয়া অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিল।

কবি এইখানেই চান্দের নির্য্যাতনের শেষ করিয়াছেন। চান্দের পৌরুষের সম্মান ক্ষেমানন্দ ছাড়া কোন কবিই রাখেন নাই। ক্ষেমানন্দ চান্দের বিড়ম্বনাতে আনন্দলাভ করেন নাই।

চান্দের নির্য্যাতন কাহিনীটা ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়াছে। নারায়ণদেব এই কাহিনীকে সুদীর্ঘ করিয়া তুলিয়াছেন—চান্দকে নানাভাবে বিড়ম্বিত ও অপমানিত করিয়া কিছুতেই তাঁহার আশ মিটে নাই। তাঁহার ও গুপ্তকবির তুলনায় ক্ষেমানন্দের রচনায় যথেষ্ট সংযম আছে।

লখিন্দর-বেহুলার জন্ম এবং তাহাদের বিবাহসম্বন্ধ, বিবাহ ইত্যাদি কবি সংক্ষেপেই শেষ করিয়াছেন। লোহার কলাই সিজানোর পরীক্ষাটা কবি বাদ দিতে পারেন নাই। মনসার প্রসাদেই বেহুলা লোহার কলাই সিদ্ধ করিল, কিন্তু স্নানাগিনী ব্রাহ্মণীর বেশে আসিয়া

মনসা বেহুলাকে অভিশাপও দিয়া গেল। বেহুলা মনসার ভক্ত উপাসিকা—কিন্তু চান্দের অপরাধে তাহাকে অভিশাপের দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

চান্দ আগে হইতেই সাবধান হইয়া সাঁতালি পর্ব্বতে লোহার বাসরঘর নির্ম্মাণ করাইলেন। ক্ষেমানন্দের চান্দ পৌরাণিক পুরুষ,—কাজেই বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলেন, কিন্তু তিনি মনসারও আদেশ পালন না করিয়া পারিলেন না—সর্পপ্রবেশের জন্য ঘরের প্রাচীরে সূত্রসঞ্চার পথ রাখিলেন।

কাঁচলি রচনা মঙ্গলকাব্যের একটি অঙ্গ। এই গ্রন্থে টোপর রচনা তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

লখীন্দরের বিবাহে চান্দের কুটুম্বগণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে যে সকল বণিক সমাজনেতাদের নামোল্লেখ আছে—কবি চান্দের অতিথিদের মধ্যে তাহাদেরই নাম করিয়াছেন। ধনপতির গৃহে চান্দ উপস্থিত ছিলেন—এখানে চান্দের গৃহে ধনপতিকে দেখা যাইতেছে।

বিবাহের রাত্রেই বরকন্যা লোহার বাসরঘরে আসিল। চাঁদ-সদাগর যে মনসার সঙ্গে বাদ করে—বেহুলার পিতা সায় বেণে তাহা জানিত না—জানিলে হয়ত এ বিবাহ হইত না।

ক্ষেমানন্দের লখীন্দর-বেহুলা বাসরঘরে পাশা খেলিয়া অধিকাংশ রাত্রি কাটাইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাল নিদ্রা তাহাদের চক্ষু অধিকার করিল। তবু বেহুলা তিনচারটি সাপকে দুধ খাইতে দিয়া বন্দী করিল—লখীন্দরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইল। শেষরাত্রে কালিনী আসিল দংশন করিতে। এখানে একটু কবিত্বের আভাস সকল মনসামঙ্গলেই আছে।

যেন বর তেন কন্যা মিলাইল বিধি।
বেহুলা লখাই কোলে রূপে কলানিধি॥
এ হেন সুন্দর গায় কোন মুখে খাব।
দেবী জিজ্ঞাসিলে তারে কি বোল বলিব॥
ছকুড়ি নাগের মাতা এ কাল নাগিনী।
তে কারণে সুখ দুঃখ হৃদয়েতে জানি॥
আপনি তিতিল কালী লোচনের জলে।
হেরিলে বিদরে প্রাণ গেল পদতলে॥

কিন্তু মনসার আদেশ পালন না করিলে রক্ষা নাই। নাগিনী ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। বেহুলা লখীন্দরকে কোলে লইয়া বড় দুঃখেই বলিল—

"শ্বশুর করিল বাদ তোমার লাগিয়া। অভাগিনী কি করিল রজনী জাগিয়া।"

বেহুলার বিলাপ ছন্দের দোষে জমে নাই। সনকা বেহুলাকে "খণ্ডকপালিনী চিরুণদাঁতিনী" বলিয়া গালি দিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। কবি এখানে চাঁদসদাগরকে অদ্ভুতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দের চাঁদ পৌরাণিক জীব—মর্ত্তের মানুষ নয়। তাই সে মানুষের মত ব্যবহার করিল না।

গড়াইয়া নাইয়া কয় শুন সদাগর।
লোহার বাসরে মৈল বালা লখীন্দর।
শুনিয়া সে চাঁদ বেণে হরষিত হৈল।
কাঁধে হেঁতালের বাড়ি নাচিতে লাগিল।
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি আর বিষাদ।
কানী চেঙ্গমুড়ি সনে ঘুচিল বিবাদ।

এখানে নারায়ণদেব লিখিয়াছেন—"ক'যে করো বাদ" ইহাই অধিকতর সমীচীন। ক্ষেমানন্দের চাঁদ বলিল—

ঝাট করে কাট নাড়া রাম কলার পাত
মৎস্য পোড়া দিয়া আজ খাব পান্তা ভাত ॥
মনসার হঠে যার মরে সাত পো।
নিঠুর শরীর তার নাহি মায়া মো ॥

চাঁদ বলিতে চাহেন—ছয় পুত্র গিয়াছিল—নিশ্চিন্ত হইয়া মনসার সঙ্গে বিবাদ করিতাম। লখীন্দর আসিয়া আমার বল হরণ করিয়াছিল—মনসার কাছে আমি সন্তানস্নেহে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেও মরিল। এখন মনসা আর কি করিবে?

ক্ষেমানন্দের চাঁদ সদাগর পৌরাণিক মানুষ, পুরা বাস্তব মানুষ নয়। তাই লখীন্দরের মৃত্যুর কথা শুনিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে পারিয়াছে। ইহাতে চাঁদের মানবিকতা (Humanism) নষ্ট হইয়াছে।

বেহুলা কলার মান্দাসে লখীন্দরের শব লইয়া নিরুদ্দেশযাত্রা করিল। পথে শ্বেতকাককে মাণিক অঙ্গুরী দিয়া মাতাপিতার কাছে সংবাদ দিবার জন্য নিছনি গ্রামে পাঠাইয়া দিল।

তারপর সকল মনসামঙ্গলেই যাহা আছে—ইহাতেও তাহাই আছে। নেতা ধোপানীর সাহায্যে বেহুলা দেবসভায় গেল, লখীন্দরের অস্থি লইয়া। তারপর বেহুলার দেবসভায় নৃত্য। দেবতারা নৃত্যে মুগ্ধ হইল। ক্ষেমানন্দ হরকে পরিলুপ্ত-ধৈর্য্য করেন নাই। শিব শুধু বলিলেন—" কেন নাচ সীমন্তিনী কোন দেশনিবাসিনী কহ সত্য না করিও ভয়।" ক্ষেমানন্দ যোগীশ্বরের যোগিমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। শিবের আদেশে বিষহরী দেবসভায় এলেন। চণ্ডিকা শিবকে বলিলেন—"তুমি বল তোমার কন্যা সতী, কিন্তু বিবাহরাত্রে

সতী হইয়া সে কি করিয়া অন্য সতীর সিঁথার সিঁদুর চাটিয়া খাইল ?

ধনপতিদত্ত নাহি মানিত আমারে।
কদাচিৎ প্রাণবধ না করিনু তারে ॥

মনসা লখীন্দরের প্রাণ দিলেন। বেহুলার ছয় ভাশুরও বাঁচিয়া উঠিল, —চাঁদের সপ্ত ডিঙ্গারও উদ্ধার হইল। লখীন্দর ও অন্য সকলকে লইয়া বেহুলা বিজয়িনী হইয়া দেশে ফিরিল। প্রথমে বেহুলা-লখীন্দর গেল পিতৃগৃহে যোগী যোগিনীর বেশে। তারপর ডোমডোমনীর বেশে গেল চাঁদের গৃহে। তারপর বেহুলা আত্মপরিচয় দিল। সনকা চাঁদকে মনসা পূজা করিবার জন্য কাঁদাকাটি করিয়া ধরিলেন। চাঁদের পিতৃহৃদয় বিগলিত হইলে পৌরাণিক চাঁদ বৎসল মানুষ হইল। মনসা পূজা লইতে আসিতে ভয় পাইয়া বলিলেন—

যদি মোর পূজাত করিবে চান্দবাণ্যা।
হেঁতালের বাড়িগাছি দূরে ফেল টান্যা ॥

চান্দ হেঁতালের লাঠি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মনসা পূজা লইতে নাগিলেন। শুধু নিজের পূজা নয়, তিনি সমস্ত সাপের পূজাও আদায় করিলেন।

মনসা পূজা আদায় করিলেন, আর বেহুলা-লখীন্দরের প্রয়োজন নাই—তাহারা শাপমুক্ত হইয়া চলিয়া গেল। বেহুলা লখীন্দরের স্বর্গপ্রয়াণের আগে বিষহরী কলিযুগের চরিত্রের কথাগুলি শুনাইলেন—

মেঘে হৈবে অল্প জল বৃক্ষে না থাকিবে ফল ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে হৈবে ঘর।
গুরুভক্তি দেবার্চ্চনা না করিবে কোন জনা মিথ্যায় নিবিষ্ট নিরন্তর ॥
পরহিংসা পরদার পর দ্রব্যে মতি যার শুধু হৈবে তাহার উন্নতি।
যে করিবে ধর্ম্ম ভয় তাহার কর্ম্ম সিদ্ধ নয় কলিযুগ দোষের প্রসূতি ॥

পুরুষেরা বশ হৈবে অবলা প্রবলা হৈবে স্ত্রী হৈবে কলির দেবতা।
পিতা হিংসিবেক পুত্রে গুরু হিংসা করিবে ছাত্রে কলিযুগ অধর্ম্মের কথা॥
দুগ্ধ হরিবেক গাই ভিন্ন ভিন ভাই ভাই স্ত্রী লৈয়া হৈবে স্বতন্তর।
সত হৈবে দুস্কৃত দ্বিজে বেচে লবণ ঘৃত বেপার করিবে নিরন্তর॥
কলি যুগান্তের কথা দরিদ্র হৈবে দাতা কৃপণ হৈবে ধনবান।
জাতিবিচার নাহি করি আসিয়া তাহার বাড়ী ব্রাহ্মণ মাগিয়া লবে দান॥
ক্ষেত্রে না ফলিবে শস্য রাজা লবেন সর্ব্বস্ব প্রজাগণ না থাকিবে সুখে।
মনুষ্য হৈবে খল না থাকিবে গঙ্গাজল কলিযুগে অধর্ম্মের পাকে॥
দেবতার স্থান যত সক স্থান হৈবে হত মনে পাপ দেখিয়া গোপন।
দেখিয়া অধর্ম্ম ভাগ চারিবেদ পরিত্যাগ বসুমতী ছাড়িবে শাসন॥

ক্ষেমানন্দের রচনায় পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা আছে। অধিকাংশ স্থলেই ছন্দোবন্ধ নিখুঁত। রচনায় মিলের দুর্গতি নাই, ভাষা সহজবোধ্য।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে ক্ষেমানন্দের গ্রন্থের বহু স্থলে ভাব ও বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য আছে। ক্ষেমানন্দকে কবিকঙ্কণের অনুবর্ত্তী শিষ্য বলা যাইতে পারে। চণ্ডীমঙ্গলের মত এই গ্রন্থে সেকালের বাঙ্গালী সমাজের রীতিপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্ষেমানন্দ তাঁহার রচনায় যতদূর সম্ভব আতিশয্য বর্জ্জন করিয়া উপাখ্যানভাগের উন্মেষের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন। মনে হয় মনসা মহিমা প্রচারের চেয়ে কবির আসল কাব্যরচনাই অধিকতর উদ্দিষ্ট ছিল

মনসামঙ্গলের মর্ম্মার্থ

ধর্ম্মমঙ্গল যেমন পশ্চিমবঙ্গের কাব্য, মনসামঙ্গল তেমনি পূর্ব্ববঙ্গের কাব্য। মনসামঙ্গলের সর্ব্বপ্রধান কবি বিজয়গুপ্ত বরিশালের লোক। মনসা যেন নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গেরই রুদ্রাণী-প্রকৃতি। প্রকৃতির রুদ্রতা পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ববঙ্গেই বেশি। এই রুদ্রতা পদ্মার ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়াই অধিকতর পরিস্ফুট। মনসার আর একটি নাম পদ্মা; নেতা বা মহাদেবের অশ্রুজাতা নেত্রবতী পদ্মার সঙ্গে রুদ্রতায় যোগদান করিয়াছে। নেতা যেন ব্রহ্মপুত্র। পদ্মার তুলনায় ব্রহ্মপুত্রের রুদ্রতা অনেক কম। নেতার চরিত্রে দাক্ষিণ্য আছে—সে একেবারে হৃদয়হীনা নয়। পদ্মা যদি মনসা হ'ন—গঙ্গা তবে চণ্ডী। পদ্মার তুলনায় চণ্ডীরও হিংস্রতা কম—ভক্তবৎসলতা বেশি। প্রকৃতির এই রুদ্রলীলা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার আবেষ্টনের অধিবাসীরাও তাহাদের উপাস্যা দেবী মনসার মূর্তিকল্পনায় এই রুদ্রতারই অধিকতর প্রশ্রয় দিয়াছে। পদ্মা পাণ্ডব-বর্জ্জিত শবরদের (?) দেশে প্রবাহিতা—শাস্ত্রমতে পদ্মার শুচিতা নাই। মনসা-পদ্মাও নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই উপাস্যা ছিলেন। এক সময় পদ্মা শাখানদী মাত্র ছিল—ইহার আয়তনও ছিল সংকীর্ণ। ক্রমে পদ্মা প্রবলা হইয়া ভাগীরথীকেই শাখানদীতে পরিণত করিয়াছে। মনসা-পদ্মার অবস্থাও তাই। একদিন ইঁহার প্রতিপত্তি সামান্য ছিল, ক্রমে ইঁহার প্রতিপত্তি এমনই বৃদ্ধি পাইল যে পশ্চিমবঙ্গেও ইহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিল এবং চণ্ডীর প্রতিপত্তি সমগ্র বঙ্গদেশেই কমিয়া আসিল। মনসা প্রসন্না হইলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—তাহার সুখসৌভাগ্য ঘটে। প্রসন্ন-সলিলা হইলে পদ্মাও শুভঙ্করী, কৃষিবাণিজ্যের সহায়িকা।

গঙ্গা ও পদ্মা পৃথক নদী নয়—প্রকৃতপক্ষে একই নদী—বঙ্গের দুই অংশে দুই বিভিন্ন মূর্ত্তি ধরে। চণ্ডী ও মনসা পৃথক দেবতা নহেন—একই দেবতার বিভিন্ন রূপমাত্র—দুইটি পৃথক আবেষ্টনীতে দুইটি ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এইরূপ একটা ব্যাখ্যার কথা মনসামঙ্গল পড়িয়া মনে হওয়া বিচিত্র নয়।

বেহুলার এই উপাখ্যানে নানা তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পরশপাথর' কবিতায় যে তত্ত্বের ব্যঞ্জনা আছে—সে তত্ত্বটির কথা মনে পড়ে। লখীন্দরের জীবনই যেন সেই পরশপাথর। কলার মান্দাসে চড়িয়া বেহুলার জলযাত্রার কথা পড়িতে পড়িতে মনে পড়ে—

পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হ'তে কতদূর নাহি তার শেষ,
দিক হ'তে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে
আসন্ন রজনী ছায় ম্লান সর্বদেশ।
অর্দ্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

এক পল নয়—একটি রাত্রির জন্য বেহুলা প্রাণপতির স্পর্শ লাভ করিয়াছিল। বেহুলার বাহ্যজ্ঞানশূন্য বেদ্যান্তরস্পর্শহীন একনিষ্ঠ অটল অবিচলিত তদ্গত ভাবটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপার সন্ধানবর্ণনায় যেন বর্ত্তমান যুগোপযোগী সার্থকতা লাভ করিতে পারে—

সম্মুখে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার।
তরঙ্গে তরঙ্গে উঠি হেসে হ'ল কুটি কুটি
সৃষ্টিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।

আকাশ রয়েছে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি
হু হু ক'রে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
সূর্য্য ওঠে প্রাতঃকালে পূর্বগগনের ভালে
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আসে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল
অতল রহস্য যেন চাহে বলিবারে।
কাম্যধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি মহাগাথা গান গাহি
সমুদ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায় কেহ আসে কেহ কাঁদে কেহ হাসে
ক্ষ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

পরম ধন বিনা তপস্যায় মিলে না। ক্ষণকালের জন্য তাহার স্পর্শমাত্র পাওয়া যায়। সুখের ললিত ক্রোড়ে যাহা পাওয়া যায় স্বপ্নের মত—তাহা মায়ার মত ক্ষণকাল মুগ্ধ করিয়া বিলীন হয়। আকস্মিক প্রাপ্তি প্রাপ্তিই নয়—তাহা চিরদিনের সম্পদ হইয়া থাকে না। ভয় হয়, পাছে 'যাহারে পেয়েছি তারে কখন হারাই'। বিনা সাধনায় যাহা আসে, তাহা কেবল আমাদের সুপ্ত হৃদয়কে জাগাইবার জন্য। 'যেতে নাহি দিব' বলিয়া স্নেহ-প্রেমের বাহুবন্ধনে তাহাকে আগলাইয়া রাখা যায় না। চিরদিনের জন্য পাইতে হইলে তপস্যা চাই। এই সত্যটি আমাদের দেশের সাহিত্যে বহু বার বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। 'কুমারসম্ভব' ও 'শকুন্তলার' সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ এই তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন।

স্বামীর শবদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বেহুলার অনন্তের পথে যাত্রা

এই তপস্যা। মনসামঙ্গলের কবিরা এই তপস্যার যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা উমার তপস্যার চেয়েও কঠোরতর। এই তপস্যার মধ্যে যে সকল কঠোর পরীক্ষা, বিভীষিকা ও তপোভঙ্গের নানা প্রলোভনময় আয়োজনের কথা আছে—তাহা পুরাণের উগ্রতম তপস্বীর তপোজীবনেও কোথাও বর্ণিত হয় নাই। দেবসভায় বেহুলার যে নৃত্য তাহা বেহুলার তপস্যারই অঙ্গ। শোকে উন্মত্তা সদ্যোবিধবা বেহুলার পক্ষে নর্তকীর অভিনয় দারুণতম কঠোরতম পরীক্ষা। স্বামীকে ফিরিয়া পাইবার জন্য বেহুলা অপ্সরার অভিনয় করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছে না। এ তপস্যার তুলনা নাই—উমা, সাবিত্রী, অনসূয়াও এত কঠোর তপস্যা করেন নাই। কবি ক্ষেমানন্দ এই নৃত্যের বর্ণনা দিয়াছেন এইরূপ :—

করে কাংস্য করতাল, বলে ধনী ভাল ভাল কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে বেহুলা নাচনী নাচে, প্রাণপতি জিয়াইবে কাজে।
থাকি থাকি পদ ফেলে, মরালগমনে চলে, মুখ জিনি পূর্ণিমার শশী।
খদিরকাষ্ঠের খোল, বেহুলার মিষ্টবোল, মোহ গেল যত স্বর্গবাসী।
একদৃষ্টে দেবগণ সবে করে নিরীক্ষণ, বেহুলা নাচেন সুরপুরে,
নাহি হয় তালভঙ্গ, মনে বড় বাড়ে রঙ্গ, প্রমত্ত ময়ূর যেন ফিরে।
রঙ্গভঙ্গে হস্ত নাড়ে, ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে, এইরূপে গায় বিনোদিনী,
নৃত্যগীতে মন মোহে, যতেক দেবতা কহে ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।

এই বর্ণনা রঙ্গলীলার,—কিন্তু ইহার চেয়ে করুণ জগতের সাহিত্যে কি আছে জানি না। ইহার চেয়ে নিদারুণ তপস্যা আর কি হইতে পারে ?

কোন প্রকার আধ্যাত্মিক বা রূপকাত্মক ব্যাখ্যা না দিয়া সেকালের শ্রোতারা অনায়াসে মনসামঙ্গলের করুণ কাহিনীর রস উপভোগ করিতে পারিত। একালের পাঠকের সে রস উপভোগ্য করিয়া তুলিতে হইলে

তাহার বাচ্যাতিশায়ী মনকে এইরূপ ব্যাখ্যার দিকে আকৃষ্ট করিতেই হইবে। এই প্রকারের ব্যাখ্যানের দ্বারাই মনসামঙ্গলের বিশ্বসাহিত্যে স্থান নির্দেশ করিতে হয়। নিম্নলিখিত কবিতায় বেহুলার নিরুদ্দেশ যাত্রার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে—

এই গাঙ্গুড়ের ধারা কোথায় হয়েছে হারা ? বাঙ্গালীর চিত্ত-পারাবারে,
অশ্রুর বন্যায় ভেসে মিশিয়া গিয়াছে শেষে একথা বুঝাতে হবে কারে ?
স্মৃতির তরঙ্গদলে সে ভেলা ভাসিয়া চলে যুগে যুগে অনন্তের পানে.
বসি সতী তার'পরি অস্থিমুষ্টি সার করি চলিয়াছে অমৃত-সন্ধানে।
অশনি কাঁপায় সৃষ্টি রোষে দৃষ্টি ঝঞ্ঝাবৃষ্টি পলে পলে দৈব দেয় হানা,
ভেসে ডুবে চলে ভেলা সর্ব্ব বাধা করি হেলা নাহি মানি দেবেন্দ্রেরো মানা।
দিন যায় মাস যায় কালের উত্তাল ঘায় কত শত বর্ষ পড়ে ধ্বসি।
কোথা গাঙ্গুড়ের তীর, সেথা রুধি অশ্রুনীর প্রতীক্ষায় কেহ নাই বসি।
কোথায় নিছনি গ্রাম ? বিস্মৃত তাহার নাম চিহ্নহারা চম্পকনগর.
হিন্তালের যষ্টি ধরি শুধু শূলী শম্ভু স্মরি ঘুরে একা চাঁদ সদাগর।

অনন্তযৌবনা নারী অনন্তে দিতেছে পাড়ি
উড়ে ঝড়ে রুক্ষ ঘন কেশ,
অশ্রুভরা পারাবারে কে তারে ফিরাতে পারে ?
কে বা জানে কোথা যাত্রাশেষ।
এই পারাবারে পশি' লুপ্ত কত রবি-শশী
মগ্ন হলো কত মধুকর।
বেহুলার ভেলাখানি কোন বাধা নাহি মানি
আজো ভাসে ঢেউএর উপর।

মঙ্গলকাব্যের কবি তাঁহার কাব্যমধ্যে পৌরুষের প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা, দেহধারণের অপরিহার্য্য ফল-

স্বরূপ নানাবিধ দুঃখ দুর্দ্দশা সত্ত্বেও মানুষ যে এই পুরুষকারের মহিমায় মহামান্বিত—এমন কি তাহা দেব-দেবীগণেরও ঈর্ষার বস্তু এবং ইহারই ভাস্বর-জ্যোতিতে সুদুর্লভ অমরত্ব-ও যে ম্লান ও মূল্যহীন, তাহা মনসামঙ্গলকাব্য পড়িয়া বিশেষভাবে উপলব্ধি করি।

আরো একটি দিক দিয়া মনসামঙ্গল কাব্যে মানবমহিমার জয়গান করা হইয়াছে। আমরা বেহুলার সুকঠিন তপশ্চর্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি। এক হাতে শোকাশ্রু মুছিতে মুছিতে অপর হাতে পুষ্প-সম্ভার হাতে লইয়া লাস্য নৃত্য যে কত বড় কঠিন কাজ তাহা দেবতাদের বুদ্ধিরও অগোচর। প্রেমের জন্য এইরূপ লাঞ্ছনাভোগ, এইরূপ আত্মবলিদান—ইহা শুধু মর্ত্তেই সম্ভব, কেবল মানুষই তাহা করিতে পারে। স্বর্গ চিরআনন্দময় নিকেতন—সেখানে সুখ আছে, দুঃখ নাই ; হাসি আছে, অশ্রু নাই। এ-যে কত বড় নির্ম্মমতা তাহা মানুষ ভিন্ন অন্যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাই মানুষের কবি স্বর্গকে "শোকহীন, হৃদয়হীন, উদাসীন" আখ্যা দিয়াছেন। দেবতা এবং দেবলোকের এই হৃদয়হীন নির্ম্মমতার কথাই রবীন্দ্রনাথ 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় বলিয়াছেন।

বেহুলার নিদারুণতম শোকের মুহূর্ত্তে সমস্ত দেবতা মিলিয়া যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে একদিকে যেমন আমাদের দেবত্বের প্রতি লোভ কমিয়াছে, তেমনি অন্যদিকে মর্ত্তের মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতা বোধ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র মানব-হৃদয় পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল

১

বাঙ্গালী যে দেবীর নিকট ধনধান্য চাহিয়াছে, সঙ্কট হইতে পরিত্রাণও চাহিয়াছে, যাঁহাকে নানাভাবে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছে তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। শ্রীচৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্ব হইতে চণ্ডীমঙ্গলের মূল আখ্যানটি পাঁচালীর আকারে চলিয়া আসিতেছিল। ভক্ত বৃন্দাবন দাস লৌকিক কামনামূলক ধর্ম্মের অতিরিক্ত প্রভাবে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।" মনসামঙ্গলের গান ও চণ্ডীমঙ্গলের গান বাংলা দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। লোকে এই গানে প্রচুর আনন্দও পাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—নিমাইএর সংকীর্ত্তনে বিরক্ত হইয়া নবদ্বীপের হিন্দুরা বলিতেছে—

মঙ্গলচণ্ডী বিষহরী করে জাগরণ। তাতে বাদ্য নৃত্য গীত যোগ্য আচরণ॥
পূর্ব্বে ভাল ছিল, এই নিমাই পণ্ডিত। গয়া হইতে আসিয়া চলিলা বিপরীত॥

'স্বর্গীয় প্রহসনে' রবীন্দ্রনাথ বলিতে চাহিয়াছেন—বঙ্গসাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে মনসা, শীতলা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রভাব বাঙ্গালীর ধর্ম্মমর্য্যাদা ও বৈদিক আভিজাত্য নষ্টই করিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মই বাঙ্গালীকে ধর্ম্মের ইতরতা হইতে রক্ষা করিয়াছে।

"একদা আমাদের দেশে রাষ্ট্রিয় উচ্ছৃঙ্খলতার সময় ভীতি-পীড়িত প্রজা আপন কবিদের মুখ দিয়া শক্তিরই স্তবগান করিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসামঙ্গল ইত্যাদি প্রকৃত পক্ষে অধর্ম্মেরই জয়গান। সেই কাব্যে

অন্যায়কারিণী ছলনাময়ী নিষ্ঠুর শক্তির হাতে শিব পরাভূত। অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই শিবের বা মঙ্গলের পরাভবকে মঙ্গলগান নাম দেওয়া হইল"।

জনার্দ্দনের চণ্ডীর ব্রতকথাই প্রাচীনতম। ইঁহার এবং অন্যান্য কবির পরিকল্পিত আখ্যানবস্তু পরবর্ত্তী যুগে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পরিণত হইয়াছে।

১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কবি মাধবাচার্য্য একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। তাহাই সর্ব্বপ্রথম পরিপূর্ণাঙ্গ চণ্ডীমঙ্গল। ইহার কয়েক বৎসর পরে দামুন্যা (বর্দ্ধমান) গ্রামের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী একখানি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মুকুন্দরাম ডিহিদারের অত্যাচারে স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত হইয়া মেদিনীপুর জেলার ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকরূপে আশ্রয়লাভ করেন। পরে রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহারই অনুরোধে কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করেন। কবি বলিয়াছেন—দেবীর স্বপ্নাদেশে কাব্য রচনা করিয়াছেন। দেবাদেশের দোহাই দেওয়া সেকালের প্রথা ছিল, উহা একটি Convention মাত্র। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত হয় নাই। কাজেই তাঁহার চণ্ডী কবিকঙ্কণ বোধহয় দেখেন নাই। অথচ দুইজনের গ্রন্থের উপাখ্যানভাগে—এমন কি ভাষাতেও অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, দুইজনেই একই তৃতীয় কবির গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডী সমস্ত প্রাক্তন চণ্ডীকে কবলিত করিয়াছিল। কারণ, চণ্ডীমঙ্গলের রচনা কবিকঙ্কণের হাতেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় পাওয়া যায় না। কবিকঙ্কণ অন্য কোন

দেবতাকে ছোট করিয়া চণ্ডীকে বড় করেন নাই। গ্রন্থে বিষ্ণুভক্তির অজস্র নিদর্শন দেখিয়া মনে হয়, কবি বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি ছিলেন মীন-মাংসত্যাগী দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত।

দেবী জগতে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য রত্নমালা অপ্সরাকে সাধু-কন্যারূপে এবং ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে কালকেতুরূপে অবতারিত করিলেন। সমাজের উচ্চতর ও নিম্নতর দুই স্তরেই যাহাতে পূজার প্রচার হয় তাহার জন্যই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। খুল্লনার স্বামী ধনপতি চান্দসদাগরের মতই শিবভক্ত, স্ত্রীদেবতা চণ্ডীকে কিছুতেই মানিবে না। ধনপতি চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করিয়া সিংহল যাত্রা করিল। তাহার ফলে চান্দের মতই তাহারও অশেষ দুর্গতি। খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত মাতার কাছে চণ্ডীর মহিমা উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছিল। সে কিশোর বয়সেই সিংহল যাত্রা করিল। সে গিয়া দেখে ধনপতি সেখানে কারারুদ্ধ। সেও কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। তাহাকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। সুন্দরের মত চৌতিশ অক্ষরে চণ্ডীর স্তব করিয়া সে রক্ষা পাইল এবং পিতা ধনপতিকেও বাঁচাইল। ফলে চণ্ডীর জয় হইল। প্রকারান্তরে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষের পরাজয়, সগুণা সক্রিয়া প্রকৃতির জয়।

এদিকে কালকেতুকে দেখা দিয়া চণ্ডী সাত ঘড়া স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। তাহার সাহায্যে সে গুজরাটের রাজা হইল। কলিঙ্গ-দেশের রাজার সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল, তাহাতে কালকেতুর পরাজয় হইল। চণ্ডীর কৃপায় শেষ পর্য্যন্ত কারামুক্ত হইয়া সে রাজ্য ফিরিয়া পাইল। কালকেতু ও শ্রীমন্ত চণ্ডীপূজা প্রচার করিয়া জীবনান্তে শাপমুক্ত হইল। চণ্ডীমঙ্গলে এই দুইটি উপাখ্যান পাশাপাশি বর্ত্তমান। এক চণ্ডী পূজা প্রচারের অভিন্ন উদ্দেশ্য ছাড়া দুই উপাখ্যানে

কোন সংযোগ নাই। কালকেতু ধনপতি শ্রীমন্তকে চেনে না—ইহারাও কালকেতুকে চেনে না।

বরং মনসামঙ্গলের চান্দ সদাগরের সঙ্গে ধনপতির পরিচয় ছিল। ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধে চান্দ সদাগরকে শ্রেষ্ঠ মান দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রিত বণিকগণ কুপিত হইয়া খুল্লনার সতীত্বের পরীক্ষা দাবি করিল।

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে আছে—চান্দসদাগর সমুদ্রযাত্রাপথে ধনপতির পুত্র শ্রীমন্তের নির্ম্মিত মনসা-মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া দিতেছে। অন্নদামঙ্গলে ভাঁড়ুদত্তের পৌত্রী সোহাগী হরিহোড়ের সহিত বিবাহিতা হইয়া সপত্নীকলহের দ্বারা অন্নপূর্ণার আসন বিচলিত করিতেছে।

চণ্ডীর মহিমাকীর্ত্তনই কবির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য কবি তাঁহার গ্রন্থে বহু পুরাণের সার সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি রচনায় কবি শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩য়, ৪র্থ স্কন্ধের সহায়তা লইয়াছেন। শিবের তপস্যা, ধ্যানভঙ্গ ও কার্ত্তিকের জন্মকথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতে গৃহীত। কবি রতিবিলাপ ও মদনভস্ম কুমারসম্ভব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এখানে তিনি কিছু মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। রতি বলিতেছে—

'মোর পরমায়ু লয়ে চিরকাল থাক জীয়ে আমি মরি'।

একথা কালিদাস বলেন নাই। শিবের বিবাহ ও গণেশের জন্ম কবি মৎস্যপুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

কালকেতুর রাজ্যলাভ, চণ্ডীর গোধিকারূপ ধারণ, কমলে কামিনী, শালবাহন রাজা ও বণিকের কথা বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে আছে। ইহা ছাড়া, গীতগোবিন্দ হইতে দশাবতার-স্তব, মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে মাণ্ডব্য ও বেদবতীর উপাখ্যান, মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে সাবিত্রী-উপাখ্যান, কালিকাপুরাণ হইতে মহিষমর্দ্দিনীরূপ

ধারণ, সংবর্ত্তসংহিতা হইতে খুল্লনার বিবাহপ্রস্তাব, মৎস্যপুরাণ হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনা, বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে কলির দোষকীর্ত্তন ইত্যাদি গৃহীত। শ্রীমন্তের বাল্যলীলায় শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার ছায়াপাত হইয়াছে। বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশও পুস্তকের কলেবরবৃদ্ধি করিয়াছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণেরও ছায়াপাত কোথাও কোথাও দেখা যায়।

হরগৌরীর লীলাটিকে যে আগাগোড়া এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা অবান্তর প্রসঙ্গ নয়। কারণ, দাম্পত্য কলহের পর গৌরী যখন খেদ করিতে লাগিলেন—তখনই জয়ার উপদেশে গৌরী নিজ-পূজা প্রচারের দ্বারা সান্ত্বনা ও আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন।

সকল মঙ্গলকাব্যের মত চণ্ডীমঙ্গলেও দেবতা ও মানুষের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান রাখা হয় নাই। বরং দেব ও মানবের মধ্যে সহজ স্বাভাবিক পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান দেখানো হইয়াছে। মানুষই পুণ্যবলে দেবতা হয়, দেবতাই পুণ্যক্ষয় ও আদর্শচ্যুতি হইলে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। দেবতাও মানুষের মত কামনা-বাসনা পোষণ করে, মানুষের মত নানা বৃত্তির বশীভূত, মানুষও দেবতার মত অলৌকিক শক্তির কাজ করে। দেবতারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের চেয়ে তাহাদের শক্তি বেশী, সে জন্য তাহারা মানুষের উপাস্য।

কবি তাঁহার কাব্যে অনেক অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। দেবমানবের এই প্রকারের সম্পর্কস্থলে তাহা অস্বাভাবিক একেবারেই নয়। তাহাতে কাব্যের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবার কথা নয়। কিন্তু সেই ঘটনার মধ্যেও একটা রসশৃঙ্খলা থাকা চাই। কবি সর্ব্বত্র তাহা রক্ষা করেন নাই। কালকেতুর কুটীরে চণ্ডীর আগমন

অসঙ্গত কিছু নয়, দেবীর অহৈতুকী কৃপাও হইতে পারে। ফুল্লরার সংশয়ে ও দেবীকে বধ করিবার জন্য বর্ব্বর হইলেও কালকেতুর শরযোজনায় এখানে রসভঙ্গ হইয়া যাইতেছে মনে হয়। রঘুবংশে যে ছদ্মবেশী দেবতাকে বধ করিতে গিয়া দিলীপের বাহুস্তম্ভ হইয়াছিল, সে দেবতা সিংহরূপ ধরিয়া নন্দিনী গাভীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল—সেখানে অলৌকিকতা থাকিলেও রসভঙ্গ হইতেছে না। সমুদ্রের কালীদহে ধনপতি কমলে কামিনী মূর্ত্তিদর্শন করিলেন তাহা অলৌকিক হইলেও এ কাব্যে অসঙ্গত নয়। কিন্তু তিনি পদ্মে বসিয়া হাতী গিলিতেছেন ও উগরাইতেছেন এই দৃশ্যে রসভঙ্গ ঘটে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রকে কাব্য-সৌন্দর্য্যহানিকর বীভৎস চিত্র বলিয়াছেন। দীনেশবাবু ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা কাব্য-সৌন্দর্য্যের পক্ষ হইতে নয়। তিনি বলিয়াছেন—ইহা ধর্ম্মকাব্য। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে দেবীর এই রূপেরই বর্ণনা আছে। কাজেই কবি তাহাই অনুসরণ করিয়াছেন। অন্যরূপে ি ়ত করার অধিকার তাঁহার ছিল না।

কবিগুরু কাব্যের দিক হইতে বিচার করিয়া রসাভাসের কথা তুলিয়াছেন। পুরাণের দোহাই দিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্যহানির সমর্থন করা যায় না। মঙ্গলকাব্যের কবিরা পৌরাণিক আখ্যানকে অনেক স্থলেই যথাযথ রাখেন নাই। কবি ইচ্ছা করিলে গজমোক্ষণের প্রসঙ্গ বাদ দিয়া অন্যভাবে ধনপতিকে বিপন্ন করিতে পারিতেন।

" খুল্লনার সতীধর্ম্মের পরীক্ষা মঙ্গলকাব্যের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু একটা একটা করিয়া জতুগৃহ পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষা রামায়ণ মহাভারতেও কোন সতীকে দিতে হয় নাই। অথচ খুল্লনা সতী হইলেও সাধারণ নারী মাত্র। ময়নামতীর পক্ষে অসঙ্গত হয় নাই। কারণ, সে গোরক্ষনাথের নিকট হইতে মহাজ্ঞান লাভ করিয়াছিল।"

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে Epical Grandeur কোথাও নাই। মহাকাব্যের চরিত্রের মত বিরাট চরিত্রও ইহাতে নাই। মানবজীবনের খুব বড় একটা সমস্যা বা আদর্শ লইয়াও ইহা বিরচিত নয়। ইহাতে Lyrical intensityও নাই—কোথাও অনুভূতির গাঢ়তা বা ভাবের গহনতা দেখা যায় না। ইহা বর্ণনাত্মক রচনা, ইহার কতকটা কাব্য, কতকটা নাটক, কতকটা উপন্যাস। ইহার রস সন্ধান করিতে হইবে—বিবৃতির স্বাভাবিকতায় ও অবিকলতায়, রচনা-চাতুর্য্যে, ভাষার স্বচ্ছন্দতায় ও পারিপাট্যে। কবির বর্ণনাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বভাবসঙ্গত। বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবিকঙ্কণকেই প্রথম বস্তুতন্ত্রী (Realist) কবি বলিতে পারা যায়। ঘটনাসংস্থানে অস্বাভাবিকতা থাকিলেও বর্ণনায় স্বাভাবিকতা রক্ষা করা হইয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে। কালকেতুর ব্যাধজীবনের বর্ণনা বেশ স্বভাবসঙ্গত ও কলাশ্রী-সম্মত। কবি অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন কালকেতুর ব্যাধ-জীবনের আবেষ্টনী রচনায় এবং অতি নিঃস্ব ব্যাধগৃহের পারিপার্শ্বিকতার বর্ণনায়। কালকেতুর বৈদিকমতে নামকরণ; কর্ণবেধ ইত্যাদি সংস্কার, তাহার মাতাপিতার কাশী-যাত্রা, ভাগবতের দোহাই দেওয়া ইত্যাদিতে যেন তালভঙ্গ হইয়াছে মনে হয়। এইগুলিকে আর্য্য সাহচর্য্যের ফল বলা যায়।

খুল্লনা লক্ষপতি বণিকের কন্যা—গৌড়েশ্বরের সরকারী সদাগরের বধূ। তবু সপত্নী তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে তাহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই বটে, কিন্তু একেবারে বনের মধ্যে ছাগল চরানোর ব্যবস্থা। ইহা আদৌ স্বাভাবিক নয়।

কবি জাতিকুলসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীদের কুটুম্বপীড়নের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহা যেমন সত্য, তেমনি জীবন্ত। ধনপতি লক্ষপতি হইয়াও নিজের

জ্ঞাতিকুটুম্বদের কাছে নিতান্ত অসহায়। প্রাচীন বাংলার নির্ম্মম ঈর্ষ্যান্ধ সমাজ-শাসনের চমৎকার চিত্রটি কবির রচনায় ফুটিয়াছে। জ্ঞাতিকুলের যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল—তখন ধনের এত প্রাধান্য ছিল না। ঈর্ষাতেই হউক আর যে কোন দুরভিসন্ধির আকর্ষণেই হউক সঙ্ঘবদ্ধতার কাছে যে লক্ষপতিরও কৃতাঞ্জলি হইতে হইত, এই সত্যটি কবির কাব্যে আমরা পাই।

কবি দেখাইয়াছেন---কতকটা ঈর্ষ্যা, কতকটা কুসংস্কার ও কতকটা অর্থ আদায়ের জন্য ধনবান ব্যক্তির উপর সামাজিক শাসন চালানো হইত।

বলে বেনে শঙ্খ দত্ত রাজগর্ব্বে হয়ে মত্ত জ্ঞাতিরে দেখাও রাজবল।

জ্ঞাতি যদি অতি রোষে গরুড়ের পাখা খসে ইহার উচিত পাবে ফল।

যে জন্যই হোক, একথা ধনগর্ব্বীদের শুনাইবার প্রয়োজন আছে,—দরিদ্র কবি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন।

পুরাণকে এদেশের লোক চিরদিন ইতিহাস মনে করিয়া আসিয়াছে। পুরাণের নজির তুলিয়া আপন আপন প্রতিপাদ্যের জন্য যুক্তির অভাব মিটাইয়াছে। আজিও বহুলোক তাহাই করে। কবিকঙ্কণ এই সূত্রে তাঁহার রচনার মধ্যে যতদূর সম্ভব পুরাণপ্রসঙ্গ জুড়িয়া দিয়াছেন।

খুল্লনা সতীত্বের জন্য যে সকল পরীক্ষা দিয়াছিলেন সে সকলের মধ্যে বাস্তবতা মোটেই নাই। গতানুগতিক প্রথা অনুসরণ করিয়া একপ্রকারের কাব্যালঙ্কারসৃষ্টি এবং চণ্ডীর মাহাত্ম্য দেখানো ছাড়া ইহা অন্য কিছুই নয়।

কবি তাঁহার কাব্যে প্রচলিত ধরণের জাতিকুলমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াসী হ'ন নাই। ব্যাধ কালকেতুকে তিনি আদর্শ-চরিত্রের ধর্ম্মভীরু পুরুষ বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন—ফুল্লরাও সাধ্বী সতী পতিব্রতা। নীচবংশীয় হইলেও কালকেতু চণ্ডীর কৃপার পাত্র।

সমাজের তৃতীয় স্তরের বণিক-জাতীয় ধনপতি-শ্রীমন্ত কাব্যের উত্তরাংশের নায়ক। শ্রীমন্তকে সর্ব্বপ্রকার বিদ্যালাভের অধিকারী বলিয়া কবি স্বীকার করিয়াছেন। খুল্লনা আদর্শ হিন্দুজায়া ও জননী।

দুইজন ক্ষত্রিয়-নরপতি শ্রীমন্তকে কন্যাদান করিতেছে—তাহাতে কবির কোন দ্বিধাবোধ হয় নাই। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণগুরুর চরিত্রে কবি হীনতা ও নীচতা আরোপ করিতেও এবং ব্রাহ্মণী লীলাবতীকে কদাচার ও কুক্রিয়ার সহকারিণী বলিয়া চিত্রিত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইরূপ জাতি-কুলসম্বন্ধীয় উদারতা অবশ্য সেকালের সকল কবিরই ছিল।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর প্রত্যেক সংস্কারটির কথা (উপনয়ন ছাড়া অবশ্য) ধনপতি শ্রীমন্তের প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। কবি হিন্দুর বৈদিক ও লৌকিক সংস্কারগুলির প্রত্যেকটিকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলি কাব্যের সৌন্দর্য্য বাড়ায় নাই বটে, কিন্তু কাহিনীটির পুষ্টি বিধান করিয়াছে। তাহা ছাড়া, সেকালের সমাজধর্ম্মের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

কবি খুল্লনার পুষ্পোৎসব বা পুনর্বিবাহ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে কবি লজ্জাবোধ করেন নাই। এক্ষেত্রে কবি একেবারে Realist, কবি কলির দোষবর্ণনাপ্রসঙ্গে তাঁহার সময়ে ব্রাহ্মণজাতির যে অধোগতি ঘটিয়াছিল, তাহা অকপটেই প্রকাশ করিয়াছেন—"বেদ নিন্দা করিবে ব্রাহ্মণ।"

"প্রতিগ্রহ নিবে দ্বিজ পরিহরি ধর্ম্ম নিজ, সভে হবে শূদ্রের সমান।"

"বৃথা মাংসে অভিরুচি, নহিবে ব্রাহ্মণ শুচি, হবেক ধার্ম্মিক উপহাস।
ব্রাহ্মণ না হবে ভব্য বেচিবে লবণ গব্য, বিক্রয়ে সঞ্চয়ে বহু ধন!"

"না জানিয়া পর্ব্বদিশ পরিহরি নিরামিষ দ্বিজ গাভী করিবে দোহন।"

শ্রীমন্তের লঘু অপরাধে প্রাণদণ্ড অস্বাভাবিক। একজন Realist কবির কাছে আমরা এ-সমস্ত প্রত্যাশা করি নাই। কবিকঙ্কণের সময়ে বাঙ্গালীর সাগর-বাণিজ্য-প্রথা প্রচলিত ছিল না। পূর্ব্বে এ-দেশের বণিকরা সাগরপারে বাণিজ্য করিতে যাইত—এইকথা তিনি শুনিয়াছিলেন মাত্র। সাগরযাত্রা সম্বন্ধে কবির কোন ধারণাই ছিল না। সিংহলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের কথা কবি সংস্কৃত নাটকে পড়িয়াছিলেন মাত্র। কবির লেখনীতে সাগর একটি নদী মাত্র। সাগরযাত্রা নদীতে নৌকায় ভ্রমণমাত্র। সাগরের বিরাটতা, গাম্ভীর্য্য ও রূপ-বৈচিত্র্য কবির কাব্যে একেবারেই ফুটে নাই।

কেবল সাগর নয়, বঙ্গদেশের প্রকৃতি কবির কল্পনাকে কুতুকিনী করিতে পারে নাই। খুল্লনার ছাগপালিকা রূপে পরিভ্রমণপ্রসঙ্গে যে-টুকু প্রকৃতির কথা আসিয়া পড়িয়াছে—তাহা নিতান্তই মামুলী। কবি বঙ্গদেশের অন্তরঙ্গ বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। বাঙ্গালীর সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাই কবির কাব্যে রস সঞ্চার করিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালী সমাজের ও গার্হস্থ্যজীবনের কয়েকখানি আলোকচিত্র কবির কাব্যে পাওয়া যায়। কবি বাঙ্গালী-চরিত্রের বিশেষত্ব মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীসংসারের সপত্নীকলহ, বাঙ্গালীসমাজের তুচ্ছ জাতিকুল ইত্যাদি লইয়া দলাদলি, দ্বেষাদ্বেষি, হৃদয়হীনতা, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, বণিক ইত্যাদি জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তাঁহার কাব্যে ঔপন্যাসিক সৌষ্ঠবের সহিতই ফুটিয়াছে।

কবি বাঙ্গালী পুরুষের মধ্যে বিশিষ্টরূপ মহৎ কিছুই পান নাই—স্বজাতিপ্রেমের পরিচয় দেওয়ার জন্যও কাল্পনিক মহত্ত্বের সৃষ্টি করেন নাই, যেমনটি দেখিয়াছিলেন—তেমনিই আঁকিয়াছেন। মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্ত যে খাঁটি বাঙ্গালী সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। অগ্নিশর্ম্মা

পুরোহিতটি সিংহলরাজার সভায় থাকিলেও খাঁটি বাঙ্গালী। ধূমদত্ত, শঙ্খদত্ত, নীলাম্বর দাস, রামদত্ত ইত্যাদি সমাজনায়কদের বংশ এখনো লোপ পায় নাই।

ধনপতি দত্তের চরিত্রে এক চণ্ডীর ঘট পায়ে ঠেলা ছাড়া পৌরুষের আর কোন পরিচয় নাই, তাহার চরিত্রবলের কোন পরিচয়ই নাই। ধনপতি লক্ষপতি হইয়াও কুসংস্কারান্ধ সামাজিকগণের মধ্যে মহাষ্টমীর ছাগের মত নিরাশ্রয়, অসহায়। পায়রা উড়ানোর খেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধবয়সে পুত্রলাভের আশ্বাসপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত ধনপতির জীবনে বাঙ্গালী ভোগী লোকেরই চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ধনপতির পৌরুষের পরিচয় তাহার মুখের একটি কথায়,—

"স্ত্রীদেবতা আমি পূজা নাহি করি।"

নারীর মধ্যে ফুল্লরা কাঙালঘরের বাঙ্গালী বধূ। স্বামীর মতই শ্রম করিয়া দুই জনের সমবেত চেষ্টায় সংসার চালায়। খুল্লনা ভদ্রঘরের লাঞ্ছিতা ধর্ম্মভীরু সুশীলা বধূ। লহনা দোষে-গুণে মিশ্রিতা নির্ব্বোধ বাঙ্গালী গৃহিণী। আর দুর্ব্বলা ও লীলাবতী যথাক্রমে হীনপ্রকৃতির দাসী ও প্রতিবেশিনী। এইগুলি খাঁটি বাঙ্গালী Realistic চরিত্র। এইগুলির গঠনে দৈন্যও নাই, আতিশয্যও নাই, এইগুলি নিজের চোখে দেখিয়াই যেন যথাযথ রূপে আঁকা।

কালকেতুর চরিত্রে কবি কিছু পৌরুষ দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাহা কতকটা পশুবলের অভিব্যক্তি, কতকটা চণ্ডীর কৃপাবলে প্রাপ্ত। এই কালকেতুই আবার কলিঙ্গরাজের ভয়ে লুকাইয়া রয় এবং কারাগারে বন্দী হইয়া 'কান্দে বীর ফুল্লরার মোহে।' আর বলে—'মাংস বেচিতাম ভাল এতে যে পরাণ গেল কি বাদ সাধিল কাত্যায়নী।' এই চরিত্রেও বাঙ্গালী প্রকৃতির ছাপ পড়িয়াছে।

কাব্যের দিক হইতে চরিত্রগুলির অঙ্কন-কলায় কোন দোষ হয় নাই। কেবল মহত্ত্ব-সৃষ্টির দ্বারা চরিত্রাঙ্কনের দক্ষতার বিচার হয় না—যথাযথ ও সুসমঞ্জস হইলেই চরিত্রাঙ্কন সার্থক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কবির সৃষ্ট মানুষ-চরিত্রে শুধু নয়, পশুদের চরিত্রেও বাঙ্গালী চরিত্রের ও সেকালের বাঙ্গালীদের উপদ্রুত জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে।

সব চেয়ে বড় কথা, কবির কল্পিত চরিত্রগুলির সবই রক্তমাংসে জীবন্ত। চিরপ্রচলিত মৌলিক চরিত্রগুলিতে তিনি রঙ ফলাইয়াছেন, সেগুলিতে বৈচিত্র্যসৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় না। গৌণ চরিত্রগুলিকে তিনি মনের মতন করিয়া গড়িয়াছেন। সে-গুলির মধ্যেই কবির সৃজনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কালকেতু চরিত্রটিকেও তিনি ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন। কালকেতু পশু বধ করে—কিন্তু তাহার প্রাণেও জীবের দুঃখে ব্যথা জন্মে। সে নির্ভীক, সরল, কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়-সংশয়ও তাহার মনে জাগে। পত্নীকে সে ভালবাসে, কিন্তু মিথ্যাকথা বলিলে সে তাহাকে ক্ষমা করে না। সে মহাবীর বটে, দৈহিকশক্তিও অসীম, কিন্তু তাহার মনের বল নাই, বিপদে কাঁদিয়া আকুল হয়—রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া লুকাইয়া থাকে। প্রকৃত জীবন্ত চরিত্র এইরূপই হয়। বাছিয়া বাছিয়া গুণগুলি একত্র করিয়া দেব-প্রতিমা রচনা করা যায়—দোষগুলি দিয়া মহিষাসুরের মূর্ত্তি রচনা করা যায়, কিন্তু মানুষ গড়া যায় না। কবি তাহা বুঝিতেন।

লহনা-চরিত্রের ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে উহাও একটি জীবন্ত চরিত্র। লহনা জীবন্ত বলিয়াই পাটের জাদ ও পাঁচপণ সোণা পাইয়া স্বামীকে পুনরায় বিবাহ করিতে অনুমতি দেয়, আবার দুর্ব্বলার কুমন্ত্রণায় সপত্নীপীড়নও করে; খুল্লনাকে ছাগল চরাইবার জন্য বনে পাঠায়—আবার বন হইতে ফিরিতে দেরি হইলে কাঁদিয়া মরে।

ফুল্লরা জীবন্ত বলিয়াই নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়, বিনাইয়া বিনাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং গৃহে রূপসী রমণীর সহসা আবির্ভাবে ক্রোধে সংশয়ে ঈর্ষ্যায় জলিয়া উঠে। ফুল্লরা বড় কাঙালিনী—কিন্তু স্বামীসোহাগে ঐশ্বর্য্যবতী। চণ্ডীর প্রদত্ত ধনের লোভে চিরকাঙালিনী হইয়াও প্রলুব্ধ হয় না। ডিহিদারের অত্যাচারে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া কবি একদিন দামুন্যাগ্রামের ভিটা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে। কেহ তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই, পথে পুষ্করিণী হইতে মৃণাল তুলিয়া ক্ষুধিত সন্তানকে খাইতে দিয়াছিলেন। এ-দুঃখ ভুলিবার নয়। কবির রচনায় দারিদ্র্যদুঃখের চিত্র তাই অতি চমৎকার-রূপেই ফুটিয়াছে। কাঙালিনী লাঞ্ছিতা বিজাতীয় শাসনে উপদ্রুতা বঙ্গভূমি যেন ফুল্লরার কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিয়াছে। কেবল অন্নকষ্টের দুঃখ নয়, অত্যাচার অবিচারের দুঃখ, সমাজশাসনের ব্যথা, প্রবাসের বেদনা, প্রোষিতভর্ত্তৃকার বেদনা, গতযৌবনার ক্ষোভ, মাতৃমমতার দুঃখ, সপত্নীজ্বালা—এমনই কত দুঃখজ্বালার কথায় এই কাব্যখানি পরিপূর্ণ। সকল রচনার মধ্যেই বেদনার একটা ফল্গুধারা প্রবাহিত। ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাস্যায় তিনি বাঙ্গালী নারীর চিরন্তন দুঃখের কথা ঘনীভূত করিয়া দেখাইয়াছেন। কবির অন্তরের চিরসঞ্চিত বেদনা পশু, মানুষ ও দেবদেবীর মধ্য দিয়া যেন বিশ্বব্যাপ্ত হইয়াছে। অন্নকষ্টের বেদনা পশুহন্তার জায়া ফুল্লরা হইতে পশুপতির জায়া অন্নপূর্ণা পর্য্যন্ত সকল নারীকেই বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

কালকেতু ও শ্রীমন্তের দুঃখ নিদারুণ। দেবপুত্র শাপভ্রষ্ট হইয়া মর্ত্তে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া পুনরায় স্বর্গে ফিরিয়া যাইবে—কবি গোড়াতেই এই আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছেন এবং তাঁহাদের লাঞ্ছনা

চণ্ডীমাতার লীলারই অন্তর্গত বলিয়াই আমরা ঐ দুর্ব্বিষহ দুঃখের কাহিনী উপভোগ করি—নতুবা এইরূপ দুঃখের কাহিনী আমাদের চিত্তে রসসৃষ্টি করিতে পারিত না।

কবি দারিদ্র্যদুঃখের দুইটি রূপ দেখাইয়াছেন। একটি রূপকে তিনি তপস্যার মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। খুল্লনা ও ফুল্লরার প্রতি চণ্ডীর করুণা অহৈতুকী নয়, তাহা যেন ঐ তপস্যারই পুরস্কার। ইহারা ত দুর্ব্বিষহ দুঃখ সহ্য করা ছাড়া অন্য কোন তপস্যা করে নাই। কবি দুঃখের আর একটি রূপ দেখাইয়াছেন—ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রে। নিদারুণ দারিদ্র্যদুঃখ মানুষকে কি করিয়া পিশাচ করিয়া তোলে, এই রূপের মধ্যে তিনি তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

বঙ্গসাহিত্যে কবিকঙ্কণই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীর ঘরসংসারের ছোট-খাটো সুখদুঃখ এবং খুঁটিনাটি লইয়া কাব্য রচনা করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে কাব্যের রসমন্দিরে নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্থান দিয়াছেন। একজন ব্যাধকে তিনি কাব্যের নায়করূপে দেখাইতে সাহস করিয়াছেন —অস্পৃশ্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে পাংক্তেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

কেবল কালকেতুর কথা নয়। মুরারি শীল ও ভাঁড়ু দত্তের মত জীবন্ত চরিত্র নৈতিক জগতের ব্যাধ। পতিতপাবন কবি এই ব্যাধদেরও কাব্যে ঠাঁই দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃচ্ছ-কটিকের যে মর্য্যাদা তাহা এই চণ্ডীমঙ্গল দাবি করিতে পারে। ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীল রসসৃষ্টির যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কালকেতুও সারস্বত মন্দিরে স্থান পাইয়া চণ্ডীর কৃপালাভের পর সে আর ব্যাধও থাকিল না—সাহিত্যের মর্য্যাদারক্ষায় সে সহায়তাও করিল না। বঙ্গসাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় এইরূপ চরিত্র-চিত্রণ অভিনব, গতানুগতিকতার বিরোধী। পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীমঙ্গলের

চরিত্রচিত্রণের কথা চিন্তা করিলে অবশ্য দেখা যায়, সমস্ত কৃতিত্বটুকু কবিকঙ্কণেরই প্রাপ্য নয়।

চণ্ডীমঙ্গলের ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছু নাই বটে, কিন্তু উহা হইতে সেকালের প্রথা-পদ্ধতি, জাতিবিভাগ, জাতিকুলের মর্য্যাদা, ব্যবসা বাণিজ্য, নগরপত্তন ও রাজসভা, পারিবারিক আচার-পদ্ধতি, নৌযাত্রা, উৎসব-আমোদ ও দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস উদ্ধার করা যায়। কবি তাঁহার সামসাময়িক জাতীয় অনেক বার্ত্তাই আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ঘরসংসারের খুটিনাটির কথা বলিতে গিয়া কবির তালিকা দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। এই তালিকা রসসৃষ্টির পরম পরিপন্থী। কেবল মাত্র তালিকা সাজানোর পদ্ধতির অনুসরণ করিতে গিয়া কবি শ্রীমন্তকে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন।—কালকেতুকে ভোজনরাক্ষস বানাইয়াছেন, খুল্লনার পরীক্ষার সংখ্যা অযথা বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন, গহনার একটা প্রকাণ্ড ফর্দ্দ দিয়া অলস ঐশ্বর্য্যের একটা পীতবর্ণের মায়ার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পণ্য বিনিময়ের একটা কাল্পনিক তালিকা দিয়া বর্ণনীয় বিষয়কে অসত্য করিয়া তুলিয়াছেন। এই নির্ঘণ্ট-রচনার প্রথা বঙ্গসাহিত্যের সকল শাখাতেই দেখা যায়। বোধ হয়, কবিরা কল্পিত বা অকল্পিত কতকগুলো নামকে ছন্দে গাঁথিতে পারাকে একটা কৃতিত্বই মনে করিতেন।

পুরনারীগণের পতিনিন্দা একটি গতানুগতিক প্রথা। কুমন্ত্রণা দিবার জন্য এবং তদ্দারা সাংসারিক শান্তি বিনাশের জন্য নীচশ্রেণীর একটি দাসীর অবতারণার প্রথা রামায়ণ হইতেই সংক্রমিত। একটি কুচক্রিণী বামনী চরিত্রের অবতারণা প্রাচীনসাহিত্যের নিজস্ব প্রথা।

স্বপ্নের সাহায্যে কাহিনীর গতিপরিবর্ত্তনও একটি প্রথা! স্বপ্নে

বিশ্বাস, গণক-বচনে বিশ্বাস, কুলক্ষণে বিশ্বাস, দিনক্ষণে পাঁজিপুঁথিতে এবং অদৃষ্টে বিশ্বাস—এ সমস্ত সকল কাব্যেই দেখা যায়। যে যাত্রার ফল ভাল হইবে না, সে যাত্রার সময় কতকগুলি কুলক্ষণের উল্লেখ করা একটি প্রথা। যতগুলি কুলক্ষণের কথা লোকাচারে প্রচলিত আছে, কবিকঙ্কণ ধনপতির বাণিজ্যযাত্রাকালে সবগুলির একটি তালিকা দিয়াছেন।

কথাকাটাকাটি ও কলহ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একটি অঙ্গ। ইহা একটি রসরচনার ভঙ্গী। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইতে এই প্রথা বরাবর বঙ্গ-সাহিত্যে চলিয়াছে। এই কথাকাটাকাটির ছলে—পৌরাণিক নজির দেখানোও গতানুগতিক প্রথা।

কাব্যের নায়ককে দর্শন করিবার জন্য পুরনারীগণের ব্যাকুল উদ্‌গ্রীবতা এবং সে জন্য বেশভূষার বিপর্য্যয়'—কাব্যের এই অঙ্গ সংস্কৃত হইতে সংক্রামিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস বা বৎসরের পর বৎসর কোন ব্যাপারের অনুসরণ,—একটি প্রথা। কবিকঙ্কণ মাসের পর মাস খুল্লনার গর্ভের ক্রমোন্মেষ অনুসরণ করিয়াছেন। বৎসরের পর বৎসর বালিকার বিবাহোপযোগিতা লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সব চেয়ে কবির বারমাস্যা-বর্ণনাই উল্লেখযোগ্য। এই বারমাস্যা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ।

কাহিনীর ক্রমপরিণতিতে পরে যাহা যাহা ঘটিবে, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়া দেওয়ার প্রথা তখনকার কাব্যে প্রচলিত ছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত গণৎকারের গণনাচ্ছলে তাহার মুখেই বসানো হইত। শ্রীমন্তের বাণিজ্যযাত্রার পূর্ব্বেই সেই প্রথা অনুসারে গণক যাত্রার ফলাফল সমস্তই বলিয়া দিতেছে।

নারদ, বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমানের সহায়তা গ্রহণ অধিকাংশ কাব্যেই দেখা

যায়। এই সহায়তাগ্রহণও একটি পদ্ধতি। যাহা বিশ্বকর্ম্মা বা হনুমানের সৃষ্টি—তাহার সম্ভাব্য-অসম্ভাব্যতা, প্রাকৃত-অপ্রাকৃত বিচার করা মূঢ়তা। ইঁহাদের সাহায্য লইয়া কবি বাস্তবতার জবাবদিহি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

রামায়ণের হনুমান শুধু ধনপতির তরী ডুবায় নাই এবং শ্রীমন্তের সপ্ততরী নির্ম্মাণের ভার লয় নাই, গন্ধমাদন পর্ব্বত আনিয়া বিশল্যকরণীর সাহায্যে সিংহলে মৃত সৈন্যদের পুনর্জীবন দান করিয়াছে।

চৌতিশ অক্ষরে দেবীস্তব (চৌতিশা) সংস্কৃত পুরাণ হইতেই মঙ্গলকাব্যে সঞ্চারিত। পরবর্ত্তী কাব্যগুলিতে এই প্রথা অনুসৃত হইয়াছে—সকল কালিকামঙ্গলেই এই চৌতিশা আছে।

কবির রচনা সাবলীল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ও সরল মাধুর্য্যে মণ্ডিত। প্রসাদগুণের অভাব কোথাও নাই। কতকাল আগের রচনা, অথচ বর্ত্তমান যুগের উৎকৃষ্ট রচনার মত ইহা আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে। ডিহিদারের অত্যাচারে জন্মভূমি হইতে বিদায় গ্রহণের যে মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা কবি দিয়াছেন, তাহার কারুণ্য-মাধুরী সর্ব্বযুগের উপভোগ্য।

কবিকঙ্কণের উপাখ্যানটি কবির নিজস্ব নয়। কবির সহানুভূতি ও রসানুভূতির গাঢ়তাই সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। চরিত্র-গুলির নাম, রূপ ও আচরণ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের ভূষণ ও ভাষণ কবি তাঁহার চারিপাশের ঘরসংসার হইতে সংকলন করিয়াছেন সর্বোপরি তাহাদের মধ্যে নিজের হৃদয়খানি সঞ্চারিত করিয়াছেন। কবি প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, নিসর্গশ্রীতে প্রাণসঞ্চারও করিতে পারেন নাই, কিন্তু মানবসংসারের যে পটভূমিকা ও সামাজিক জীবনের যে আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা যেমন যথাযথ, তেমনি জীবন্ত। কৈলাসভবন

হইতে কিরাত-ভবন পর্য্যন্ত সকল আবেষ্টনীই তাঁহার তূলিকায় রসানুকুল ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

কবি তাঁহার কাব্য সৃষ্টির মধ্যে ধর্ম্ম ও নীতিকে একসঙ্গে মিলাইয়াছেন। তাই তিনি চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম ও ন্যায়, সত্য, সুনীতি ও সতীত্বেরও জয় ঘোষণা করিয়াছেন। কোন প্রকারের ধর্ম্মহানি অথবা নৈতিক অঙ্গহানিকে তিনি উপেক্ষা করিয়া যান নাই—প্রত্যেকটির দণ্ডবিধান করিয়াছেন। সত্যের জন্য বা সতীত্বের জন্য সর্ব্ববিধ দুঃখ-স্বীকারকে তিনি পুরস্কৃত করিয়াছেন। এমন কি, কালকেতু যখন বলিল—"মা, কেন আমি এত দুঃখ পাইলাম ?" চণ্ডী বলিলেন, "বৎস, তোমার পশুবধ পাপের এই দণ্ড।"

লহনার চিত্তশুদ্ধি হইল ; তাহার মনে কোন মালিন্য থাকিল না। তাহার পুরস্কার সে পাইল—প্রৌঢ় বয়সে সে পুত্রসন্তান লাভ করিল। যে শ্রেণীর কাব্য কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—সে শ্রেণীর কাব্যের উৎকর্ষের দিক হইতে ইহার মূল্য আছে। কালকেতু যে অগাধ ধন লাভ করিল, কেবল তাহা অসীম দুঃখভোগের তপস্যার পুরস্কারস্বরূপ নয়—কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নৈতিক সবলতারও পুরস্কার।

এই কাব্যে শৈবদের সহিত শাক্তদের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, সত্যের সহিত অসত্যের দ্বন্দ্বটি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। আর একটি দ্বন্দ্ব গোড়া হইতেই চলিয়াছে--সে দ্বন্দ্ব রসসরস্বতীর সহিত চণ্ডীর দ্বন্দ্ব। ইহাতে কে হারিল কে জিতিল, তাহা রসজ্ঞগণের বিচার্য্য। কখনও চণ্ডীর জয় হইয়াছে অর্থাৎ চণ্ডীর পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কখনও রসসরস্বতীর জয় হইয়াছে—চণ্ডীর মহিমাপ্রচার গৌণ হইয়া কাব্যরসসৃষ্টিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীর জরতী বেশ ধারণ চণ্ডীমঙ্গল হইতেই অন্নদামঙ্গলে সংক্রান্ত।

দেবতার শ্লেষে আত্মপরিচয়—অল্পবিস্তর সকল মঙ্গলকাব্যেই আছে। অন্নদামঙ্গলের এই পরিচয়টি বঙ্গসাহিত্যে খুবই প্রসিদ্ধ। কিন্তু ভারতচন্দ্র ইহার অনেক টুকুই কবিকঙ্কণ হইতেই পাইয়াছেন।

বীভৎসরসের দুই একটা চিত্র সকল মঙ্গলকাব্যেই সংযোজনার প্রথা ছিল। সাধারণতঃ শ্মশান-মশানের বর্ণনা অথবা যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই রসের অবতারণা করা হইত। কবিকঙ্কণে সিংহল-যুদ্ধের শেষে এই বর্ণনা আসিয়াছে—ধর্ম্মমঙ্গলের মত ইহা ততটা জুগুপ্সাজনক হয় নাই।

কবিকঙ্কণে চণ্ডীর জরতী-বেশের বর্ণনাতেও কিছু বীভৎসতা আছে! মনসামঙ্গলে বেহুলার মান্দাসে লখীন্দরের মৃতদেহ অবলম্বনে বীভৎস-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

নানাপ্রকার অলঙ্কারপ্রয়োগ করিয়া কাব্যের সমৃদ্ধি বাড়াইবার প্রথা সেযুগেও কোন কোন অকিঞ্চন বৈষ্ণব কবিদেরও ছিল। কবিকঙ্কণ চেষ্টা করিয়া নানাপ্রকার বক্রোক্তিমূলক অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়া কাব্যের সমৃদ্ধি বাড়াইতে চাহেন নাই। কবির ভাষা সুন্দরী পল্লীরমণীর মত নিরাভরণা, সরলা, শুচিস্মিতা, কিন্তু তাহার অঙ্গে শাঁখা-সিন্দূর ও গলায় একগাছা হার যে নাই—তাহা নয়। তবে চন্দ্রহার নাই তাহার কটিতে, কঙ্কণ নাই তাহার প্রকোষ্ঠে, মুকুতার বেড় দেওয়া পাটের জাদ নাই তাহার পরণে, আর ঝঙ্কারমুখর নূপুর নাই তাহার চরণে।

২

চণ্ডীমঙ্গল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর হরিনামে মুখরিত বৈষ্ণব-ভাবাবিষ্ট রাঢ়বঙ্গে রচিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মহিমা গান করিলেও নিজে বৈষ্ণব ছিলেন। কবি বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শাক্তধর্ম্মকে একই ধর্ম্মের দুইটি পৃথকরূপ বলিয়া জানিতেন। হরিহর ও চণ্ডীর মধ্যে তাঁহার বিভেদজ্ঞান ছিল না। কবি দেখাইয়াছেন, সেই জ্ঞানের অভাবেই ধনপতির যত লাঞ্ছনা। কবি বলিয়াছেন—

শিবপূজা করে যেবা দেবীপরায়ণ।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মী নারায়ণ॥

চণ্ডীমঙ্গলে শ্রীহরির মহিমা নানা স্থলেই ঘোষিত হইয়াছে। নানা জনের মুখে নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়া কবি শ্রীহরিকে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীমন্ত বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে আবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ-লীলার অভিনয় করিত। শ্রীমন্তের বাল্যলীলার বর্ণনাচ্ছলে কবি ভাগবতের কতকগুলি উপাখ্যান বিবৃত করিয়াছেন। ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্রযাত্রা-পথে জগন্নাথদেবের প্রতি কবি অন্তরের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। ধনপতি ও শ্রীমন্ত দুইজনেই গঙ্গাপথে নবদ্বীপের পাশ দিয়া যাইবার সময় চৈতন্যচরণে প্রণাম করিয়া যাইতেছেন। গ্রন্থারম্ভে কবি অন্যান্য দেবতার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের বন্দনাগান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যকে কবি ভগবানের অবতারই মনে করিতেন। আমাদের সাহিত্যে ও শাস্ত্রে কলিযুগের দোষকীর্ত্তনই কেবল দেখা যায়। বৈষ্ণব সাধক-কবিগণই প্রথম কলিযুগের গুণ-কীর্ত্তন করেন। যে যুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিনাম প্রচার করিয়া

মানবমাত্রেরই মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সে যুগ সকল যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কলির গুণ-কীর্ত্তনে কবিকঙ্কণ বৈষ্ণবসাধকদের মতই হরিনামের মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্য যুগে। ত্রেতাযুগে হরিপদ পায় নানা যোগে॥
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠে চলে পূজিয়া গোপালে। হরিনামে হরিপদ পায় কলিকালে॥
নারায়ণপদে যেবা করে নমস্কার। কলি নাহি বাধে তার কি করে সংসার॥
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়। জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি লয়॥

শিবদুর্গার অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখাইয়া কবি শৈবশাক্তের দ্বন্দ্বের সমাধান যেমন করিয়াছেন—চণ্ডীর মুখে হরিনামের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়া তেমনি শাক্ত-বৈষ্ণব-দ্বন্দ্বেরও মীমাংসা করিয়াছেন।

কবি দেখাইয়াছেন—ধনপতির দুইটি প্রধান ভুল হইয়াছিল। একটি ভুল—খুল্লনা যে চণ্ডীর পূজা করিতেন—ধনপতি তাহাকে বৌদ্ধদের ডাকিনী দেবতা অথবা অনার্য্যদের দেবতা মনে করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ঘটকে পায়ে ঠেলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তাঁহার কাব্যে দেখাইয়াছেন—এই দেবী হিন্দুদের মহাশক্তি, শিব-সীমন্তিনী মহামায়া। খুল্লনা তাঁহার স্তবে বলিয়াছেন, তাঁহার উপাস্যা সেই মহামায়া—যিনি দক্ষের যজ্ঞে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—যিনি মহিষাসুর, মধুকৈটভ, শুম্ভ, নিশুম্ভ ইত্যাদি দৈত্যগণের ভয় হইতে এবং দুর্ব্বাসার কোপ হইতে দেবগণকে রক্ষা করেন, যিনি কংস ভয় হইতে নারায়ণকে এবং রাবণভয় হইতে রামচন্দ্রকে রক্ষা করেন, যিনি সুরথ সমাধির উপাস্যা। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে ডাকিনী যোগিনীদের পূজা করিত, ধনপতি খুল্লনার চণ্ডীকে তাহাদের সঙ্গে অভিন্নাত্মিকা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ধনপতির দ্বিতীয় ভ্রান্তি, তিনি বুঝিতেন না—চণ্ডী শিব হইতে পৃথক নহেন। চণ্ডীর পূজাতেই যে শিবের তুষ্টি—

তাহা তিনি বুঝেন নাই। তাঁহার এই ভেদবুদ্ধিই তাঁহার দুর্গতির কারণ। এই ভেদবুদ্ধির জন্যই বঙ্গদেশে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা, কলহ, দ্বেষাদ্বেষির অন্ত ছিল না। ধনপতি সেই ভেদবুদ্ধিরই প্রতীক মাত্র। ধনপতি বলিয়াছিলেন—

যদি মোর যায় প্রাণ মহাদেব বিনে আন অন্যদেব না করি পূজন।
হয়্যা মোর অর্দ্ধঅঙ্গ কৈল সেই ব্রতভঙ্গ জায়া হয়্যা হৈল অভাজন॥

কবি সিংহলেশ্বরের মুখে প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব বসাইয়াছেন—

শুনিয়া সাধুর বাণী কহে নৃপ চূড়ামণি শ্রবণে আরোপি দুই হাত।
শুন সাধু মূঢ়মতি না পূজিলে ভগবতী অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ॥
ভেদ সাধু কর জনু শিবশক্তি এক তনু ভাবিলে যমের নাহি দায়।
হরিহর প্রজাপতি পূজে নিত্য হৈমবতী সুর মুনি যাহারে ধেয়ায়।

খুল্লনার চণ্ডী-ভক্তিতে বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশ্য সমাধির মত বৈশ্য-কন্যা নিষ্কাম উপাসনা করিতেন। চণ্ডী যখন সদয় হইয়া খুল্লনাকে বর দিতে চাহিয়াছিলেন—তখন খুল্লনা বলিয়াছিলেন—

যদি বর দিবে গো মঙ্গল চণ্ডীগণ। তোমার চরণে মা রহুক মোর মন॥

খুল্লনা ধনমান, পরমায়ু—এমন কি পুত্রবরও চাহিলেন না। ইহা বঙ্গদেশে সে কালে প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মাদর্শের প্রভাবে। খুল্লনা ঐহিক সুখসম্পদ চাহেন নাই, আদর্শ সতী ও আদর্শ মাতার যতটুকু কামনা—তাহা তিনি উপাস্যার চরণে নিবেদন করিয়াছেন। সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিয়া তিনি চণ্ডীচরণে আশ্রয় লইয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত' ভব-গতায়াত' হইতে অব্যাহতি চাহিয়াছেন। খুল্লনার আকিঞ্চন—

অভয়া স্থল দেহ চরণকমলে।
সকল বিফল ধন্ধ দূর কৈলে আশাবন্ধ বৃথা জন্ম হৈল মহীতলে॥

পতি পুত্র ভ্রাতৃ বন্ধু সকল শোকের সিন্ধু কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর।
সজীব করয়ে গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ মহাব্রত তথি স্বতন্তর॥
দূর কৈলে নারীর আয়াত। দূর কর ভব যাতায়াত।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের কোন ইঙ্গিত আভাস নাই—অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শঙ্কর, রামানুজ ইত্যাদির নাম-গন্ধও কোথাও নাই। মোটকথা, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কোন জ্ঞান তখনকার একজন শ্রেষ্ঠ কবিপণ্ডিত কবিকঙ্কণেরও ছিল না। ইতিহাস বলিতে কবি বুঝিতেন—রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ। যত নজির সব এইগুলি হইতেই উদ্ধৃত। ধনপতি খুল্লনাকে বলিতেছেন—

নারীর চরিতে শুনেছি ভারতে ইতিহাসে দেহ মন।
শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা ভাগ্যে পায় একজন।

(ভারতে অর্থাৎ মহাভারতে।)

ফুল্লরা ছদ্মবেশিনী চণ্ডীকে বলিতেছেন—

পণ্ডিতের মুখে যত শুন্যাছি পুরাণ মত ইতিহাসের কর অবগতি।

সেকালের কবির ভৌগোলিক জ্ঞানও বড় ক্ষীণ। কাহিনীর পট-ভূমিকা ঠিক রাখিবার জন্য যে ভৌগোলিক যথাযথতা রক্ষা করিবার প্রয়োজন আছে—তাহা তাঁহারা মনে করিতেন না। এ বিষয়ে কবি উপকথার প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। কবির উজানী বা উজাবনী নগরটির সঙ্গেও দেশগত বাস্তবিকতা নাই। নগরটি অজয়ের তীরে অবস্থিত। এখানে একজন রাজাও আছেন। কিন্তু নগরের কোন রূপ ইহাতে ফুটান নাই। খুল্লনার ছাগল চরানোর জন্য নগরের পাশেই কেবল বন নয়—পাহাড়েরও সংস্থান করিয়াছেন। ধনপতির গৌড়-যাত্রার পথটি ভূগোলসম্মত নয়। উজানি হইতে গৌড় খুব বেশি দূর নয়—কিন্তু কবির কাব্যে তাহা কাল্পনিক সুদূরত্বলাভ করিয়াছে।

সমুদ্রের সহিত কবির কোন পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না। সমুদ্রের বিশালতা, বিরাটতা, গাম্ভীর্য্য বা চিত্তবিস্ফারক রূপবৈচিত্র্য কবির কাব্যে এসমস্তের পরিচয় পাওয়া যায় না। কবির কাছে সমুদ্র একটি বৃহৎ নদী ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই গঙ্গার মোহনা হইতে সিংহল যাত্রার পথের বর্ণনায় কবি লিখিয়াছেন—

ডানি বামে ছাড়্যা যায় কত কত দেশ।

বঙ্গসাগর পাড়ি দিতে গিয়া ধনপতি পাইতেছেন—

দক্ষিণে মদনমল্ল বামে বীরসানা।

অঙ্গারপুরের খাল বাম দিকে থুয়ে তিনি দ্রাবিড় দেশে পৌছিলেন। বাংলাদেশ হইতে বিশ দিনে ধনপতি দ্রাবিড় দেশে উপস্থিত হইলেন।

ইহা ছাড়া, নীলাচল, চিল্‌কা, সেতুবন্ধ অবশ্য ইত্যাদির নাম ভুগোলসম্মত। সমগ্র সমুদ্রপথটাই স্বপ্নরাজ্যের, কিন্তু হার্ম্মাদের (পোর্ত্তুগীজ জাহাজের) ভয়ের কথাটা স্বপ্ন নয়, সত্য।

কবির কাছে সমুদ্রটা বড় নয়, সমুদ্র পার হওয়াটাই বড় কথা। কবি সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ধনপতির ডিঙ্গাগুলি যে ডুবিল—তাহাও সমুদ্রের স্বাভাবিক বিপৎপাতে নয়—চণ্ডীর কোপে।

গঙ্গার মোহনা পর্য্যন্ত বাংলাদেশ কবির পরিচিত ছিল. এতটা পথের বর্ণনায় কবি ভৌগোলিক সত্য-নিষ্ঠা দেখাইয়াছেন—তারপর হইতে অজ্ঞাত রহস্যময় অপরিচয়ের রাজ্য। পুরীধামের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয়; দ্রাবিড়দেশের নামও তিনি শুনিয়াছিলেন। পুরীধামের পর কবি যে দুই চারিটি কাল্পনিক স্থানের নাম করিয়াছেন, তাহাদের তিনি বাংলা নামেই অভিহিত করিয়াছেন।

অনেক বিষয়েই কবি যথাযথতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। কতকটা কাব্যেরই প্রয়োজনে, কতকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাবে।

কাব্যের কাহিনীর প্রয়োজনেই ধনবান লক্ষ্মীপতি সপত্নীর ঘরে কন্যা দান করে, খুল্লনা ছাগ চরাইতে বাধ্য হয়, পিতৃ-গৃহে আশ্রয় পায় না। ধনপতি লক্ষেশ্বর হইলেও লহনা খুল্লনাকে দুইবেলা রাঁধিতে হয়; দুর্ব্বলা ছাড়া ধনপতির গৃহে অন্য দাসদাসী নাই। পাঁচ পল সোনা আর একখানি পাটশাড়ী ঘুষ দিয়া ধনপতি অনায়াসে ধনেশ্বরী লহনার কাছ হইতে দ্বিতীয় বিবাহ করিবার অনুমতি পায়।

খুল্লনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিলেন—তাহাতে খুল্লনাকে দেশের লোকের দেবী মনে করিয়া পূজা করিবার কথা, এবং ধনপতিরও চণ্ডীর মাহাত্ম্য ও খুল্লনার দৈবী-শক্তি স্বীকার করার কথা, খুল্লনারও লহনার দাসীত্ব স্বীকার করার কথা নয়। কিন্তু কাহিনীর প্রয়োজনে কবি সে দিক্‌টা উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের গতানুগতিক প্রথা অনুসারে কতকগুলি অসম্ভব ব্যাপারের আরোপে সতীত্বের মহিমা ঘোষণা করিয়াই কবির দায়িত্ব শেষ হইয়াছে—তাহার ফলাফলের জের টানিবার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন নাই। ইহাই ছিল সে যুগের কাব্যের ধারা।

কবি নিজে একজন তথাকথিত রাজার সভায় ছিলেন, কিন্তু ধনী লোকদের পারিবারিক বা সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে কবির বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কবি নিজে দরিদ্রের সন্তান ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশকাল দারুণ দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রামে অতিবাহিত হইয়াছে। দরিদ্র সংসার তাঁহার লেখনীতে যেমন ফুটিয়াছে, ধনীর সংসারটি তেমন ভাবে ফুটে নাই। ধনীর সংসার মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সংসারেই পরিণত হইয়াছে। ১

কবি বাণিজ্যের যে পণ্যবিনিময়ের তালিকা দিয়াছেন—তাহাতেও যথাযথতা রক্ষা করা হয় নাই। সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়া তুরঙ্গমাতঙ্গ, ধবল চামর ইত্যাদি পাইবার কথা নয়। এ তালিকা একটা আলঙ্কারিকতার (Rhetorical display) দৃষ্টান্ত মাত্র।

ধনপতি সিংহলরাজের জন্য যে সকল দ্রব্য ভেটস্বরূপ লইয়া গেলেন—তাহাদের মধ্যে বাংলার কলা, পাকাতাল, আম্রপনস, নারিকেল, ফুলমধু, দধি, খাসা চিনি, লাড়ু, গঙ্গাজল, কুলকরঞ্জা, পিণ্ড-খেজুরের সঙ্গে শিকারী কুকুর ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত আছে। ইহাকে একটা অসম্বন্ধ তালিকা মাত্র বলা যাইতে পারে।

সিংহলের অগ্নিশর্ম্মা পুরোহিতটি একেবারে বাংলাদেশের পুরোহিতদের প্রতিনিধি। বলা বহুল্য, কবিকঙ্কণের সমুদ্র যেমন বহু দহে খণ্ডিত নদী, তাঁহার সিংহল তেমনি বাংলাদেশেরই একটি নগরমাত্র। সিংহলরাজের সৈন্যদলে যবন কিরাত, শক, আগুদলের উজবক, খোরাসানী, পাঠান, মোগল ত ছিলই, তাহা ছাড়া নয় কাহন বাগ্দী, সাতকাহন হাড়ি ও বারো কাহন ডোম ছিল।

কবির কাছে সিংহল প্রথমে বাংলারই একটি নগর ছিল, দেখিতে দেখিতে দামুন্যার মত বর্দ্ধমান জেলার একখানি গ্রামে পরিণত হইল। সুশীলার বারমাস্যায় রাজকন্যা সুশীলা শ্রীমন্তকে বলিতেছে—

সকল নতুন শস্য হবে এই মাসে। ধান্য চাল্য মুগ মাস পূরিবে আগুয়াসে॥
রাজাকে বলিয়া দিব শতেক খামার। তার শস্য আনি নাথ বাঁধিব হামার॥

একথা বলিতে বলিতে কবির মনে পড়িয়া গেল— নিজ জন্মভূমি দামুন্যার জীবনের কথা, যেখানে একদিন তিনি "চাষ চষিয়া" সুখে কাল কাটাইতেন। তাই সুশীলার মুখ দিয়া বলাইলেন—

বিফল জনম তার যার নাই চাষ।

সিংহলের কথায় কবি বাংলার দুর্গোৎসবকে ভুলিতে পারেন নাই।
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করিবে হরিষে। ষোল উপচারে মেষছাগলমহিষে॥'

বেণের ছেলে শ্রীমন্ত বারো বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিল, একজন ব্রাহ্মণ মহামহোপাধ্যায় সারা জীবনেও সে সমস্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমন্তের এত বিদ্যার কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রকৃত পক্ষে কবিকঙ্কণ যতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম শুনিয়াছিলেন—সে সমস্ত দিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া শ্রীমন্তের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। মাণিকরাম লাউসেনের স্কন্ধেও এইরূপ বিদ্যাভার চাপাইয়াছেন।

শ্রীমন্ত বিদ্যাসমাপ্তির পর গুরুকে যে প্রশ্ন করিল তাহা এই—"পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে স্তনদুগ্ধের সঙ্গে বিষপান করাইল, তবু অন্তিমে পূতনার সদ্‌গতি হইল—এইরূপ অসঙ্গতি কি করিয়া সম্ভব?" গুরু উত্তর করিলেন—"কৃষ্ণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে নাহি সমাধান।"

যেমন প্রশ্ন—তেমনি উত্তর। এইরূপ প্রশ্ন ও এইরূপ উত্তর যে বিদ্যায় সম্ভব, এ গ্রন্থের গুরু ও শিষ্যের সেইরূপ বিদ্যাই স্বাভাবিক। তারপর গুরুর আচরণেও ঐরূপ বিদ্যাই সমর্থিত হইয়াছে।

জনার্দ্দন বলিতেছে—আটাশি বৎসর হৈল আমার বয়েস। ধনপতির বন্ধু জনার্দ্দনের বয়স এত কি করিয়া হয়? শ্রীমন্ত বা বারো বছর বয়সে সিংহল যাত্রা করে কি করিয়া? শ্রীমন্তের বধূদের বয়সও শ্রীমন্তের চেয়ে বেশি।

চণ্ডী মা যাহার সহায়িকা সেই খুল্লনা এত দুঃখ পায় কেন? যেখানে অন্য কোন দেবতা বিরূপ, সেখানে এক দেবতার অনুগ্রহ লাভ করিয়াও ভক্ত দুঃখ পাইবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু খুল্লনা কোন দেবতার রোষ উৎপাদন করে নাই—চণ্ডীর একান্ত উপাসিকা ছিল সে। তবু যত দুঃখ সে পাইয়াছে—এত দুঃখ বঙ্গসাহিত্যের

অন্য কোন নারী পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। অদৃষ্টের দুঃখ, জননীর দুঃখ, পত্নীর দুঃখ, সপত্নী লাঞ্ছনার দুঃখ, চণ্ডীর পরীক্ষার দুঃখ, সামাজিক লাঞ্ছনার দুঃখ, দনাই পণ্ডিতের মুখে অসহ্য বাক্যযন্ত্রণা—সর্ব্ববিধ দুঃখ খুল্লনার জীবনকে বেদনার প্রবাহিণী করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের সমাজে সাধ্বী-সতী, পুত্রবৎসলা, নম্রশীলা, ধর্ম্মপরায়ণা নারী—পারিবারিক শাসন, সামাজিক শাসন ও শাস্ত্রের শাসনে কত লাঞ্ছনা ভোগ করে, কবি কি নানা করণ উপকরণের অবতারণা করিয়া তাহাই দেখাইয়াছেন? এইরূপ নারীর অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মপথে একনিষ্ঠতার আদর্শই কি খুল্লনাচরিত্রে তিনি দেখাইয়াছেন? অবশ্য সপত্নী-লাঞ্ছনার কথাটা রীতিমত তাঁহার সময়ের বাস্তব সামাজিক জীবন হইতেই গৃহীত। তাহাতে কবি অনেকটুকু রঙ চড়াইয়াছেন। কিন্তু খুল্লনার এই দুঃখই ত একমাত্র দুঃখ নয়। বাঙ্গালীসমাজের অসহায়া সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি কবির অন্তরের দরদ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে ফুটিয়াছে।

সপত্নীদ্বেষের ব্যাপারটা কবি বাস্তবজীবন হইতেই পাইয়াছিলেন। খুব সম্ভব নিজের গৃহেই এ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল—একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

একজন সহিলে কোন্দল যায় দূর। বিশেষ জানেন চক্রবর্ত্তী ঠাকুর।

সপত্নীর মনস্তত্ত্বের যে পরিচয় কবি তাঁহার কাব্যে দিয়াছেন—তাহা অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির ফল। বর্ত্তমান যুগের ঔপন্যাসিকগণও ইহাতে হার মানিবেন। তবু লহনাচরিত্রে কবি অতিরিক্তরূপ হিংস্রতারই আরোপ করিয়াছেন—সাপত্ন্য-বিষকে কবি অতিরিক্ত তীব্র করিয়া দেখাইয়াছেন। সপত্নী লাঞ্ছনার জন্য পত্র জাল করিয়াছে, খুল্লনাকে প্রহার করিয়াছে—তাহাকে অন্ন-বস্ত্র হইতে

বঞ্চিত করিয়াছে। স্বামী যখন সিংহল যাত্রা করিবে তখন লহনা দেবীর কাছে প্রার্থনা করিতেছে—

এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণে। দ্বাদশ বৎসর কর সাধুর বন্ধনে॥
জিয়ন্ত ভাতারে যাহার নাহি সুখ। সে জন মরিলে তার কিবা হয় দুখ॥

সপত্নী-পীড়নের জন্য সে নিজের বৈধব্যদুঃখও কামনা করিতেছে।

এই সন্তানহীনা লহনার চিত্তে গৃহের একমাত্র সন্তান শ্রীমন্তও মাতৃবৎসল্যের সঞ্চার করিতে পারে নাই। শ্রীমন্ত সিংহলযাত্রার সঙ্কল্প করায় লহনা আনন্দিত। যাত্রাকালে শ্রীমন্ত বিমাতার পদে নমস্কার করিল। আশীর্ব্বাদের বদলে সে বলিল—

'বাহুড়িয়া দেশে তুমি না আসিহ আর।'

এই সকল স্থলে কবির কাব্য আতিশয্য-দুষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে এতটা যথাযথতা সেকালের কোন কাব্যেই নাই। নিজের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে কবি অদ্ভুত রকমের বাস্তবনিষ্ঠ।

হিন্দু মধ্যবিত্ত-সংসারের জাতকর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অনুষ্ঠানটির যথাযথ বর্ণনা এই কাব্যে আছে। ইহা ছাড়া, ঐ শ্রেণীর গৃহস্থদের খাওয়া-শোওয়া বেশভূষা ইত্যাদির খুঁটিনাটি বর্ণনা সৎকাব্যের পক্ষে অশোভন হইলেও কবি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত এই সববর্ণনা করিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিলেন মনে করিয়াছেন।

অতি তুচ্ছ ব্যাপারও কবির চোখ এড়ায় নাই। লহনা আদর করিয়া খুল্লনাকে মাছের মুড়া রাঁধিয়া দিল—অন্যমনস্ক খুল্লনার পাতা হইতে বিড়ালে মুড়াটা লইয়া পলাইল—দুর্ব্বলা পিছু পিছু ছুটিল। ধনপতি-খুল্লনার সম্ভোগশয্যা প্রস্তুত করিয়া দুর্ব্বলার দুর্ব্বলতা।—

শয্যা বিছায় দাসী ধরিতে না পারে হাসি, বার চারি গড়াগড়ি যায়।

কথাটা সামান্য বটে, কিন্তু ইহাতে যথেষ্ট রসব্যঞ্জনা আছে। ১

চণ্ডীমঙ্গল-বিশ্লেষণ

কবি গ্রন্থারম্ভে পৃথক পৃথক্ কবিতা রচনা করিয়া দেবদেবী, মুনি ঋষি প্রাচীন কবিগণ, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সকলের বন্দনা করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের নাম কোথাও নাই। বিষহরীর বন্দনা আছে "তম্বলিপ্তে বিষহরী বন্দ বর্গভীমা।" "মণ্ডল গ্রামেতে বন্দ জয় বিষহরী।" এই বন্দনায় কবি মাণিক দত্তেকে গীতের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

"মাণিকদত্তেরে আমি করিনু বিনয়। যাহা হৈতে হৈল গীতপথপরিচয়।"

কবিকঙ্কণের ধনপতি চণ্ডীকে ডাকিনী দেবতা বলিয়াছেন। কবি ডাকিনী যোগিনীকে চণ্ডীর সহচরী মনে করেন। তিনি অপরাধক্ষালনের জন্য ভয়ে ডাকিনীযোগিনীকেও প্রণাম করিয়া বলিয়াছেন।

ডাকিনী যোগিনী মাতা মাগিয়ে প্রসাদ। চণ্ডীর মঙ্গল গাই, নাই অপরাধ।

কবি সূর্য্যবন্দনায় একটি সুন্দর উপমা দিয়াছেন—

ক্ষিতি পালনের তরে ফিরে প্রভু নিরন্তরে তৈলযন্ত্রে যেন বৃষবর।

চৈতন্যবন্দনায় বলিয়াছেন—

'কপটে সন্ন্যাসী বেশে ভ্রমিলা অনেক দেশে।' কবি বলিতে চাহিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য প্রকৃতপক্ষে সন্ন্যাসী নহেন, তিনি প্রেমের সাধক। তাঁহার সন্ন্যাসবেশ ধারণ করিবার কথা নয়—তিনি কেবল লোকশিক্ষার জন্য ওই বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথভ্রমণের আগে তিনি জটাচীর ধারণ করিয়াছিলেন—দক্ষিণাপথের লোকেরা মুণ্ডিতমস্তক বৈরাগীকে বৌদ্ধ শ্রমণ মনে করিবে বলিয়া।

কবি চারি পংক্তিতে চৈতন্যের পূর্ণরূপটি ফুটাইয়াছেন।

তপ্তকলধৌতগৌর ভুবনলোচনচৌরকরঙ্ক-কৌপীন-দণ্ডধারী।
কপটে লোচনলোর গলে শোভে নামডোর সতত বদনে হরিহরি।

শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান। তাঁহার ভক্তিঅশ্রুপাত করিবার কথা নয়। জীব উদ্ধারের জন্য তিনি ভক্তের অভিনয় করিয়া প্রেমাশ্রুপাত করিয়াছেন। সেজন্য কপটে লোচনলোর—কথাটার ব্যবহার।

কবি দারিদ্র্যের জন্য বড় দুঃখ পাইয়াছিলেন। লক্ষ্মীর বন্দনায় তাই বলিয়াছেন—

যদি দয়া নয়মা তোমার হেন জনে। বসিতে না জানে সে লোক বিদ্যমানে॥
কুলশীল রূপগুণ সুবুদ্ধি সুধীর। যাহার মন্দিরে লক্ষ্মী তুমি আছ স্থির॥
কমলা থাকিলে মান সকল ভুবনে। লক্ষ্মী বাম হইলে বিজয় নয় রণে॥

চণ্ডীর স্বপ্নাদেশচ্ছলে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এই আত্মপরিচয় টুকু বড় মুল্যবান। অন্যান্য বহু কবিই এইটুকুও রাখিয়া যান নাই। এই আত্মপরিচয়ে আমরা সেকালের রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক জীবনের কিছু পরিচয় পাই। এই বর্ণনায় অল্পপরিসরের মধ্যে অনেক দুঃখের কাহিনীই নিহিত আছে।

"তৈল বিনে করি স্নান করিয়া উদকপান শিশু কাঁদে ওদনের তরে।" এই একটি বাক্যেই চরম দুঃখের কথা বলা হইয়াছে। কবি নিজের এই বাস্তব দুঃখের কথা লইয়া একটি মর্ম্মস্পর্শী কাব্য লিখিতে পারিতেন। সরকারের অত্যাচারে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকন্যার হাত ধরিয়া চিরদিনের জন্য নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের ন্যায় চলিয়াছেন—ইহার চেয়ে করুণ কাহিনী আর কি হইতে পারে? চণ্ডীর মহিমাই তাঁহার বর্ণনীয়—নিজের কথা লইয়া সময়ক্ষেপের অবসর তাঁহার নাই। কবিকঙ্কণ গীতিকবিতার কবি নহেন—কাজেই আপন অন্তরের দুর্বিষহ বেদনার কথায় তিনি শুধু

উল্লেখমাত্র করিয়া গিয়াছেন। আরড়ার বাঁকুড়ারায়ের কাছে বিশ আড়া ধান পাইয়া তিনি বাঁচিয়া গেলেন। পরে তাঁহার পুত্রের শিক্ষাভার পাইয়া অন্নবস্ত্রের চিন্তা হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 'সুধন্য বাঁকুড়া রায়ের' উদ্দেশে আমরা প্রণাম করি। এই শিক্ষককবির কথায় বর্ত্তমানযুগের এই শিক্ষককবির মনে অনেক কথাই জাগে। যাক সে কথা।

কবি ধর্ম্মঠাকুরের বন্দনা গা'ন নাই বটে, কিন্তু বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়াই গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন—আদ্যদেব নিরঞ্জন হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও সৃষ্টি। ব্রহ্মার পুত্রগণের মধ্যে দক্ষই হইলেন প্রধান। ভৃগু দক্ষের মত আর এক পুত্র। ভৃগুর যজ্ঞে মহাদেব দক্ষকে প্রণাম করেন নাই। শিব দক্ষের জামাতা। জামাতা হইয়া শ্বশুরকে শিব প্রণাম করিলেন না। এজন্য দক্ষের রাগ ছিল। দক্ষ এক বিরাট যজ্ঞ করিয়া সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন—বাদ দিলেন শিবকে। বিনা নিমন্ত্রণেই গৌরী পিতৃযজ্ঞে আসিতে উদ্যত হইলেন। গৌরী একেবারে বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে হইয়া বায়না ধরিলেন—

চরণ ধরিয়া মাগি কৃপা কর কৃপানিধি যাব পঞ্চদিবসের তরে।
চিরদিন আছে আশ যাইতে বাপের বাস নিবেদন নাহি করি ডরে।
পর্ব্বতকন্দরে বসি নাহি পাশে সুপড়সী সীমন্তে সিন্দূর দিতে সখী।
একদিন তথা যাই জুড়াইতে নাই ঠাঁই বিধি মোরে কৈল জন্মদুখী॥
সুমঙ্গল সূত্র করে আইনু তোমার ঘরে পূর্ণ হৈল বৎসর ছয় সাত।
দূর কর অপরাধ পূরাহ আমার সাধ মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥

মায়ের হাতের রান্না ভাত খাইবার জন্য শিবের আদেশ না শুনিয়া বাঙ্গালী গৌরী পিতৃগৃহে আসিলেন। ভারতচন্দ্রের গৌরীর মত দশমহাবিদ্যারূপ দেখাইয়া শিবকে আদেশ দিতে বাধ্য করিলেন

না। শিবের নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয়া গৌরী যেন বাপের সঙ্গে কলহ করিতেই আসিয়াছিলেন। পিতাপুত্রীতে কলহ হইল—তাহাতে দক্ষ শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন, ভারতচন্দ্রের দক্ষের মত ব্যাজস্তুতি করিলেন না। গৌরী শিবনিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহত্যাগ করিলেন। তারপর দক্ষযজ্ঞনাশ। দক্ষযজ্ঞনাশের বর্ণনায় ছন্দেরও সর্ব্বনাশ হইয়াছে—ভারতচন্দ্রের মত ছন্দের চাতুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এখানে একটুও নাই।

শিব মহাসমাধিতে মগ্ন হইলেন। গৌরী হিমালয়গৃহে জন্মিয়া ক্রমে যৌবনপ্রাপ্ত হইলেন—শিবের সমাধি ভঙ্গ হইল না।

কন্দর্পের সহায়তায় ইন্দ্র শিবের সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, কন্দর্প ভস্মীভূত হইল। রতি বিলাপ করিতে লাগিল। এই রতিবিলাপ কবিতাই চণ্ডীমঙ্গলের প্রথম সরস রচনা। হরগৌরীর বিবাহ কবি সংক্ষেপেই সারিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই ব্যাপারে অনেক রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন মাত্র। যেমন—

ঈষরমূলের গন্ধে পশিল ভুজঙ্গ। অঙ্গনা-সমাজে শিব হইল উলঙ্গ। মেনকার খেদ, নারীগণের পতিনিন্দা ইত্যাদিও আছে—কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত এগুলি ভাল জমে নাই।

কবি হিমালয়কে বাংলার আমবাগানের ছায়ায় আনিয়া ফেলিয়াছেন। শিব বিবাহের পর হইতে ঘরজামাই হইয়া আছেন। মেনকা যেন বাংলার রান্নাঘরের চালের বাতায় হাত রাখিয়া উমাকে বলিতেছেন—

"মিছে কাজে ঘুরে পতি নাহি চাষবাস। অন্নবস্ত্র কত যোগাইব বারমাস। আর তুমি নিজে—'দুগ্ধ উথলিলে কভু নাহি দাও পানি।' আমার রাঁধিতে রাঁধিতে কাঁকালে বাত ধরিল।"

অভিমানে উমা স্বামীকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন।

সেখানে অন্নাভাব। শিব ভিক্ষা করিয়া যাহা আনেন তাহাতে কুলায় না। সব দিন ভিক্ষা সমান মিলে না—কাজেই ধার হয়। 'উধার' শুধিতে অনেক দিনই উদরে টানাটানি পড়ে। এদিকে গণেশের মাতাকে ডাকিয়া শিব প্রকাণ্ড একটা চর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্য-পেয়ের তালিকা দিলেন—দ্বাদশ ব্যঞ্জন--তাহার সঙ্গে আরো কত কি? গৌরীর গা জলিয়া গেল। এমন ভোলা মহেশ্বর স্বামী লইয়া দুর্গার দুর্গতির অবধি নাই। সাধ আছে, সাধ্য নাই—সাধনা নাই। গৌরী বলিলেন—

"কালিকার ভিক্ষানাথ উধার সুধিল। যেবা অবশেষ ছিল রন্ধন রাঁন্ধিল।
আছিল ভিক্ষার বাকী পালিদশধান। গণেশের মূষা তাহা কৈল জলপান॥
আজিকার মত যদি বাঁধা দাও শূল।
তবেত আনিতে পারি কিঞ্চিৎ তণ্ডুল।

শিবের ক্রোধ হইল—রাগ করিয়া ষাঁড়ে চড়িয়া তিনি চলিয়া গেলেন। উমা এদিকে বাপের বাড়ী আসিবার উদ্যোগ করিলেন। পদ্মাবতী উপদেশ দিলেন—বাপের ঘরে ফিরিয়া গিয়া কাজ নাই। পৃথিবীতে পূজা প্রচার কর, অন্নবস্ত্রের দুঃখ থাকিবে না। চণ্ডীমঙ্গলে পদ্মাবতীই মনসামঙ্গলের নেতার কাজ করিয়াছেন।

গৌরী প্রথমে কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দিয়া পূজার যোগাড় করিলেন। তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের অবচিত ফুলের মধ্যে কাঠপিঁপড়া হইয়া ঢুকিলেন। ইন্দ্র সেই ফুলে শিবের পূজা করিলেন। পিপীলিকার দংশনে বিরক্ত হইয়া শিব নীলাম্বরকে মর্ত্ত্যে ব্যাধের ঘরে জন্মগ্রহণের জন্য অভিশাপ দিলেন। তাহার ফলে ধর্ম্মকেতুর ঘরে নিদয়ার গর্ভে কালকেতুরূপে নীলাম্বরের জন্ম। বলা বাহুল্য, নীলাম্বরের পত্নী ছায়া ফুল্লরা হইয়া জন্মিল।

কালকেতুর গর্ভবাস, নিদয়ার অরুচি, সাধভক্ষণ, কালকেতুর

সূতিকা-গৃহবাস ইত্যাদি মামুলী বর্ণনার পর কালকেতুর বাল্যখেলার একটি বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা আছে। কালকেতুর গায়ের রঙ কালো, তাহার দেহ কালো পাথর 'কুঁদে যেন নিরমাণ', শালের কোঁড়ার মত তাহার দেহে তারুণ্যের উন্মেষ। সে তাড়িয়া শজারু ধরে, বাঘ-নখ, জালের কাঁঠি, লোহার শিকল, স্ফটিককুণ্ডল ও বাঁটুল অঙ্গের ভূষণ।

কালকেতু অনার্য্য ব্যাধ, কিন্তু তাহার বিবাহটা আর্য্যজাতির উচ্চ সম্প্রদায়ের পদ্ধতিতেই সম্পাদিত হইল। ব্রাহ্মণপুরোহিতেরও অভাব হইল না। ধর্ম্মকেতু বৃদ্ধ বয়সে পত্নীর সঙ্গে কাশীবাস করিতেও চলিয়া গেল। কালকেতুর মৃগয়ায় জান্তব পণ্যের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।

সে গণ্ডার মারিয়া তাহার খড়্গ তর্পণের জন্য ব্রাহ্মণদের বিক্রয় করে, ঢালের কারিগরকে চামড়া বিক্রয় করে। হাতী মারিয়া তাহার দাঁত, ব্যাঘ্র মারিয়া তাহার নখ ও ছাল, চমরী মারিয়া তাহার লোমশ লেজ, বরাহ ও ভল্লুক মারিয়া তাহার লোম বিক্রয় করে, সে মহিষ শিকার করিয়া শিঙাদারকে শিং, শৃগাল মারিয়া বৈদ্যগণকে শিবাঘৃতের জন্য মৃতদেহ বিক্রয় করে। শরভ, নকুল ও কপি ধরিয়া বিক্রয় করে—লোকের সখের জন্য। সব চেয়ে তাহার বেশী লাভ হয়—কস্তুরীমৃগ মারিতে পারিলে। সেকালেও মৃগমদের অনেক দাম ছিল। তাহা ছাড়া, হরিণ, শশক, শজারু ইত্যাদির মাংস ত আছেই। কবি বাংলাদেশে কোন আরণ্য জীব-জন্তুর অভাব দেখেন নাই—এমন কি হিমালয়প্রদেশের কস্তুরী মৃগও কবির আহ্বানে বাংলার সমতলে নামিয়া আসিয়াছে।

কালকেতু নির্বিচারে পশু বধ করিতে লাগিল। তখন পশুগণ তাহাদের রাজার কাছে আবেদন জানাইল। তাহারা বলিল—

"পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারি বিপাকে ছাড়ি জীবন।"

কবি আত্মপরিচয়ে বলিয়াছেন—"ডিহিদার নাহি শোনে প্রজার গোহারি।' সম্ভবতঃ ডিহিদারের অত্যাচারের কথা এই বর্ণনায় কবির মনে পড়িয়াছিল।

পশুগণ চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। চণ্ডী তাহাদের আশ্বস্ত করিলেন। চণ্ডিকার কৃপায় পশুরা নিরাপদ হইল। চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার রূপ ধরিয়া কালকেতুর হাতে ধরা দিলেন। এইখানেই কালকেতুর ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত।

কালকেতু শুধু হাতে ফিরিয়া আসিল, ধনুর্গুণে স্বর্ণগোধিকা বাঁধিয়া। ফুল্লরার শিরে বজ্রাঘাত হইল। কালকেতুও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। ঘরে একটি দিনেরও সঞ্চয় নাই। কালকেতুর গৃহে দারুণ দারিদ্র্যের কারণ তাহার ভোজনের আতিশয্যে। একা সে দশজনের খাদ্য ভোজন করে।

স্বর্ণগোধিকা ব্যাধের গৃহে নিজ রূপ ধরিলেন। চণ্ডী ফুল্লরার কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন—

বন্দ্যবংশে স্বামী মোর বাপারা ঘোষাল। সাতসতাগৃহে বাস বিষম জঞ্জাল।

ইহারই বিবর্দ্ধিত ও সুপরিচ্ছন্ন বিবৃতি ভারতচন্দ্রের অন্নদার আত্মপরিচয় গাঙ্গিনীর পাটনীর কাছে। ফুল্লরা কিন্তু চণ্ডীর যে রূপ বর্ণনা করিলেন—তাহা বিদুষী নারীর মুখেব উপযোগী।

জিনি মৃগরাজ ক্ষীণ তোর মাঝ হেলয় মলয় বায়।
ও রূপ মাধুরী তোর কুচগিরি ভারভরে পীড়ে তায়।

রূপবর্ণনার পরই কবি বাস্তবতার সমতলে নামিয়া আসিয়াছেন। ফুল্লরা বলিতেছেন—

কিবা পতিদোষ কেন কৈলা রোষ সত্য কহ মোরে বাণী।
'বিরহের জ্বরে পতি যদি মরে কোন ঘাটে খাবে পানি।

চণ্ডী আবার শ্লেষে আত্মপরিচয় দিলেন—

আমি বড় কর্ম্মদোষী বসি গুপ্ত বারাণসী স্বামী মোর জনমভিখারী।
কত দুঃখ কব আমি পাষাণ হৃদযে স্বামী পাঁচ মুখে মোরে দেয় গালি।
তাহে সতীনের জ্বালা কতেক সহিব বালা পরিতাপে হৈয়া গেনু কালী।
কতেক রাজার ধন অঙ্গে মোর আভরণ ভুবন কিনিতে পারি ধনে।
সম্পদ বিস্তর দিব ভকতি কেবল ল'ব শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে।

ইহাতেও মূঢ়া ব্যাধবধূ বুঝিতে পারিল না। জনমভিখারী স্বামী অথচ অঙ্গে সাতরাজার ধন। ফুল্লরার বুঝা উচিত ছিল—কিন্তু এখানে কবি অতিরিক্ত বাস্তবনিষ্ঠ। ফুল্লরার মনে অন্যবিধ ভয় জন্মিল। কারণ, চণ্ডী ফুল্লরাকে ভয় দেখানোর জন্যই যেন বলিলেন—

যে ঘরে সতিনী রয় কামানলে প্রাণ দয় যেমন লাগয়ে বিসজ্বালা।
বিধি মোরে হৈলা বাম না মানিনু পরিণাম বনবাসী হইনু একেলা।
এবে বিধি হৈল সখা বীরসঙ্গে পথে দেখা সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুনগো ব্যাধের ঝি তোমারে বুঝাব কি এবে আমি যাব কোথাকারে।

রসিকতাটা জগজ্জননীর উপযুক্ত হয় নাই, ফুল্লরার ভয় হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

বুঝি ফুল্লরার মতি কহিলেন ভগবতী আমি না ছাড়িব মহাবীরে।

একথা মিথ্যা নয়—কালকেতু চণ্ডীর কৃপা হইতে আর বঞ্চিত হইবে না; 'ঠেকিয়া বিষম পাকে ফুল্লরা চণ্ডিকাকে বুঝাইয়া' বলিল—

কুলবতী যেই হয় রোষ করি ঘরে রয় অভিমানে থাকে উপোষিত।
বন্ধুজন আসি ঘরে উচিত বিচার করে স্বামী হয় আপনি তর্জ্জিত।

কবি এখানে পুরাণ হইতে বহু সতীর কথা উল্লেখ করিয়া ফুল্লরার মুখে বসাইয়াছেন। ফুল্লরার এত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত জানিবার কথা

নয়। কবি ইহা উপলব্ধি করিয়া ফুল্লরাকে দিয়া গোড়াতেই বলাইয়াছেন—

পণ্ডিতের মুখে যত শুনেছি পুরাণমত ইতিহাসে কর অবগতি।

চণ্ডী বলিলেন—আমি নিজে আসি নাই—'আনিলা তোমার স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।' কিন্তু গুণের দুটি অর্থ, ইহা না বুঝিয়া 'দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী।' চণ্ডী বলিয়াছেন—কালকেতুর গৃহে তিনি থাকিবেন—ফুল্লরা এ গৃহের দুঃখ যে কত তাহার একটা বিস্তৃত বিবরণ দিলেন—শুনিয়াও যদি চণ্ডী নিবৃত্ত হন! এই দুঃখকাহিনীই ফুল্লরার বারমাস্যা। এই দুঃখকাহিনী বাংলার অধিকাংশ দুঃখিনী নারীর।

শিরে দিতে নাহি আঁটে অঙ্গের বসন। মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাই শাক। মাটিয়া পাথর বিনে নাহিক সম্বল—এ সকল কথা বাংলার চিরদিনের কথা। ফুল্লরার নিজস্ব দুঃখ ইহাতে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে—

বৈশাখে সকলে নিরামিষ খায়—মাংস বিকায় না। চিলের চঞ্চু হইতে মাংসের পশারা রক্ষা করা বড়ই কঠিন। মাংসের বদলে যাহা ক্ষুদ পাওয়া যায়—তাহাতে উদরপূরণ হয় না। বর্ষায় ভেরেণ্ডার থামায় ঘেরা তালপাতায় ছাওয়া ভাঙ্গা কুঁড়েয় দুর্দ্দশার অবধি থাকে না—মেজেয় জল আসে। আশ্বিন মাসে ঘরে ঘরে দুর্গোৎসব হয়—মাংস বিকায় না। সকলে দেবীর প্রসাদ খায়। পূজার সময় অবস্থাপন্ন লোকেরা নূতন কাপড়চোপড় পায়—অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছাল। কার্ত্তিকমাসে লোকে নিরামিষ খায়—মাংস বিকায় না। মাঘমাসে কুয়াসায় হরিণ লুকায়—শিকার মেলে না—বনে পুকুরে শাক পর্য্যন্ত থাকে না। শীতে দুঃখের অবধি নাই—গায়ে শীত বস্ত্র জোটে না—'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।'

ফুল্লরার আমানি খাওয়ার জন্য একটা পাথরবাটিও জুটেনা—

কুঁড়ের মেজেয় একটা গর্ত্ত করা আছে—সেই গর্ত্তের উপর কলাপাতা বা পদ্মপাতা পাতিলে গর্ত্তটি জাম বাটির কাজ করে। এ সব যেন কবির নিজের চোখে দেখা। কবি নিজের গ্রামের মেছো মেছুনীদের দেখিয়াছেন। তাহাদের সাংসারিক জীবনই ব্যাধ ও ব্যাধবধূদের মারফতে ফুটিয়াছে। চণ্ডী কিছুতেই কুটীর ত্যাগ করিতেছেন না দেখিয়া ফুল্লরা স্বামীকে ডাকিয়া আনিল। ফুল্লরা স্বামীকে তর্জ্জন করিয়া বলিল—ত্রৈলোক্যমোহিনী কন্যা আনিয়াছ কার। কালকেতু ব্যাধোচিত ভাষায় কর্কশ কণ্ঠে উত্তর দিল—

"ব্যক্ত করি কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চেয়ারে কাটিব তোর নাসা।" কালকেতু গৃহে আসিয়া দেখে পূর্ণিমাচন্দ্রে আকাশ মণ্ডলের মত ভাঙ্গা কুঁড়িয়াখানা ঝল্‌মল্ করে। কালকেতু বলিল—

অক্ষটী হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড় এই ঘর শ্মশানসমান।
কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী প্রবেশে উচিত হয় স্নান ॥

চণ্ডী কিছুতেই কুটীর ত্যাগ করিবেন না। শেষে কালকেতু ধনুকে শর যোজনা করিল—শর ও কর দুইই স্তম্ভিত হইয়া গেল। কালকেতু বুঝিল—ইহা দেবতার মায়া। তখন তাহার—

'পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর।"

কালকেতুর নিকট দেবী আত্মপরিচয় দিলেন। কালকেতু তাঁহাতেও নিশ্চিন্ত হইল না। সে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি (অর্থাৎ দুর্গোৎসবে সুপরিচিত মূর্ত্তি) দেখিতে চহিল। দেবী সেই মূর্ত্তি দেখাইলেন। দেবী একটি অঙ্গুরী দিয়া বলিলেন—ইহার মূল্য সপ্তকোটি টাকা। 'ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ কৈল বাঁকা? সে ব্যাধের মেয়ে, কাটী কি জানে না—সে দেখিল—"একটি অঙ্গুরীতে হবেক কত

কাম। সারিতে পারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।" সে যাহাকে ধন বলিয়া মনে করে তাহাই অর্থাৎ সোনা দানা পাইতে চায়। চণ্ডী সাতঘড়া ধন দিলেন। কালকেতুকে এইভাবে উৎকোচ দিয়া চণ্ডী বলিলেন—তুমি গুজরাটে রাজা হইবে—নগরের মধ্যে মন্দির গড়িয়া ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দিয়া আমার পূজা কর। কালকেতু বলিল "আমি অস্পৃশ্য আমি উত্তম ব্রাহ্মণ পূজারী কোথায় পাইব ?" দেবী বলিলেন "ধনে নীচও উত্তম হয়। ধনী হইলে অস্পৃশ্য থাকিব না।"

কালকেতু অঙ্গুরী লইয়া মুরারি শীল পোদ্দারের কাছে বিক্রয় করিতে আনিল। কবিও স্বপ্নলোক হইতে বাস্তবতার সমতলে নামিয়া আসিলেন।

মুরারি শীল একটি রক্তমাংসে জীবন্ত চরিত্র, কাল্পনিক জীব নয়। কালকেতুর কাছে সে মাংস কিনিত, তাহার কাছে মাংসের দরুন দেড় বুড়ি ধারিত। কালকেতু সেই ধার শোধের দাবি করিতে আসিয়াছে ভাবিয়া লক্ষপতি বেণে অন্দরে লুকাইয়া থাকিয়া বেণেনীকে কালকেতুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। সে বলিল—

পোদ্দার বাড়ীতে নাই— আজি কালকেতু যাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন একভার হাল বাকি দিব ধার মিষ্ট কিছু আনিও বদর।

কালকেতু বলিল—"ধারের জন্য আসি নাই—একটি অঙ্গুরী আনিয়াছি। পোদ্দার যখন নাই—তখন অন্যত্র যাই"।

'পাইয়া ধনের বাস আসিতে বীরের পাশ ধায় বাণ্যা খিড়কির পথে।' খিড়কির পথ দিয়া বাহির হইয়া সদর পথে ফিরিয়া আসিয়া সে কালকেতুকে বলিল— 'আরে এস এস ভাইপো, আজকাল তোকে দেখিনে কেন ?"—মুরারি কালকেতুর অঙ্গুরী লইয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে লাগিল। মুরারি শীল বলিল—

ইহার মূল্য ৮পণ পাঁচ গণ্ডা কড়ি। কিছু চাউল ক্ষুদ লও, কিছু কড়ি লও। "আমা সঙ্গে সওদা কৈলে না পাবে কপট।"

কালকেতু বলিল—"না, আমি অন্য পোদ্দারের কাছে যাইব। ইহার উচিত মূল্য অনেক বেশি।" কিন্তু মনে মনে সে ভাবিতে লাগিল—"সত্য কি অঙ্গুরীর সোনা মেকি? আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম! তবে অঙ্গুরীসমান মিথ্যা সাতঘড়া ধন?" এই সমস্ত বর্ণনা বাস্তব-নিষ্ঠতার জন্য অপূর্ব্ব—উচ্চাঙ্গের রসসাহিত্য। এই পর্য্যন্ত কবি বাস্তবতার সমতলে ছিলেন। তাহার পরই উপরের দিকে ডাক পড়িল। সহসা আকাশবাণী হইল। চণ্ডী বলিলেন—"অকপটে সপ্তকোটি টাকা দাও বীরে। বাড়িবে তোমার ধন চণ্ডিকার বরে।" হায় সাতকোটি টাকার ভাগ্য! দরিদ্র কবির হাতে পড়িয়া তাহার দুর্গতির অবধি নাই। যে বেণে দেড় বুড়ি দেনা শোধ দিতে হইবে এই ভয়ে গণেশের বাহনের মত অন্দরের মধ্যে লুকায়, ধনেশের ভাণ্ডার তাহারই হাতে! তাহার সিন্দুকেই এই সাতকোটী টাকা! আর কালকেতু সেই টাকা ছালা ভরিয়া গরুর গাড়ীতে তুলিয়া গ্রামপথে ধূলা উড়াইয়া অনায়াসে কুটীরে লইয়া গেল!

কালকেতু কলিঙ্গদেশের বন কাটিয়া নব রাজ্য স্থাপন করিল। এ রাজ্যের নাম হইল গুজরাট। মঙ্গলকাব্যের পদ্ধতি অনুসারে এক্ষেত্রেও বিশাই ও কপিরাজ মশাই আসিলেন নূতন পুরীনির্ম্মাণে।

খাণ্ডবদাহনের পর ইন্দ্রপ্রস্থনির্ম্মাণের মত বন কাটাইয়া কালকেতু গুজরাটনগর পত্তন করিলেন। নবনির্ম্মিত নগরের বর্ণনায় নগরের রূপটি ফুটে নাই, কিন্তু এমন একটা ঘটা ও সমারোহ আছে—যে তাহাতে একটি অতিসমৃদ্ধ পুরীর আভাস পাওয়া যায়।

সারি সারি বিষ্ণুর সদন।
সুবর্ণ কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে গৃহশিরে শোভে সুদর্শন।

এই দুই চরণে একটি তীর্থপুরীর চিত্র ফুটিয়া উঠে।

পুরী ত নির্ম্মিত হইল—কিন্তু অধিবাসী কই ? কালকেতু কলিঙ্গদেশ হইতেই অধিবাসীদের লইয়া যাইতে চায়। চণ্ডীর শরণাগত হইলে চণ্ডী কলিঙ্গদেশে অতিবৃষ্টি ও বন্যা আনাইলেন। রাজা বিপন্ন—প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত ও নিরাশ্রয় হইল। তখন তাহাদের বাধ্য হইয়া কালকেতুর ইউটোপিয়ায় আসিয়া বাস করিতে হইল। লোক-সংগ্রহের অদ্ভুত ব্যবস্থা! চণ্ডীর করুণা এইরূপ প্রচণ্ডই বটে।

বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর আশ্বাসবাক্যে এই ইউটোপিয়ার আভাস পাওয়া যায়। কবি একদিন ডিহিদারের অত্যাচারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে প্রজার উপর বহুপ্রকারের অত্যাচার হইত। বিশেষতঃ প্রজার কাছ হইতে খাজনা আদায় বিষয়ে সেকালের তৌশিলদারদের কিছুমাত্র দয়াদাক্ষিণ্য ছিল না। যে আশ্বাস কবির দেশবাসী রাজার কাছ হইতে কোন দিন পায় নাই, কবি কালকেতুর মুখ দিয়া সেই আশ্বাস প্রজাদের দিয়াছেন।

'আমার নগরে বস যত হালে চাষ চষ তিন সন বই দিবে কর।
হালে হালে দিব তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা পাটায় নিশান মোর ধর॥
নাহিক বাউড়ি ডেড়ি রয়্যা বস্যা দিও কড়ি ডিহিদারি নাহি দিব দেশে।
যত বেচ চালু ধান তার নাহি লব দান অঙ্ক নাহি বাড়াব বিশেষে॥
যত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি লব কর চাষভূমি বাড়ি দিব ধান।
হৈয়া ব্রাহ্মণের দাস সবার পুরিব আশ জনে জনে করিব সম্মান॥"

এই আশ্বাস পাইয়া সর্ব্বাগ্রে পান লইল ভাঁড়ু দত্ত।

কবি ভাঁড়ুর পরিচয়দানচ্ছলে বলিয়াছেন—

ফোঁটাকাটা মহাদম্ভ ছিঁড়া ধুতি কোঁচা লম্ব শ্রবণে কলম খরশান।

এই এক পংক্তিতেই মহাপুরুষের মূর্ত্তিটি চমৎকার ফুটিয়াছে। ভাঁড়ুর দারিদ্র্য যত, কুলের দম্ভও তত। ভাঁড়ুর সংসার প্রকাণ্ড। তাহার দুই স্ত্রী, চারি শ্যালক, চারি পুত্র, ভগিনী, শাশুড়ী, ছয় কন্যা, ছয় জামাই, দশটি দাসী,—অতএব তাহার সাতখানি বাড়ী চাই। ভাঁড়ু তাই চায়—'ধান্য দিবে নাহি দিব বাড়ি (অর্থাৎ ধানের সুদ)। এজন্য—হাল গরু দিবে খুড়া দিবে হে বীচনপুড়া ভেনে খেতে ঢেঁকি কুলা দিবে।' কালকেতু এই কালসর্পকে দুধকলা দিয়া পুষিতে রাজী হইলেন।

ভাঁড়ুদত্ত বাংলার পল্লিবাসিগণের জীবন্ত প্রতিনিধি; এই ভাঁড়ু দত্তকে আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যেও দেখিতে পাই—নানা ভূমিকায়। ভাঁড়ুর বংশধররা এখনও বাংলার পল্লীতে পল্লীতে বাস করিতেছে। আজ তাহার বংশধরগণ খরশান কলমের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে মামলা সাজায় ও মিথ্যাসাক্ষ্যের খসড়া তৈরী করে। ভারতচন্দ্র ভাঁড়ু দত্তকে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই আমলহাড়ার ভাঁড়ুদত্তের পৌত্রী সোহাগীর সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের হরিহোড়ের চতুর্থ পক্ষের বিবাহ। ভাঁড়ুদত্ত নামকরণেও সার্থকতা আছে। ভণ্ড শব্দের অপভ্রংশ ভাঁড়, তাহাতে সংজ্ঞার্থে উ।

কালকেতুর পুরীতে প্রথমে আসিল মুসলমানগণ। সে কালে মুসলমানের রাজ্যে হিন্দুর দুঃখের অবধি ছিল না; কবি নিজেই ভুক্তভোগী। মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হিন্দুর রাজ্যে মুসলমান কত সুখে থাকিতে পারে তাহা দেখাইবার জন্যই যেন কবি সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমানদের দলে দলে আদর্শ হিন্দুরাজত্বে লইয়া আসিলেন। আর একটি কথা ইহা হইতে মনে হয়—এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বসতি স্থাপন ব্যাপারে মুসলমানরা

যত সত্বর অগ্রগামী হয় হিন্দু তত সত্বর হয় না। এই অংশে কবি প্রসঙ্গোচিত ভাষার ব্যবহার করিয়া লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন—এই অংশের অধিকাংশ শব্দই আরবী ফারসী।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির লোকের উপনিবেশ হইল। এই জাতিপরিচয় প্রসঙ্গটি খুবই সরস। স্থানাভাবে উৎকলন করা হইল না। পাঠক যেন মূল পুস্তকে পড়িয়া দেখেন, আমোদ পাইবেন।

ভাঁড়ুদত্তের কাহিনী কালকেতুর রাজত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। কালকেতু চণ্ডীর কৃপায় ধনী হইয়াছিল, কিন্তু সরস্বতীর কৃপা সে পায় নাই। পক্ষান্তরে, ভাঁড়ুর কাণে খরশান কলম। কাজেই কালকেতুকে ভুলাইয়া ভাড়ুর কর্ত্তৃত্ব লওয়া সোজা। নিঃস্ব অকিঞ্চন ভাঁড়ুদত্ত ধনেশ্বর কালকেতুকে একেবারে ভয় করে না। নিম্নজাতির কোন লোক, যে চোখের সম্মুখে অতি হীন উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিত, সে যদি কোন কারণে সহসা ধনী হইয়া উঠে, তবে সহজে উচ্চজাতির লোকেরা তাহাকে মানিতে চায় না। আবার নীচজাতির লোক ধনেশ্বর হইয়া সহসা উচ্চ জাতির লোকের প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে পারে না, স্বভাবতঃ তাহার একটি সঙ্কোচ আসে।

এই সুযোগে ভাঁড়ু গাঁয়ে-মানেনা-আপনি-মোড়ল হইয়া উঠিল। হাটের মধ্যে গিয়া সে উপদ্রব আরম্ভ করিল, পশারী পশারা ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে। শুধু তাহাই নয়—

পশরা লুটিয়া ভাঁড়ু পুরয়ে চুবড়ি।
যত দ্রব্য লয় ভাড়ু নাহি দেয় কড়ি।
লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালাশালা।
আমি মহামণ্ডল আগে মোর তোলা।

শুধু হাটে নয়—ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যেক প্রজার বাড়ীতেও উপদ্রব

করিতে লাগিল। তাহার পুত্র পুরনারীগণেরও মর্য্যাদাহানি করিতে লাগিল। প্রজারা কালকেতুর কাছে গোহারি জানাইল। কালকেতু ভাঁড়ুকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিল। ভাঁড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়া বুঝাইল,—"তোমার রাজ্যের প্রান্তবর্ত্তী বন কাটাইয়া কালকেতু নূতন নগর গড়িয়াছে, অথচ সে তোমাকে মানে না—তোমাকে রাজস্ব দেয় না।" ইহাতে কলিঙ্গরাজের কোপ জন্মিল। সে সসৈন্যে গুজরাট আক্রমণ করিল। যুদ্ধে পরাস্ত না হইয়াই ফুল্লরার উপদেশে বিজয়ী কালকেতু ধান্যঘরে লুকাইয়া রহিল। ভাঁড়ুদত্ত সন্ধির নাম করিয়া গিয়া কালকেতুকে গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া আনিয়া ধরাইয়া দিল। প্রতিপালকের সর্ব্বনাশ করাই বাঙলার ভাঁড়ুদত্তদের চিরন্তন ধর্ম্ম। যুগে যুগে তাহারা এই কাজই করিতেছে।

কবিকঙ্কণের অঙ্কিত চরিত্রগুলির মধ্যে ভাঁড়ুদত্তই সবচেয়ে রক্তমাংসে জীবন্ত। আমরা এই ভাঁড়ুদত্তকে আমাদের সমাজে বার বারই দেখিতে পাই—কিন্তু আমরা ততটা লক্ষ্য করি না। কাব্যের ভিতর দিয়া কৌতুকরসের পরিবেষের মধ্যে সে যে রূপ লাভ করিয়াছে—তাহাতে সে শুধু জীবন্ত মূর্ত্তিতে নয়, রসের মূর্ত্তিতেও আমাদের চির-পরিচিত হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্তের যে বর্ণনা আছে, সে বর্ণনায় মানুষের চরিত্রের যে একটা বড় দিক দেখানো হইয়াছে তাহা নয়, এই রকম চতুর স্বার্থপর এবং গায়ে পড়িয়া মোড়লি করিতে মজবুত লোক আমরা অনেক দেখিয়াছি। তাহাদের সঙ্গ যে সুখকর, তাহাও বলিতে পারি না। তবু কবিকঙ্কণ এই ছাঁদের মানুষটাকে আমাদের কাছে যে মূর্ত্তিমান করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায়

এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত প্রত্যক্ষ সংসারে ঠিক এমন করিয়া আমাদের গোচর হইত না। আমাদের মনের কাছে সুসহ করিবার পক্ষে ভাঁড়ুদত্তের যতটুকু আবশ্যক কবি তাহার চেয়ে বেশী কিছুই দেন নাই। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংসারের ভাঁড়ুদত্ত ঠিক ঐটুকু মাত্র নয়—এই জন্যই সে আমাদের কাছে অমন করিয়া গোচর হইবার অবকাশ পায় না। কোন একটা সমগ্র ভাবে সে আমাদের কাছে গোচর হয় না বলিয়াই আমরা তাহাতে আনন্দ পাই না। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত অনাবশ্যক বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে।

সৌন্দর্য্য ও সাহিত্য)।

কলিঙ্গরাজ যুদ্ধ করিতে আসিল. চারিদিক হইতে নগরটিকে বেষ্টন করিল। কালকেতু চারি দুয়ারেই যুদ্ধে জিতিল! তবু তাহার এ দুর্গতি কেন? ফুল্লরা বলিল—

প্রভু, শুনহ আমার উপদেশ,

হারিয়া যে জন যায় পুনরপি যুদ্ধ চায় হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ।

শেষ পর্য্যন্ত তুমি রাজার সঙ্গে পারিবে না নরুন দিয়া কি তালগাছ কাটা যায়?

প্রলয়ঙ্করী স্ত্রীবুদ্ধিতে কালকেতুর শৌর্য্যবীর্য্য ভাসিয়া গেল। সে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া ধান্যঘরে লুকাইল। কালকেতুর মত বীরচরিত্রের পক্ষে নারীর কথায় এরূপ কাপুরুষতার আশ্রয় যে অস্বাভাবিক একথা দীনেশ-বাবু বলিয়াছেন। কালকেতু বীর বটে, কিন্তু সে মূর্খ, নির্ব্বোধ ব্যাধ! সে ঋদ্ধি পাইয়াছিল—শুদ্ধিও লাভ করিয়াছিল; কিন্তু বুদ্ধি ত

পায় নাই। বলবিক্রমের সঙ্গে প্রখর বুদ্ধির সংযোগ না থাকিলে এইরূপ অসঙ্গত ব্যাপার ঘটিতেও পারে।

যাহাই হউক, কাব্যের প্রয়োজনেই কবিকঙ্কণ কালকেতুর এ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছেন। নায়কের কারাগারে অবরোধ অথবা মশানে মৃত্যুদণ্ড এই শ্রেণীর কাব্যের একটা প্রচলিত পদ্ধতি। দেবতাকে চৌতিশাস্তব শুনাইতে হইবে এবং দেবতা কারাগারে বা মশানে আবির্ভূত হইয়া ভক্তকে রক্ষা করিবেন—এ কথা ভুলিলে চলিবে না। ইহা না হইলে মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, একটা যুদ্ধের বর্ণনা চাই। নায়কের জীবনকে একেবারে নিরুপদ্রব (smooth sailing) করিলে, একেবারে জীবনে কোন অনর্থ বা বিপৎপাত না ঘটাইলে কাব্যের বৈচিত্র্যও ঘটে না—অনেক বিষয়ই অবর্ণিত থাকিয়া যায়। সেজন্য কালকেতুর এই দুর্দ্দশা দেখাইতে হইয়াছে।

চণ্ডীর পক্ষ হইতেও একটা কৈফিয়ৎ চাই। কালকেতু তিনটি শরকে সম্বল করিয়া ফুল্লরার সঙ্গে বেশ সুখের জীবন যাপন করিতেছিল। চণ্ডী নিজের প্রয়োজনেই প্রভূত ধন দিয়া তাহাকে বিপন্ন করিলেন। তাহাকে রাজা করিলেন--কিন্তু তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিলেন না কেন? চণ্ডী ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

শুন পুত্র কালকেতু পশুগণবধহেতু আছিল তোমার গুরুপাপ।
নাশ গেলা এতকালে রাজার বন্ধনশালে মনে না গণিবে পরিতাপ।

অন্যান্য কাব্যের যুদ্ধবর্ণনার সহিত তুলনা করিলে এই কাব্যের যুদ্ধবর্ণনায় কতকটা বাস্তবতা আছে। হবিবুল্লা, শেখ সাদুল্লা ইত্যাদি সেনাপতির কথা আছে। কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে। তালফল সম গোলা পূরিল অন্তরে।—এ যুদ্ধ ডাকিনীযোগিনীর যুদ্ধ নয়। গোলাগুলি লইয়া রীতিমত জীবন্ত মানুষের যুদ্ধ।

কলিঙ্গরাজের বাহিনীর বর্ণনায় আছে—

আশিগণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন কাঁটি।
পরিধান বীরধড়ি কাণে ফটিকের খড়ি
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙা মাটি।

এ বর্ণনা যেন ঐতিহাসিক দিক হইতেও যথাযথ। ঢোল অবশ্য মাদল এবং কোল বলিতে ছোটনাগপুর সম্বলপুর অঞ্চলের অনার্য্যদের বুঝাইতেছে। এদিকে কালকেতুর পক্ষে—

ধাইল যতেক রাঢ় যোড়ে যোড়ে বিঁধে কাঁড় বাঁশে-বাঁধা হাড়িয়া-চামর।
রণমাঝে দেয় হানা বাহুমূলে বান্ধে বাণা দেখি পা'ক রণে অকাতর।

ইহাতেও পৌরাণিক আতিশয্য বা অবাস্তবতা নাই।

কোপেতে উমর গাজী চাপিয়া আইলা তাজী বীরে বাণ মারয়ে যখন।
রণে মহাবীর তারে তুরঙ্গী সহিত মারে ভাগে কোটালের সেনাগণ।

কলিঙ্গরাজের মুসলমানসেনাপতি কালকেতুর হাতে প্রাণ হারাইল—ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু কলিঙ্গদেশে মুসলমান সৈন্যত থাকিবার কথা নয়।

কালকেতু পত্নীর কথায় ধান্যঘরে লুকাইয়া ছিল বটে, কিন্তু সে কাপুরুষ নয়। কালকেতুকে বন্দিদশায় আনাইবার জন্যই যেন কবি একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন মাত্র। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণপণ্ডিত কবি—অন্য কোন কৌশল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই—তাঁহার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। কালকেতুর পক্ষে স্বাভাবিক হয় নাই।

এই কালকেতুকে যখন কোটাল ধরিতে আসিল—তখন সে একাই অনেকের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিল এবং যে সম্মুখীন হইল বীরের মুটকির ঘায়ে ঘায়েল হইতে লাগিল। শেষ পর্য্যন্ত বীর ধরা

পড়িল। তার পার কলিঙ্গরাজের কাছে গিয়া সে মুক্তির জন্য কাকুতি মিনতি করিল না—'রাজার তর্জ্জনে ব্যাধ নাহি করে ভয়।' কলিঙ্গরাজ বলিল—'অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে।' কালকেতু বলিল—'তোমার তর্জ্জনে কালকেতু না ডরায়। অবধান কর রায় করি নিবেদন। জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।'

ফুল্লরা সাধারণ ব্যাধপত্নী মাত্র—সে বীরাঙ্গনা নয়, কাজেই সে বলিল—

না মার না মার বীরে নির্দ্দয়া কোটাল।
গলার ছিণ্ডিয়া দিব সতেশ্বরা মাল॥
ঘোড়াশালে ঘোড়া লহ হাতীশালে হাতী।
লও বীরের যত আছে তুরঙ্গপদাতি॥
রত্নের কুণ্ডল লহ রত্নময় হার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার॥
পিতা হৈয়া দোঁহাকার রাখি যাহ প্রাণ।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ॥
কারু নাহি লই রাজা ধারি একপণ।
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লউক যত ধন॥
নিশ্চয় বধিবে যদি বীরের পরাণ।
এক অসিঘাতে আগে ফুল্লরারে হান॥

কোটাল অমানুষ নয়, ফুল্লরার দুঃখ সে বুঝিল—তাহার কর্ত্তব্যের কথাও তুলিল—কিন্তু রাজা যে অন্যায় করিতেছেন সে কথাও উল্লেখ করিয়া বলিল—

পরের অধীন আমি নহি স্বতন্তর। লঘু দোষে রাজা দণ্ডে তব প্রাণেশ্বর। কহিল তোমার ঠাঁই স্বরূপ বচন। রাখিব রাজারে বলি বীরের জীবন।

চণ্ডীর কৃপায় কালকেতু মুক্তি পাইল। চণ্ডী কেবল ধন দিয়া

নয়—বিপাকে ফেলিয়া শেষে প্রাণ দান করিয়া কালকেতুকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন—তিনিই একমাত্র উপাস্যা। তারপর কালকেতু আদর্শ রাজা হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিল এবং চণ্ডীর পূজাপ্রচার করিল। বাংলার নীচজাতির মধ্যে চণ্ডীর পূজাপ্রচার হইয়া গেল—এইবার উচ্চতর জাতির মধ্যে তাঁহার পূজাপ্রচারের ইচ্ছা হইল। কোন ধর্ম্মমত বা পূজাবিধি কোন সমাজে প্রচার করিতে হইলে আগে সেই সমাজের নারীগণকে আয়ত্ত করিতে হয়।

স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে দেবী কৈল মতি।
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা রূপবতী।

যে চণ্ডীর পূজা নিম্নজাতির মধ্যেই বহুদিন পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল—সে চণ্ডী মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর চণ্ডী নহেন। গঙ্গা এই চণ্ডীর সঙ্গে কোন্দলের সময় বলিয়াছেন—"নীচ পশু নাহি ছাড় বরা।"

কালকেতুর সম্প্রদায়ের লোকেরা বরাহ বলিদান করিয়া চণ্ডীর পূজা করিত। এই চণ্ডী যখন সুরথ রাজার চণ্ডীর সহিত মিলিয়া গেলেন—তখন নিশ্চয় বরাহ বলি আর লইতেন না। ধনপতি চণ্ডী দেবী বলিতে এই বরাহ-খাদিকা ডাকিনী চণ্ডীই বুঝিতেন। চণ্ডী যে এদিকে বরাহ ত্যাগ করিয়া সিংহবাহিনী হইয়া উঠিয়াছেন—ধনপতি সে সন্ধানই রাখিতেন না।

তরুণ সাধু ধনপতি পায়রা উড়াইতেছিলেন। তাঁহার শ্যালিকা খুল্লনার পায়রা লুকানোর ছলে ধনপতি ও খুল্লনার প্রণয় সঞ্চারের কথাতেই চণ্ডীমঙ্গলের উত্তরাংশের সূত্রপাত। কাহিনীর প্রারম্ভটুকু বেশ কবিত্বময়—মৌলিকও বটে। সেকালের বিলাসী নাগরদের বিলাস লীলার সহিত ইহার বাস্তব সম্পর্কও আছে। ধনপতির প্রথমা পত্নীর নাম লহনা

লহনা খুল্লনা পরস্পর সপত্নী হইলেও বেশ মিলিয়া মিশিয়াই ঘরকন্না সুরু করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ব্বলা দাসীর তাহা অসহ্য হইল।

"যেই ঘরে দু'সতিনে না করে কোন্দল।
সে-ঘরে যে বসে চেড়ী সে বড় পাগল।
অনুক্ষণ দু সতিনে করয়ে কোন্দল।
তবে দাস দাসী পায় পরম মঙ্গল।"

রামায়ণের মন্থরার বংশে জাতা এই দুর্ব্বলা চরিত্রের সৃষ্টি ও তাহার মনস্তত্ত্বের অভিব্যক্তি সাহিত্যের দিক হইতে রসানুকূল। ধনপতি রাজার আদেশে দক্ষিণ দেশে বাণিজ্যযাত্রা করিল। তারপরই সুযোগ পাইয়া লহনা খুল্লনার লাঞ্ছনা আরম্ভ করিল।

বসন্তসমাগমে স্বামিবিরহে ব্যাকুলা হইয়া তরুলতা, ভ্রমর, শুক, সারী, কোকিল ইত্যাদির কাছে বিরহিণী বিড়ম্বিতা খুল্লনার আক্ষেপোক্তিগুলি বেশ কবিত্বময়। নিদর্শনস্বরূপ কোকিলের প্রতি নিবেদন উল্লেখযোগ্য। আসিয়া বসন্তকালে বলিয়া রসাল ইত্যাদি।

এখানে খুল্লনার বারোমাসের দুঃখবর্ণনাচ্ছলে কবি দরিদ্র বাঙ্গালী পল্লীবাসিনীদের চিরন্তন দুঃখেরই যথাযথ বর্ণনা দিয়াছেন। এখানে কল্পনাবিলাস নাই—বাস্তব সত্যকেই কবি রসরূপ দিয়াছেন।

মালাধরের অভিসম্পাতের কাহিনীটি কবিত্বময়। দেবসভায় মালাধর নৃত্য করিয়া দেবগণকে মোহিত করিলেন।

কনক প্রবাল হার আদি নানা অলঙ্কার প্রসাদ করেন দেবগণ।
নাচে তুষ্ট কৃত্তিবাসা দিল তারে কণ্ঠভূষা হাড় মালা বিভূতি ভূষণ।

নিঃস্ব নিঃসম্বল কৃত্তিবাস তাঁহার সর্ব্বস্ব মালাধরের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। সর্ব্বস্ব বলিলাম এইজন্য—কবি শিবের মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন—

'যতবার মৈল গৌরী সেই অস্থি জড় করি কণ্ঠে পরিলাম করি হার।'

অতএব ইহার চেয়ে বহুমুল্য ধন শিবের নাই। কবিত্বের কিন্তু এইখানেই শেষ; তারপর যাহা আছে—তাহাতে কাহিনীই পুষ্টি লাভ করিয়াছে—কিন্তু কবিতার দিক হইতে রসাভাব।

কবির কমলে কামিনীর রূপবর্ণনা যদিও পূর্ব্বতন সাহিত্যের অনুস্মৃতি, তবু সুরচিত।

রাজহংসেরে জিনি চরণে নূপুরধ্বনি দশ নখে দশ চাঁদ ভাসে।
কোকনদ দর্প হরে বেষ্টিত যাবক করে অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে।
অধর বিম্বক বন্ধু বদন শারদ ইন্দু কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা তনুরুচি ভুবনমোহন।
বদন ঈষৎ হাসে গগনমণ্ডল রসে দন্তপাতি বিজিত বিজলী।
বদন কমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে কত শত শত ধায় অলি।

ছড়াসাহিত্যে ঘুমপাড়ানীয়া গান আছে। কিন্তু কাব্য সাহিত্যের মধ্যে ঘুমপাড়ানীয়া গান আর কোথাও নাই চণ্ডীমঙ্গল ছাড়া। কবিকঙ্কণের ঘুমপাড়ানী গানটি বেশ রসমধুর। পদাবলী সাহিত্য ছাড়া অন্যত্র বাৎসল্যরসের এমন গীতি দেখা যায় না।

বৈষ্ণবসাহিত্যে বালক-শ্রীকৃষ্ণকে দুর্দ্দান্ত রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। সাহিত্যের দিক হইতে ইহাতে বাৎসল্য-রসের মাধুর্য্য বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাচীন বাংলার কবিগণ ইহা উপলব্ধি করিতেন। চণ্ডীমঙ্গলে বালক শ্রীমন্তের চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণের ও বৎসলা জননী খুল্লনাচরিত্রেও যশোদা-চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে। এই শ্রীমন্তকে অজ্ঞাত রহস্যময় রাজ্যে যাত্রার জন্য বিদায় দিতে হইয়াছে, তাহাতে খুল্লনা-চরিত্রে শচীমাতারও চরিত্রের ছায়াপাত হইয়াছে। শ্রীমন্ত রাগ করিয়া ঘরে লুকাইয়া আছে। খুল্লনা ব্যাকুল হইয়া নগরময়

খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। খুল্লনার এই ব্যাকুলতা কবিত্বের সঞ্চার করিয়াছে।

শ্রীমন্তকে খুঁজিয়া পাইয়া খুল্লনা বলিতেছে—

তোমা চাহি ভ্রমি দুখে কাঁটা খোঁচা পায় ভুঁকে আকুল করিয়া কেশপাশে।
সন্তাপে পোড়য়ে মন দাবানলে যেন বন দেখিয়া সকল লোকে হাসে।

এই লোকহাসানো ব্যাকুলতায় যে মাতৃহৃদয়টি ফুটিয়াছে তাহা চমৎকার। বাৎসল্যের যে ব্যাকুলতা লহনার চোখে বারবনিতার নির্লজ্জতা বলিয়া মনে হইয়াছে—(হিয়ার কাপড় অঙ্গে না দেয় আদুড় মাথায় কেশ নগরে চাতরে বুলে বারবনিতার বেশ।) —সে ব্যাকুলতা সাহিত্যরসের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে।

শ্রীমন্তের কাহিনীর প্রধানতঃ দুইটি ভাগ। একটি ভাগ বাস্তবরাজ্য—আর একটি ভাগ স্বপ্নরাজ্য। শ্রীমন্তের সিংহলযাত্রা হইতে স্বপ্নজগতের সূত্রপাত। শ্রীমন্ত চণ্ডীর পূজাপ্রচারের পরই যৌবনে স্বর্গারোহণ করে অর্থাৎ তাঁহার শাপমুক্তি হয়। মর্ত্ত্য ও স্বর্গের মধ্যে কবি এই স্বপ্নরাজ্যটিকে স্থান দিয়াছেন। স্বপ্নরাজ্যে যাত্রার আয়োজনটিও সত্য ও স্বপ্নের মিশ্রণে রচিত। ইহার স্বপ্নাংশে আসিয়াছেন বিশ্বকর্ম্মা ও হনুমান। যে সকল তরণী লইয়া শ্রীমন্ত স্বপ্নরাজ্যে যাত্রা করিল—সেগুলিও স্বপ্ন দিয়া তৈরী। হনুমান নিজের নখ দিয়া কাঠগুলি চিরিয়া দিতে লাগিল—আর রত্নের বাতি জ্বালিয়া মাণিকখচিত করিয়া বিশ্বকর্ম্মা ডিঙ্গা নির্ম্মাণ করিল। ইহাতে যে ডিঙ্গা তৈরী হইল তাহা স্বপ্ন পারাবারেই ভাসিতে পারে। বিশ্বকর্ম্মার রচিত ডিঙ্গায় চড়িয়া সমুদ্রে ভাসিলেই কমলে কামিনী, মশানে চণ্ডিকা, দেবনরের যুদ্ধ, সিংহলবিজয়, মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন, সমুদ্রমগ্ন ডিঙ্গাগুলির উদ্ধার ইত্যাদি সবই সম্ভব।

শ্রীমন্ত চণ্ডীর দাস, সে লাউসেনের মত বীর নয়। তাহার যখন প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল তখন সে শালবান রাজাকে বলিল—

হইয়া কিঙ্কর ঢুলাব চামর প্রাণ রাখ কৃপাময়।

ইহা যথার্থই হইয়াছে। শ্রীমন্ত মশানে যাইবার আগে তর্পণ করিতেছে।

লহ তর্পণের জল ধনপতি বাপ। তোমা না দেখিয়া চিত্তে না ঘুচিল তাপ।
তর্পণের জল লহ খুল্লনা জননী। সুখেতে থাকিবে গো তোমরা দুসাতনী।
লহ গুরুদেব এই তর্পণের জল। তোমারে লংঘিয়া মোর এই ফলাফল।
লহ তর্পণের জল শত সঙ্গী ভাই। জনমে জনমে যেন একত্র খেলাই।
লহ তর্পণের জল চেড়িগো দুর্ব্বলা। মোর মার বাক্য কভু না করিহ হেলা।

শুধু তাহাই নয়—শ্রীমন্ত কাণ্ডারকে বলিল—

দুর্ব্বলাকে কহিবে প্রণাম। তুই মায়ে নাহি হও বাম।

এই অংশে কারুণ্যের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমন্তের সুকুমার হৃদয়ের মাধুর্য্য চমৎকার ফুটিয়াছে।

ধনপতি-শ্রীমন্তের মিলনচিত্র বেশ কবিত্বমণ্ডিত। দ্বাদশ বৎসর কারাগারে বাস করিয়া ধনপতির মূর্ত্তি হইয়াছে বীভৎস।

লম্বমান দাড়ি আচ্ছাদিত নাভিদেশ। বিঘত প্রমাণ নখ জটাভার কেশ।
তৈলবিহনে তার গায়ে উড়ে খড়ি। সগল্লাদ আচ্ছাদন না ছাড়ে ধুকড়ি।

ধনপতি বহুকাল পরে শ্রীমন্তের সাধনায় মুক্তি পাইয়াছে। এখন তাহার আকিঞ্চন—

দেহ একখানি ধুতি পথের সম্বল। মহাদেব পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল।

সিংহলে শ্রীমন্তকে ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রলোভনবাণী কবি বারমাস্যা আকারে রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কবিত্ব বিশেষ না থাকিলেও মাধুর্য্য আছে। রাণী কন্যাবিদায়ের সময় আক্ষেপ করিতেছে—

সুশীলা করিয়া কোলে ভাসেন লোচনজলে পাটরাণী কান্দি উভরায়।
পদ্মিনী সমান ধন্যা কারে দান দিনু কন্যা কে তোমারে কোথা লয়ে যায়।
তোমার বিহনে মোর এ ঘর হইল ঘোর মোহেতে বিদরে মোর বুক।
পুষিয়া পালিয়া বালা কারে সাজ্যা দিলুঁ ডালা আর না দেখিব চাঁদমুখ।
আন্ধার ঘরের মণি যাবে মোর উজ্জাবনী আর না হইবে দরশন।
ক্ষিতিতলে ঢালি গা ললাটে হানয়ে ঘা কেশপাশ না করে বন্ধন।
সুশীলা এক কথায় ইহার জবাব দিয়াছে—

সুশীলা বলেন মাতা কান্দ্যা কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥

শ্রীমন্ত গৃহে ফিরিল—বধূবরকে দেখিবার জন্য পুরনারীগণের আকুলতা কবি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

গায়নে মঙ্গল গীত গায়।
আকুল কুন্তল বাস ছাড়িয়া স্বামীর পাশ উভ মুখে কুলবধূ ধায়।
এলাল্য কুন্তলভার না জানে পড়িল হাব একপদে আরোপি নূপুর।
কাহারো নূপুর হাতে বসন নাইক মাথে কোন ধনী আইসে কত দূর।
এক কর্ণে অবতংস আপন ভূষণ অংশ নাহি জানে কোন বামাগণ।
ধায় কোন শশিমুখী অঞ্জনিয়া এক আঁখি এক করে চঞ্চল বসন।
অবরোধে কোন নারী বাহির হইতে নারি গবাক্ষে করয়ে সচকিত।
গবাক্ষে আরোপি মুখ দেখিয়া পরম সুখ বরকন্যা রূপেতে বিদিত।

এই বর্ণনা কবিত্বময়—কিন্তু ইহাতে কবির মৌলিকতা নাই। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে পুরনারীদের বর ও বীর দর্শনের ব্যাকুলতার এই বর্ণনার প্রথা চলিয়া আসিতেছে

অনেক কথাই বলিতে বাকি রহিয়া গেল। কিন্তু এদিকে যে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

ধর্ম্ম মঙ্গল

রাঢ়দেশের গ্রামে গ্রামে অশ্বত্থবটের তলে যে সিন্দুর-লিপ্ত প্রস্তরগুলি গ্রামবাসীদের পূজা লাভ করিয়া আসিতেছে তাহারাই ধর্ম্মঠাকুরের শিলাময় রূপ। এই দেবতা বেদপুরাণের দেবতা নহেন—ইনি গ্রাম্য দেবতা। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসীরা এক-একটি প্রস্তরখণ্ডকে তাহাদের ভাগ্য-নিয়ন্তা দেবতায় পরিণত করিয়াছে। প্রত্যেক গ্রামের পৃথক পৃথক ধর্ম্মঠাকুর আছেন। ইনি আপন গ্রামের শুভাশুভ-বিধায়ক—গ্রামেশ্বর।

অসহায় গ্রামবাসীরা তাহাদের প্রার্থনা কোথায় নিবেদন করিবে—তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিজেরাই এই দেবতা খাড়া করিয়াছে। মৃতবৎসা এই দেবতার কাছে প্রার্থনা করে—"এইবার আমার সন্তান হইয়া যেন বাঁচে।" বন্ধ্যা তাহার কাছে সন্তান কামনা করে। চির-রোগীরা রোগমুক্তির জন্য মানসিক করে। যাহার চোখে ছানি পড়িয়াছে সে দৃষ্টিশক্তির জন্য প্রার্থনা করে। গ্রামে মহামারী আরম্ভ হইলে গ্রামবাসীরা রোগের উপদ্রবনিবারণের জন্য আবেদন জানায়। অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টির জন্যও তাহারা তাঁহার কৃপাদৃষ্টি চায়। এমনি বহুপ্রকারের আবেদননিবেদন জানাইবার জন্য এই দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছে।

এই দেবতা সাধারণতঃ আপন গ্রামেরই পূজা পাইয়া থাকেন। তবে কোন বিশিষ্ট মঙ্গল সাধনের জন্য যদি তাঁহার প্রতিষ্ঠা বাড়ে, তবে অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও নিজ গ্রামের দেবতা ছাড়িয়া তাঁহার কাছে মানত-মানসিক করিতে আসে। বৎসরের কোন-না-কোন সময়ে এই দেবতার উৎসবে মেলা বসে—তখন বহু গ্রাম হইতে ভক্ত জুটে।

বৎসর বৎসর এই দেবতার গাজন হয়—তখনও বহু গ্রামের ভক্তেরা আসিয়া সে গাজনে যোগ দেয়।

এই দেবতার পূজারী সাধারণতঃ নিম্ন জাতির লোকেরা। ইহার পূজার প্রথাও বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্মত নয়। এগুলি Fetish মাত্র, হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্মসঙ্গত কোন মূর্ত্তি নয়, শিল্পীর ছেদনী বা হৃদয়াবেগের সঙ্গে এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। মনে হয়—এই গ্রাম্য দেবতাগুলি ছিল অনার্য্য অথবা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের এবং ইহাদের নামও প্রথমে ধর্ম্মঠাকুর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের দেবতার নাম ছিল ভিন্ন ভিন্ন। মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাসলেখক শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলেন—'রাঢ়দেশ ছাড়া অন্যত্র ধর্ম্মরাজের পূজা নাই। সেজন্য বলা যাইতে পারে—এ দেবতা মূলতঃ বৌদ্ধ দেবতা নয়। রাঢ় দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদেরই গ্রাম্য দেবতা—রাঢ়দেশে বৌদ্ধপ্রভাব সঞ্চারের পর ঐ দেবতা ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন।'

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের পর এই শিলাময় দেবতাগুলি সাধারণ ধর্ম্মঠাকুর নামে পরিচিত হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুর নামে পরিচিত হওয়ার পর ইহার পূজা-পদ্ধতিতে বৌদ্ধ রীতিনীতিও প্রবেশ করিয়াছে। বুদ্ধপূর্ণিমার দিন এই দেবতার উৎসব হয়। গাজন উপলক্ষে বলিদান দেওয়ার পূর্ব্ব প্রথা থাকিয়া গেল বটে, কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণ ভিক্ষুদের অনুকরণে সন্ন্যাসী ভক্তের দল দেবতাকে লইয়া উৎসব করিতে লাগিল। বৌদ্ধ-তন্ত্র-বিহিত আত্মনিগ্রহের দ্বারা ধর্ম্মোপার্জ্জন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল—তাহা হইতে শালে ভর দেওয়া, কাণ ফোঁড়া, চড়কে ঘুরপাক খাওয়া, আগুনের মধ্য দিয়া হাঁটা, খাদ্য পানীয় বর্জ্জন ইত্যাদির দ্বারা কৃচ্ছ্র সাধন ধর্ম্মপূজার সহিত জড়িত হইল। তখন কেবল মানসিক আর প্রার্থনা নয়—নিজ দেহকে পীড়ন করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভক্তেরা

দেবতার কাছে আপন কাম্য বস্তুর অগ্রিম মূল্য দান করিতে লাগিল। ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের কল্যাণই তাহাদের কাম্য। সম্ভবতঃ রাঢ়দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সেজন্য নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই আজিও অনেক স্থানে ধর্ম্মঠাকুরের ভক্ত ও পূজারী। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই, বরং ব্রাহ্মণ্য শাসনের প্রতি বিদ্বেষ আছে।- সেজন্য হাড়ী, ডোম পূজারী হওয়াতেও কাহারও আপত্তি ছিল না। ধর্ম্মঠাকুরে পরিণত হওয়ার পর এই দেবতা নিরাকার নিরঞ্জন মহাশূন্যের প্রতীকস্বরূপ হইলেন। তারপর বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ সাধনের পর যখন এদেশের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানই হিন্দুত্বের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল, তখন দেশের সাধারণ লোক বৌদ্ধ প্রথা-পদ্ধতির কতক রক্ষা করিল, কতক বর্জ্জন করিল, হিন্দুত্বের আদর্শে কতক অংশের শুদ্ধিসংস্কার করিয়া লইল। এই বিপ্লবে ধর্ম্মঠাকুর প্রধানতঃ শিবঠাকুরে পরিণত হইলেন। দেবতার ত মৃত্যু নাই—দেবতা রূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। বৌদ্ধ পূজাপদ্ধতি ও উপাসনা-সম্পর্কীয় আচার অনুষ্ঠানগুলির অধিকাংশ থাকিয়া গেল—দেবতাই নামরূপ বদলাইলেন। গণ্ডার, অশ্ব ইত্যাদি বলিদানের প্রথা নাই বটে, অনার্য্যদের প্রবর্ত্তিত হাঁস, পারাবত ইত্যাদি বলিদানের প্রথা,—মুখোস পরা সঙের খেলা,—মড়ার মাথা লইয়া খেলা,—মশান নৃত্য ইত্যাদি আজিও থাকিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কোন কোন প্রথা, বৌদ্ধ শ্রমণভিক্ষুদের আত্মনিগ্রহ, ধর্ম্মক্ষেত্রে জাত্যাভিমান-বর্জ্জন—বুদ্ধপূর্ণিমার উৎসব, চড়কগাজনের উৎসব ইত্যাদিও থাকিয়া গিয়াছে। আবার এদিকে ধর্ম্মঠাকুর শিবমন্দিরের মত অনেকস্থলে মন্দির লাভ করিয়াছেন—বিল্বপত্র ধুতরার অঞ্জলিও লাভ করিতেছেন—শিবপূজার মন্ত্রে "নমঃ শিবায়" বলিয়া পূজিত হইতেছেন—ব্রাহ্মণ পূজারীও লাভ

করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হারিতী, শীতলা ইত্যাদি বৌদ্ধ দেবীগণও মা দুর্গায় পরিণত হইয়াছেন।

শিব সর্ব্বত্যাগী শ্মশানচারী নিঃস্ব নিঃসম্বল দেবতা, তিনি বিশ্বের কোন সম্পদই গ্রহণ করেন না—কোন কামনা তাহার নাই—তিনি নিষ্কাম, তাঁহার কাছে কোন কাম্য বস্তু প্রার্থনার কথা নয়। তাঁহার প্রতি ভক্তি অহৈতুকী ভক্তি—পরাজ্ঞান ছাড়া কিছুই তাঁহার কাছে প্রার্থনীয় নাই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে কামনাপূরণের দেবতা চণ্ডী। যাহার দিব্যজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন কাম্য নাই, তিনিই শিবের ভক্ত। কিন্তু এই শিবরূপে রূপান্তরিত ধর্ম্মঠাকুরের কাছে গ্রামবাসীদের প্রার্থনার অন্ত নাই—ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, আরোগ্যং দেহি, সৌভাগ্যং দেহি—ইত্যাদি দেহি-দেহি রব।

যে দেশে বহু দেবদেবীর পূজা লইয়া নানা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, সে দেশের জনসাধারণ এমন একটি দেবতা চাহিয়াছিল, যাহার পূজা করিলে সব দেবদেবীর পূজা করা হয়, সকল দেবদেবীর যে দেবতায় সমন্বয় হইয়াছে। সেই দেবতা এই ধর্ম্মঠাকুর। ইনিই সর্ব্ব দেবদেবীর আদি দেব, অনাদ্যন্ত, নিরঞ্জন।

বৌদ্ধপুরাণমতে চণ্ডী ইঁহারই কন্যা, মনসা ইঁহার নাতনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইঁহারই দৌহিত্র। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে যত লোক সকলেই তাই এই দেবতার পূজা করিয়া সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মদ্বন্দ্ব হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিল। শ্যামপণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলে আছে—

ধর্ম্মপূজা কৈলে শমনের নাহি ভয়। একান্ত হইয়া যদি পূজে পদদ্বয়।
অধনীর ধন হয় বন্ধ্যা পুত্রবান্। অন্ধজনা যদি পূজে পায় চক্ষুদান।
কুঁজা খোঁড়া কুষ্ঠী যদি ধর্ম্ম সেবা করে। কন্দর্প সমান হয় নিরঞ্জনের বরে।
অহঙ্কারে ধর্ম্মঘট লঙ্ঘে যেইজন। অষ্টাঙ্গে ধবল হয় বংশের নিধন।

বারমতী করিয়া যে ধর্ম্মসেবা করে। পুনরপি গতায়াত না করে সংসারে।
যত দেখি নদনদী সমুদ্রকে যায়। নিরঞ্জন পূজা কৈলে সর্ব্ব দেবে পায়॥

চিরকাল বৌদ্ধ প্রভাবের আগে হইতে যে মানত মানসিক করিয়া আসিয়াছে গ্রামবাসীরা তাহাই হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে আজিও চালাইতেছে। প্রার্থনাই যদি বন্ধ হয়, তবে দেবতার প্রয়োজন কি? এ দেবতা যে দুর্ব্বলতা, অসহায়তা, নিরুপায়তা, অভাব, দৈন্য-দুঃখ-দুর্দ্দশারই সৃষ্টি। দেশবাসী তাহা ভুলে নাই।

ধর্ম্মঠাকুরের শিবে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথমতঃ—ধর্ম্মঠাকুর ছিলেন শিলাখণ্ড—শিবলিঙ্গও শিলাখণ্ড। দ্বিতীয়তঃ—অনার্যাদের দেবতা, হাড়ী ডোম পুরোহিতদের দ্বারা পূজিত। বর্ণাশ্রমের বহির্ভূত, নিঃস্ব নিঃসম্বলদের দেবতা সর্ব্বসংস্কারমুক্ত মহাদেব ছাড়া আর কোন রূপ ধরিবেন? তৃতীয়তঃ—আত্মনিগ্রহরত ভিক্ষুসন্ন্যাসীদের উপাস্য, নাথ-যোগীদের আরাধ্য, বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধ্যানগম্য দেবতা যে শ্মশানচারী মহাযোগী মহাসন্ন্যাসী শিবের রূপ ধরিবেন ইহাইত স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নাথযোগীরাই ধর্ম্মঠাকুরকে শিবে পরিণত করিবার প্রবর্ত্তনা দান করেন।

কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর একেবারেই 'বাবা বুড়ো শিব' হইয়া উঠেন নাই—অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেবতার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া শেষে শিবত্ব পাইয়াছেন। অনেকস্থলে ইনি বিষ্ণুরূপ লাভ করিয়াছিলেন—কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যে তাহার পরিচয় আছে। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে তিনি বিষ্ণুরূপে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধরিয়া ভক্তকে দেখা দিতেছেন। উড়িষ্যায় ধর্ম্মঠাকুর প্রায় সর্ব্বত্র বিষ্ণুরূপ ধরিয়াছেন। রাঢ়বঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের বিষ্ণুত্ব মঙ্গলকাব্যে থাকিলেও গ্রামেশ্বর ধর্ম্মরাজগুলিতে সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। তাহার একটি কারণ, বলিদান। বলিদানের সহিত বিষ্ণুত্বের সামঞ্জস্য হয় নাই।

মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীমান আশুতোষ ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন—"তখন (হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়) লৌকিক ধর্ম্মঠাকুরের সামাজিক অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, একটী কিছু আবরণ পাইলেই তিনি আত্মগোপন করিয়া ফেলেন। অবশ্য পরবর্ত্তী কালে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাপক প্রভাবের ফলে তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সম্ভবতঃ পৌরাণিক ধর্ম্মরাজ বা যমরাজ বলিয়াও একটা ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হইয়াছিল। হিন্দু প্রভাবের পর হইতে হিন্দু দেবদেবীর পূজা-বিধানের অনুকরণে নব্য রঘুনন্দন কর্ত্তৃক ধর্ম্মপূজারও বিধান রচিত হইল। এই পূজাবিধানে ধর্ম্মঠাকুরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার হিন্দু পরিণতি পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির স্পষ্ট সন্ধান করিতে পারা যায়। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতারূপে মহাযান বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সকল প্রধান প্রধান দেবতাদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে, ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে তাহাদেরও পূজা করিতে হয়। ইহার মধ্যে মগর পণ্ডিত, কালু ঘোষ, ভট্ট ধরাধর, ভাস্কর নৃপতি, মন্তির ঘোষ, সাধু পুরদত্ত, আশোয়া চণ্ডাল, আদিনাথ, মীননাথ, চৌরঙ্গীনাথ, গোরক্ষনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠী, বিষহরী, বাসুলী, বিশালাক্ষী, চামুণ্ডা, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী প্রভৃতিরও পূজার নির্দ্দেশ হইয়াছে।"

রাঢ়দেশে ধর্ম্মরাজ এখন শিবে পরিণত হইয়াছেন—কিন্তু যে কালে ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থগুলি রচিত হয়, সে কালে তিনি পূর্ণরূপে হিন্দু দেবতায় পরিণত হন নাই। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিগণ তাই বলিয়াছেন—"যদি ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গ্রন্থ লিখি—তাহা হইলে জাতি যাইবে, লোকে উপহাস করিবে। দেশময় অখ্যাতি হইবে।"

কবিরা যে ধর্ম্মঠাকুরের ভয়ে কিংবা তাঁহার প্রসাদের প্রলোভনে গীত রচনা করিয়াছেন—দেব-নির্দ্দেশ-বর্ণনায় ও স্বপ্ন-বিবরণে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। যে সকল দুঃসাহসী কবি ধর্ম্মের মঙ্গল গান রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর সহিত একাত্মক করিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন ধর্ম্মঠাকুর ত বিষ্ণু-ঠাকুরেরই একটি অভিনবরূপ। বৌদ্ধ সৃষ্টিতত্ত্বে আছে—নিরঞ্জন ধর্ম্মপ্রভুর দৌহিত্র ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। কাজেই কেহ কেহ তাঁহাকে অনাদি-নিধন শিবেরও জন্মদাতা বলিয়া অভিনব পৌরাণিক প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন।

এইখানে ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিয়া লই—আদিতে রূপ, বর্ণ, রবি, শশী, স্থল, জল ইত্যাদি কিছুই ছিল না—ছিল শুধু মহাশূন্য। এই মহাশূন্যে প্রভু নিরঞ্জন একাকী ভাসিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মনে জাগিল সিসৃক্ষা বা সৃজনবাসনা। তাহা হইতে প্রথমে জন্মিল পবন—পবন হইতে অনিল—তাহা হইতে বুদ্বুদ জন্মিল। এই বুদ্বুদের উপর প্রভু সমাসীন হইলেন। কিন্তু বুদ্বুদ ভার সহিতে না পারিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রভু নিজেই হস্তপদহীন এক মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ইহাই ধর্ম্মকায়। তিনি চতুর্দ্দশ যুগ ধরিয়া ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। ইহাই তাঁহার তপস্যা। এই তপস্যার ফলে প্রভুর হাই হইতে এক উলূকের জন্ম হইল। এই উলূকের পৃষ্ঠে চড়িয়া প্রভু আবার তপস্যায় মগ্ন হইলেন। তৎপরে প্রভুর মুখামৃত হইতে জলের জন্ম হইল। এই জলে উলূক সন্তরণ করিয়া প্রভুকে বহন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভার অসহ্য হওয়ায় তাহার পাখা খসিয়া গেল। সেই পাখা হইতে জন্মিল পরমহংস। প্রভু হংসের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন—হংসও ভার বহন করিতে পারিল না। তখন

প্রভু কচ্ছপকে সৃষ্টি করিলেন। প্রভু কচ্ছপের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কচ্ছপও ভার সহ্য করিতে পারিল না—সেও পলাইল। তখন প্রভু জলে ভাসিতে লাগিলেন। তারপর প্রভু নিজের স্বর্ণোপবীত ছিঁড়িয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। তাহা হইতে বাসুকির জন্ম হইল। তিনি কর্ণের কুণ্ডল ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে ভেকের জন্ম হইল। বাসুকি এই ভেক ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন। প্রভু নিজের অঙ্গের এক বিন্দু মলা বাসুকির ফণার উপর রাখিলেন, তাহাই হইল পৃথিবী। প্রভু পৃথিবীর সীমার সন্ধানে বাহির হইলেন। সীমা খুঁজিয়া না পাইয়া পরিশ্রান্ত হইলে তাঁহার ঘর্ম্ম হইতে আদ্যা শক্তির জন্ম হইল।

ইহার পর প্রভু বল্লুকা নদী সৃষ্টি করিয়া তাহার তীরে যোগমগ্ন হইলেন। এইভাবে চৌদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে আদ্যা যৌবনপ্রাপ্তা হইলেন। আদ্যার মন হইতে মনসিজের জন্ম হইল। এই মনসিজ বা কামদেবকে আদ্যা ধর্ম্ম প্রভুর সন্ধানে পাঠাইলেন। কামদেব তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিলেন। তপোভঙ্গের পর প্রভু গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া আদ্যাকে বিবাহযোগ্যা দেখিয়া তাহার বরের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। আদ্যার জন্য রাখিয়া গেলেন এক পাত্রে মধু, এক পাত্রে বিষ।

আদ্যা মনের দুঃখে বিষপান করিলেন। তাঁহার ফলে তিনি গর্ভবতী হইলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার গর্ভে তিন পুত্রের জন্ম হইল ইহারাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ইহারা জন্মের পরই তপস্যা করিতে গেলেন সমুদ্রতীরে। ধর্ম্মপ্রভু ইহাদের তপঃশক্তির পরীক্ষার জন্য গলিত শবরূপে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু নিরঞ্জনের মায়া উপলব্ধি না করিয়া ঘৃণায় সরিয়া গেলেন। মহাজ্ঞানী মহেশ্বর এই শব স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন

তাহার ফলে শিব দিব্যচক্ষু লাভ করিলেন, তাঁহার মুখামৃতে তাঁহার দুই ভাইয়েরও দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। ইহার পর ব্রহ্মা সৃষ্টির, বিষ্ণু পালনের এবং রুদ্রদেব সংহারের ভার পাইলেন। এদিকে শিব নিরঞ্জনের আদেশে আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের ফলে নরলোকের সৃষ্টি হইল।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা করিলে মনে হয়, আর্য্য অনার্য্য নানা মত ও কাহিনীর সমবায়ে এই অদ্ভুত সৃষ্টিকাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ধর্ম্মদেবতাও আর্য্য অনার্য্য উভয়বিধ কল্পনার সমবায়ে উৎপন্ন। এই সৃষ্টিকাহিনী ধর্ম্মমঙ্গল ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে অংশতঃ প্রবেশ করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে—

জল হৈতে হৈল আদ্য পুরুষের জনম।
তার পুত্র হৈল প্রভু অনাদ্য ধরম।
শূন্যেতে আসন প্রভুর শূন্যেতে বৈসন।
শূন্যে ভর কর্যা প্রভু ভ্রমে নিরঞ্জন।
শূন্যেতে থাকিঞা প্রভু পাতিয়াছে মায়া।
আপনে সৃজিল প্রভু আপনার কায়া।
চাপড় হানিঞা জিনে জলের বিম্বুক।
তায় ভরা কৈল দেখ অনাদ্য সিন্ধুক।
বিন্দু হৈলা বিম্বুক সহিতে নারে ভর।
ভাঙ্গিল পানির বিম্বু উথলিল জল।
চক্ষের ময়লা প্রভু নিছিঞা ফেলিল।
তাহাতে আসিঞা পক্ষী উলুক জন্মিল।
কাঁধের ছিঁড়িয়া ফেলে কনকপৈতা।
একেকোটি নাগের হৈল শতকোটি মাথা।

নাগের নাম বাসুকি নিরঞ্জন।
তায় সমর্পিল প্রভু এ তিন ভুবন।
অঙ্গের ময়লা পাইয়া তিলেক প্রমাণ।
বাসুকির চক্রে পৃথিবী হৈল নবখান।

তারপর প্রভু হাঞি তুলিলেন—তাহা হইতে চণ্ডিকার জন্ম হইল। সেই চণ্ডিকার গর্ভে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে আজগুবি। এই আজগুবি অংশ সম্ভবতঃ হিন্দু-বৌদ্ধ প্রভাবমুক্ত অনার্য্য লোকধর্ম্ম হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। মহাশূন্যই যে জগতের আদি নিদান ইহা বৌদ্ধ মত। মহাশূন্য নিরঞ্জন যে নিষ্ক্রিয় কায় গ্রহণ করিলেন তাহাই ধর্ম্মকায়। মহাযানীদের ধর্ম্মকায়ের পরিকল্পনা এইভাবে ধর্ম্মমঙ্গলে গৃহীত হইয়াছে। মহাযানমতে ধর্ম্মকায় সকল প্রকার বাসনাবর্জ্জিত পবিত্র, সার্ব্বভৌম, বিশ্বাত্মক, বিরুদ্ধশক্তি হইতে মুক্ত মৌলিক শক্তি। ধর্ম্মকায়ই বেদান্তের ব্রহ্ম (Absolute Ulmiate Reality)। ইহার সম্ভোগকায়ই উপনিষদের হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর এবং তাঁহার নির্ম্মাণ-কায়ই বুদ্ধ এবং অন্যান্য অবতার।

বৌদ্ধগণ হিন্দুদের ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে এই নিরঞ্জন ধর্ম্মেরই বিভিন্নরূপ বলিয়া মনে করিত। ইহারা ধর্ম্মবুদ্ধের অধীন। সৃষ্টি-তত্ত্বের এই অংশ বৌদ্ধধর্ম্মসম্মত। ইহার অনেকাংশই আর্য্যহিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব ও পুরাণেরও অনুযায়ী।

অসীম ব্রহ্ম আত্মবিকাশ ও আত্মোপলব্ধির জন্য নিজেকে সীমাময় ও ভূমার প্রকট করিয়াছেন। উহাই তাহার মায়া, আমাদের কাছে তাহাই অবিদ্যা। এই সৃষ্টি উর্ণনাভের জালবিস্তারের ন্যায়। বিশ্ব যে মায়ারই সৃষ্টি—হিন্দুর দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনে এ বিষয়ে মতভেদ নাই।

এই মায়াকে হিন্দুপুরাণে আদ্যাশক্তি মহামায়া বলা হইয়াছে। ইনিই এই সৃষ্টিতত্ত্বের আদ্যা। এই মায়া বা আদ্যাকে বাদ দিলে ব্রহ্মে ও শূন্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। সাংখ্যদর্শন ব্রহ্মের সহিত শূন্যের একাত্মকতাকে পরিহারের জন্য ব্রহ্মের দ্বৈতভাব কল্পনা করিয়াছে এবং পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বৈতরূপ ধরিয়া লইয়াই এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বলিয়াছে।

বৈষ্ণব মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ—কিন্তু তিনি আনন্দকে উপলব্ধি করিবার জন্য নিজের হ্লাদিনী শক্তিকে প্রকৃতিতে রূপায়িত করিয়াছেন। এই হ্লাদিনী শক্তিই আদ্যাশক্তি। এই শক্তির বিকাশই এই সৃষ্টি। ব্রহ্মের আনন্দোপলব্ধির পরাকাষ্ঠা মানবদেহ-ধারণ এবং হ্লাদিনী শক্তিকে মানবীরূপে লাভের দ্বারা পরিকল্পিত হইয়াছে।

নিরঞ্জন প্রভুরও আনন্দ উপলব্ধির জন্য আত্মবিস্তার ও আত্ম-বিকাশের কথা এই সৃষ্টি-তত্ত্বের মধ্যে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে।

বিষ্ণুর প্রলয়পয়োধিজলে প্লবমান অবস্থা, অনন্তনাগের ফণাচ্ছায়ায় বিশ্রাম, কামদেবের দ্বারা শিবের তপস্যা ভঙ্গ, শিবের দ্বন্দ্বাতীত মহাজ্ঞান, সর্ব্বসংস্কারমুক্তি, সদানন্দময়তা হিন্দুপুরাণের এসমস্ত কথা এই সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

সকল সৃষ্টির মূলে দুঃখ ও আত্মনিগ্রহ অর্থাৎ তপস্যা। এই বিশ্বও স্রষ্টার তপস্যারই সৃষ্টি। সৃষ্টির আনন্দ বিনা তপস্যায় লাভ করা যায় না। উপনিষদের এই কথারও ইঙ্গিত ইহাতে আছে। নিরঞ্জন প্রভুও বহু তপস্যার ফলেই এই সৃষ্টিকে লাভ করিয়াছেন।

এই সৃষ্টিতত্ত্বের আজগুবি কাহিনীর মধ্যে ক্রমোদ্বর্ত্তন (Evolution) তত্ত্বেরও ইঙ্গিত আছে। ব্যোম, অনিল, জল পৃথিবী—এই ক্রমধারা এবং নানা জীবজন্তু হইতে ক্রমপর্য্যায়ে মানবত্বের অভিব্যক্তি—ইহা বিবর্ত্তবাদের অনুগত।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব যেমন নানা ধর্ম্মমতের মিশ্রণ—ধর্ম্মঠাকুরও তাহাই। হিন্দুকবিগণ বহুদিন পর্য্যন্ত ধর্ম্মঠাকুরের কথা লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ময়ুরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলেই সর্ব্বপ্রথম লাউসেন রঞ্জাবতী কাহিনীর প্রবর্ত্তন। ময়ুরভট্টকেই ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি বলা হয়। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা জানা যায় না। ময়ূর ভট্টের গ্রন্থ অবলম্বনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু গোবিন্দরাম ধর্ম্ম মঙ্গল রচনা করেন। তারপর ক্রমে রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ, ঘনরাম, নরসিংহ, সহদেব ইত্যাদি হিন্দু কবিগণ মঙ্গলকাব্যের পালা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকলের মধ্যে ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলই বিখ্যাত।

পুরাণে হরিশ্চন্দ্র রোহিতাশ্বের কাহিনী, বৈদিক শুনঃশেফ-বিশ্বামিত্রের কাহিনী, দাতাকর্ণের কাহিনী এইরূপ বহু কাহিনীর মিশ্র রূপ আছে ইহাতে। লাউসেনের কাহিনীর আবির্ভাবে বাঙ্গালী যেন আপন শৌর্য্যের আদর্শ পাইয়া পৌরাণিক আত্মোৎসর্গের কাহিনীগুলিকে একপ্রকার ভুলিয়াই গেল।

ধর্ম্মঠাকুরের কৃপাতেই লাউসেনের যত অলৌকিক শক্তি। অতএব লাউসেনের কাহিনী ধর্ম্মঠাকুরেরই মহিমার গান। ময়ুরভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলের ধর্ম্ম বিষ্ণুর সহিত একাত্মক। ময়ুরভট্টের আগে রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানই ধর্ম্মমঙ্গলের প্রধান উপজীব্য ছিল। ধর্ম্মঠাকুর ছদ্মবেশে আসিয়া হরিশ্চন্দ্রের পুত্রের মাংস খাইতে চাহিলেন হরিশ্চন্দ্রের ভক্তির পরীক্ষার জন্য। রাজা কর্ণের মত পুত্রের মাংস রাঁধিয়া ধর্ম্মঠাকুরকে খাইতে দিলেন। ধর্ম্মঠাকুর পুত্র 'লুয়ে'কে শেষে বাঁচাইয়া দিলেন। ইহা সম্পূর্ণ পৌরাণিক উপাখ্যানের মত। আব্রাহামের মত এই পুত্রবলিদান ত্যাগধর্ম্মের চরম দৃষ্টান্ত।

অর্ব্বাচীন বৌদ্ধমতে আত্মনিগ্রহই প্রধান ধর্ম্ম। এই আত্মনিগ্রহই.

ধর্ম্মদেবতার প্রধান উপাসনায় দাঁড়াইয়াছিল। এই আত্মনিগ্রহের কাহিনীতে ধর্ম্মমঙ্গল পরিপূর্ণ। আত্মদেহ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের উদ্দেশে নিবেদন—চরম আত্মনিগ্রহ। ধর্ম্মমঙ্গলে আছে,—রঞ্জাবতী নিজের শিরশ্ছেদন করিয়া ধর্ম্মঠাকুরকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে নিজের জীবন ত ফিরিয়া পাইলেনই—উপরন্তু লাউসেনের ন্যায় সর্ব্ব-গুণময় মহাপরাক্রান্ত পুত্রও লাভ করিলেন। আমাদের দেশে চড়ক গাজনে সন্ন্যাসী সাজিয়া ভক্তেরা দারুণ কৃচ্ছ্রসাধন করে—ইহাই ধর্ম্মঠাকুরের উপাসনা। এই গাজনের কয়দিন এদেশে ধর্ম্মমঙ্গলের গান হইত।

ধর্ম্মঠাকুরের ভক্তগণ লৌহশলাকার শালের উপর শয়ন করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিত। ইহাদের বিশ্বাস ছিল ইহাতে অলৌকিক শক্তি লাভ করা যায়। লাউসেন এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধনা করিয়া পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠাইয়াছিলেন—ইহাও হয়ত তাহারা বিশ্বাস করিত।

লাউসেনের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন—"লাউসেন বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই। ধর্ম্মমঙ্গলকাহিনীকে ইংরাজিতে Adventures and exploits of Lousen বলা যাইতে পারে। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বংলার উপকথা মাত্র। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব।"

• ধর্ম্মমঙ্গলের প্রধান কবি ঘনরাম ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের আদেশে তিনি কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২৪টি পালায় বিভক্ত—চল্লিশ হাজার পংক্তিতে সমাপ্ত।

: ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীটি ঘনরাম পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থ হইতে

পাইয়াছেন, কিন্তু কাহিনীর সৌষ্ঠব তিনি বাড়াইয়াছেন। এই কাহিনীর মূলে হয় ত সামান্য একটু ঐতিহাসিক সত্য আছে। কাহিনীটি এই—গৌড়েশ্বর (সম্ভবতঃ ধর্ম্মপাল) যখন বঙ্গভূমি শাসন করিতেছিলেন, তখন অজয়তীরবর্ত্তী ঢেকুরের রাজা ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইয়া গৌড়েশ্বরের রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন। গৌড় হইতে সৈন্য লইয়া রাজা যুদ্ধে আসিলেন, কিন্তু ইছাই ঘোষের কাছে পরাজিত হইলেন। গৌড়পতির লজ্জার অবধি থাকিল না। ইছাই ঘোষ চণ্ডীর সেবক। ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন ইছাই-এর সঙ্গে যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইলেন—পত্নীও শোকে আত্মহত্যা করিল। কর্ণসেন সন্ন্যাসী হইতে চাহেন। গৌড়পতি তাঁহার অপূর্ব্বসুন্দরী শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিয়া তাহাকে আবার সংসারে বন্দী করিলেন। এই রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়া ধর্ম্মকে প্রসন্ন করেন। ধর্ম্ম লাউসেনরূপে তাঁহার জঠরে জন্মগ্রহণ করেন।

গৌড়পতি বহুবার চেষ্টা করিয়াও চণ্ডীর অনুগৃহীত ইছাইকে বধ করিতে পারিলেন না। লাউসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে গৌড়েশ্বর তাঁহাকে ইছাই দমনের ভার দিলেন। এদিকে মহামদ গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী, লাউসেনের মাতুল, কিন্তু লাউসেনকে দুচোখে দেখিতে পারিত না। লাউসেন রাজার প্রীতিপাত্র, কবে যে সে তাঁহার মন্ত্রিপদ কাড়িয়া লয়, এই ভয়ে লাউসেনের বিপক্ষতা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই ধর্ম্মরক্ষিত লাউসেনের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। লাউসেন অজেয়, সে ব্যাঘ্র, হস্তী, সিংহ ইত্যাদির সহিত লড়াই করিয়া জয়ী হইয়াছে। লাউসেন ইন্দ্রিয়জয়ী, কঠোর তপস্বী এবং অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন। সে মৃতসৈন্যগণকে পুনর্জ্জীবিত করে, পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে উঠায়।

সে অবলীলাক্রমে ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া আসিল। চণ্ডী তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না। রণক্ষেত্রে চণ্ডী আসিয়া ইছাই-এর কাটামুণ্ড কোলে করিয়া 'কোথা গেলিরে বাপ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। লাউসেনের এই জয়জয়কারই ধর্ম্মের জয়জয়কার। এদিকে চণ্ডীর মহিমাও অল্প নয়। গৌড়েশ্বর হরিপালের রাজকন্যা কাণড়াকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, রাজার নিকট দূতও পাঠাইলেন। চণ্ডীর উপাসিকা কাণড়া বৃদ্ধ রাজাকে বিবাহ করিতে চাহিল না। তাহার উপদেশে হরিপালরাজ গৌড়ের দূতকে তাড়াইয়া দিল। ফলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। হরিপালের শক্তি যৎসামান্য—গৌড়রাজের নয় লক্ষ সৈন্যের আক্রমণে হরিপালের সৈন্য পলাইতে লাগিল। কাণড়া নিজে ধনুর্ব্বাণ হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া রণক্ষেত্রে আসিল। চণ্ডীদেবী নিজের উপাসিকাকে রক্ষা করিবার জন্য ধূমসী ডাকিনীকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন—গৌড়পতির পরাজয় হইল। কাণড়া গৌড়ের সেনাপতি লাউসেনকে পতিত্বে বরণ করিলেন। লাউসেন মেসোর নিজের জন্য মনোনীত পাত্রীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। চণ্ডী আসিয়া লাউসেনের সঙ্গে কাণড়ার বিবাহ দিলেন। এখানে চণ্ডীরই জয়।

অনেক আজগুবি ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও ইহা একখানি উপন্যাসের মত। ইহার মধ্যে নানারসের সমাবেশ আছে—বীররসেরই প্রাবল্য! বাঙ্গালী নারী ঘোটকে চড়িয়া যুদ্ধে যাইতেছে, বাঙ্গালী বীরাঙ্গনা নিজের আরাধ্য বীরের নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছে, পাণি-প্রার্থী রাজার দূতকে কুমারী নিজে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া দূর করিয়া দিতেছে। নারীর স্বাধীনতার দিক হইতে এসমস্ত অপূর্ব্ব কল্পনা।

ধর্ম্মমঙ্গলে বৌদ্ধদের সহিত শাক্তদের দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত আছে। একদিকে ধর্ম্ম—অন্যদিকে চণ্ডী। শেষ জয় ধর্ম্মেরই। দ্বন্দ্বের সন্ধিরও

ইঙ্গিত আছে। চণ্ডীর ঘটকালিতে ধর্ম্মঠাকুরের আশ্রিত লাউসেনের সঙ্গে চণ্ডীর অনুগৃহীতা কাণড়ার বিবাহই দ্বন্দ্বের সন্ধি। কাণড়া লাউসেনকে শরে বিদ্ধ করিতে উদ্যত। চণ্ডী আসিয়া রক্ষা করিতেছেন। চণ্ডীর মারফতে হিন্দুদের উদারতাই ইহাতে সূচিত হইয়াছে।

এই কাব্যে বাঙ্গালী বীরদের যুদ্ধের বর্ণনা আছে—ইহা রাজকোটালের সঙ্গে দক্ষিণ মশানের মা কালীর যুদ্ধ নয়। ইহা বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর যুদ্ধ। এই কাব্যে ঘটনার পর ঘটনার প্রতিঘাতে নায়ক-নায়িকার চরিত্র কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষ হইতে প্রলোভন জয় করিয়া চরিত্রের বিশুদ্ধি রক্ষার একাধিক দৃষ্টান্ত এই কাব্যে আছে।

ঘনরামের কাব্যে ঘটনা-ঘনতা এত বেশী যে, কোন একটা বিষয় লইয়া ইনাইয়া বিনাইয়া কাব্যবিলাস করিবার অবসর তাঁহার ছিল না—এমন কি নিদারুণ শোকের ক্ষেত্রেও কবি দুই একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুই-একটি বিলাপের কথা বলিয়াই সাহিত্যের দায়িত্বভার বহন করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়াছেন। এ যেন রাজপুতদের বা স্কটল্যাণ্ডের মধ্যযুগের বীরগণের সামরিক জীবন-যাত্রার সত্বরতা। নবীনচন্দ্রেব কুরুক্ষেত্রকাব্যে অভিমন্যুশোকে অবসন্ন অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'—বীরশোক অশ্রু নয়—অসির ঝঙ্কার।'—ঠিক এই বাণীরই প্রতিধ্বনি এই কাব্যের সকল শোক-ক্ষেত্রেই শুনিতে পাওয়া যায়।

দুর্ম্মুখা দাসী কলিঙ্গার শোকে আত্মবিস্মৃতা বীরাঙ্গনা কাণড়াকে বলিতেছে—

শোকের সময় নয় শত্রু আসে পুরে।
সংহার সংগ্রামে শক্তি, শোক ত্যজ দূরে

ভ্রাতৃশোকে ব্যথিত লখাইকে জননী শুকা বলিতেছে—

শোক তেজে সমরে ভাইয়ের ধার শোধ।

"যে যুদ্ধে পুত্র নিহত হইয়াছে সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই আত্মাহুতি প্রদান করিয়া জননী পুত্রশোক ভুলিতেছে। ভ্রাতা মৃত ভ্রাতার পরিত্যক্ত যুদ্ধাশ্বে আরোহণ করিয়া সেই যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভ্রাতৃশোক ভুলিতেছে। অতএব এই কর্ম্মতৎপরতার মধ্যে ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা কোন চরিত্রের জন্যই আর অলস বিলাপের দীর্ঘ অবকাশ রচনা করেন নাই। কিন্তু কোন চরিত্রকেই যে তাঁহারা হৃদয়হীন করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন তাহাও নহে।"—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।

মহাভারতের মহাপ্রস্থান-যাত্রী ভ্রাতৃগণের চরিত্র-দৃঢ়তা, এ সকল স্থলে দেখা যায়। অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গলের তুলনায় ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গলে ধর্ম্মের মহিমা প্রচার অপেক্ষা কাব্য-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিকে যেন অধিকতর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

ঘনরামের কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। স্থলে স্থলে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ আছে। ঘনরামের ভাষা অনুপ্রাসাঢ্য। ভাষা স্থলে স্থলে বীররসের উদ্দীপনায় বেশ পৌরুষ-ব্যঞ্জক। বাংলা কবিতার ভাষায় যে ওজস্বিতার সৃষ্টি করিতে পারা যায়, কবি ঘনরাম তাহা দেখাইয়াছেন। এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেও কাব্যখানি দুষ্পাঠ্য। প্রয়োজনাতিরিক্ত বাগ্‌বিস্তারে ও একটানা সুরে রচিত ক্লান্তিকর পয়ারের মাঝে মাঝে ত্রিপদী ছন্দের অবতারণা আছে বটে, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় নাই। ঘনরামের কবি-প্রতিভার শক্তি থাকিলে ইহাকে একখানি মহাকাব্যে পরিণত করিতে পারিতেন। লাউসেনের মত একটা মহাবীর-চরিত্র পাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রতিযোধ ইছাই ঘোষও একজন মহাবীর ছিলেন। কর্পূর, মহামদ, কালু ইত্যাদি

বিভিন্ন প্রকৃতির চরিত্রের দ্বারা উপাখ্যানের বৈচিত্র্য সৃষ্টিও হইয়াছিল। রঞ্জাবতী ও কাণড়া চরিত্র দুইটিতে প্রচুর রোমান্সের অবসর ছিল। এত সব আয়োজনে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ কাব্য কেন যে হইল না, তাহাই ভাবিয়া দুঃখ হয়। পুরাণের ভঙ্গীতে লাউসেনের অলৌকিক কাহিনী বিবৃতিতেই কবি আনন্দ পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে নানা শাস্ত্রীয় যুক্তি, ব্রাহ্মণ-ভক্তির আতিশয্য, নানা দেবদেবীর প্রসঙ্গ, হনুমানের কৃতিত্ব, কামাখ্যার মন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ ইত্যাদি আসিয়া উপাখ্যানের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

দীনেশ বাবু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের সমালোচনায় ইহার বৈচিত্র্যহীনতার কথাই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কাব্যখানিতে ঘটনা-বৈচিত্র্যের, দৃশ্য-বৈচিত্র্যের ও চিত্র-বৈচিত্র্যের অভাব নাই। সেগুলিকে যে ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে উপস্থাপিত করিলে চিত্তাকর্ষক হইত—সেই ভাব, ভঙ্গী ও ভাষা কবির ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মঠাকুর রাঢ় দেশেরই ঠাকুর। সে জন্য মনসা-মঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের মত ধর্ম্মমঙ্গল রাঢ়দেশের বাহিরে বিশেষরূপে প্রচারিত হয় নাই। ধর্ম্মঠাকুরের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে তিনি রাঢ়দেশের দেবতা। কারণ, রাঢ় দেশ কবির দেশ। এদেশের উপাস্য হওয়ার জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচারক ভক্তের অভাব হয় নাই। অসংখ্য ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রাবল্যে ধর্ম্মদেবতা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিলেন। কবিরাই তাঁহার মঙ্গলগান করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কবিদের কাব্যের গুণেই ধর্ম্মঠাকুর লোকসমাজে রাঢ়দেশের বাহিরেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সহযোগী মঙ্গলকাব্যের কবিরাও মঙ্গলাচরণে গণেশাদি পঞ্চদেবতার

সঙ্গে ধর্ম্মঠাকুরের বন্দনা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ সর্ব্বশ্রেণীর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য এই প্রথা অবলম্বিত হইত।

যে কালে ধর্ম্মঠাকুরের প্রভাব মন্দীভূত, সেইকালেই প্রধান প্রধান ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচিত হইল কেন? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। মোট কথা, দেবতার স্বপ্নও নয়, দেবতার ভয় বা ভক্তিও নয়, দেবতার প্রভাব-প্রতিপত্তিও নয়, লাউসেনের কাহিনীটিই এমন বৈচিত্র্যময়, উদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক যে কবিরা এই জনবল্লভ কাহিনীটি লইয়া নূতন নূতন কাব্য রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীরা বৈশ্যসমাজের কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ক্ষত্রিয়সমাজের কাহিনী সহজেই তাহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, সাহিত্যে দৈবনির্য্যাতন ও তজ্জনিত করুণরসের প্রবাহ বড়ই একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যের বিরহমিলনের কথা সম্বন্ধেও ঐ কথাই খাটে। শৌর্য্যবীর্য্য ত্যাগতিতিক্ষার নূতন আদর্শ ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনীতে পাইয়া বাঙ্গালী সাগ্রহে উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহাতে তাহারা অভিনব রসও উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

পক্ষান্তরে, বৈচিত্র্যের গুণে ধর্ম্মমঙ্গলের আদর যতটুকুই হউক ধর্ম্মমঙ্গলের গান কোনদিন সর্ব্বজন-বল্লভ হয় নাই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতাই বড়, মানুষ ছোট এবং নিতান্ত অসহায়। ধর্ম্মমঙ্গলে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় মানুষের মহিমা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মানুষের তুলনায় দেবতা অনেকটা নিষ্প্রভ। সতীত্বে নারী এবং বীরত্বে ও মহত্বে নর দেবতাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে। জানি না এ জন্য বাঙ্গালী ধর্ম্মমঙ্গলকাব্যকে ভালবাসিত কি না। শৌর্য্যবীর্য্য বা বীররৌদ্ররসের অভিব্যক্তি বাঙ্গালীজাতির চরিত্র ও প্রকৃতির

সহিত সুসমঞ্জস নয়। আদি ও করুণ রসের সহিত ভক্তির সংমিশ্রণই তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করে বেশী। তাই অন্যান্য মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য-সাহিত্য ইত্যাদির তুলনায় ধর্ম্মমঙ্গল এদেশের জনবল্লভতা লাভ করে নাই। তাই মাণিকরাম, ঘনরাম ইত্যাদি কবিরা এদেশে বিস্মৃতপ্রায় হইয়াই আছেন।

অন্যান্য প্রাচীনকাব্যের সহিত তুলনায় নানাভাবে ধর্ম্মমঙ্গলের স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি অনেক বিষয়ে মিলও আছে। মোহিনী-বেশে দেবতার ছলনা এবং জিতেন্দ্রিয় বীরের চিত্তসংযমরক্ষার কথা গোরক্ষনাথ, চাঁদসদাগর এমনকি কালকেতুকেও স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্লেষের দ্বারা দেবতার আত্মপরিচয় মঙ্গলকাব্যের একটা কবিপ্রথা। সতীত্বের মহিমাকীর্ত্তন অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত ধর্ম্মমঙ্গলেও দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব নাথ-সাহিত্য ও অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সমভাবেই দেখা যায়। ধর্ম্মমঙ্গলের নারী-রাজ্য ও নারীগণের মোহন জাল বিস্তার, গোরক্ষবিজয়ের কদলীপত্তন ও মীননাথের পতনের কথা মনে পড়ায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের হনুমান,—চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্ম্মমঙ্গলেও আছেন। লাউসেনের মায়ামুণ্ড, ইছাই ঘোষের কবন্ধে বার বার ছিন্ন মুণ্ডের সংযোজন, সুরিক্ষার নাসাচ্ছেদ ইত্যাদি সম্ভবতঃ রামায়ণ হইতেই গৃহীত। ধর্ম্মমঙ্গলেও অন্যান্য মঙ্গলকাব্য ও চরিতকাব্যের মত মানুষ, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী ও দ্রব্যাদির দীর্ঘ তালিকা দেখা যায়। মঙ্গলকাব্যে শ্মশানমশানের বর্ণনায় ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রণক্ষেত্রের বর্ণনায় যে বীভৎসতার চিত্র আছে, ধর্ম্মমঙ্গলেও বিশেষ প্রয়োজন না হইলেও, সেইরূপ চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে।

ধর্ম্মঠাকুরকে কোন কোন কাব্য বিষ্ণুর সহিত অভেদাত্মা বলিয়া ঘোষণা করিলেও, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মমঙ্গল ব্রাহ্মণ্যশাসনের বহির্ভূত

রাজ্যেরই কাব্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন করিলে জাতি যাইত। মাণিকরাম সেই ভয় করিয়া স্বপ্নাদেশ পাইয়াও ইতস্ততঃ করিয়াছেন। তাহাকে প্রবোধ ও সাহস দিবার জন্য—

জগৎ ঈশ্বর ক'ন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি।
আমি যাব সহায় এতেক ভয় কেন ?
ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন।
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া।

ধর্ম্মমঙ্গলের—রঞ্জাবতী, কাণড়া, কলিঙ্গা, সুরিক্ষা, লাউসেন, শাফুল্যা, মাহুদ্যা, ইছাই, ধূমসী, লোহাটা, কালু, শুকা, লখা ইত্যাদি নামগুলি বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণসমাজের বহির্ভূত।

নিরঞ্জনের উষ্মা (রুষ্মা) নামক কবিতায় সহদেব চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—মুসলমানেরা যে হিন্দুদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করিয়া জাতি নাশ করিতেছে—তাহা ধর্ম্মদেবতারই প্রতিহিংসাসাধন। ধর্ম্মই সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া সদ্ধর্ম্মদ্রোহী ব্রাহ্মণদের দণ্ড দিবার জন্য মুসলমান মূর্ত্তি ধরিয়াছেন। ইহাতে কবি যেন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

নিরঞ্জনের রুষ্মা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে মুদ্রিত হইলেও ইহা পরবর্ত্তী কোন কবির সম্ভবতঃ সহদেব চক্রবর্ত্তীরই রচনা। কারণ, তাঁহার রচিত অনিলপুরাণে ইহা আছে।

যে ধর্ম্মঠাকুরকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, পুরন্দরের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে, (ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর পূজা করে নিরন্তর) সে দেবতাকে ব্রাহ্মণসমাজ স্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর বৌদ্ধমুক্ত বাংলার এক শ্রেণীর হিন্দুদেরই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। সেই শ্রেণীতে ব্রাহ্মণও

যথেষ্ট ছিলেন। তাই ধর্ম্মমঙ্গল-কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে ব্রাহ্মণই বেশী।

যাঁহারা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারা বৌদ্ধ ত নহেনই—ধর্ম্মঠাকুরের সেবক বা ভক্তও সকলেই যে ছিলেন তাহাও নয়। ধর্ম্ম-মঙ্গলের কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহারা কাব্য রচনা করিয়াছেন। ধর্ম্মমঙ্গল লিখিতে হইলে গ্রন্থারম্ভের যে মামুলি প্রথা প্রচলিত ছিল—সেই প্রথা অবলম্বন করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছিলেন। সেজন্য বোধ হয় প্রত্যাদেশ ও "তোমা বই দেবতা নাই আর" ইত্যাদি উক্তির সমাবেশ করিয়া থাকিবেন। আর ধর্ম্মমঙ্গলের শ্রোতা সকলেই হইতে পারিত—ভক্তের ভক্তিতৃষ্ণা ইহাতে নিবৃত্ত হইত, অভক্ত সাহিত্য-রস ও সঙ্গীত-রস উপভোগ করিত।

ধর্ম্মমঙ্গলে কেবল নিম্নশ্রেণীর পুরুষদের চরিত্র তেজস্বিতা, শৌর্য্য, নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা' স্বামিধর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সদ্‌গুণে মণ্ডিত হয় নাই, নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী নারীচরিত্রেও রাজপুত বীরাঙ্গনাদের আদর্শ সঞ্চারিত করা হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের আদর্শ নারীচরিত্র বলিলে আমরা বুঝি—মেনকা, যশোদা, শচীমাতা, খুল্লনা, সনকা, বেহুলা। এইগুলি সবই হৃদয়মাধুর্য্যের সমতলে প্রবাহিতা তরঙ্গিণী,—গৈরিক দৃঢ়তা ইহাদের মধ্যে নাই।

ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা নূতন নারীচরিত্রের আদর্শ দিয়াছেন এবং এই আদর্শ গতানুগতিক সভ্য বর্ণাশ্রমী সমাজের অনুপযোগী মনে করিয়া নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালীসমাজ হইতেই এইরূপ নারীচরিত্র আহরণ করিয়াছেন। এইরূপ চরিত্র কালুডোমের পত্নী লখাই ডোম্নী ও শাকা ডোমের পত্নী ময়ূরা।

গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতী পুত্র লাউসেনকে যুদ্ধে বিদায় দিতে গিয়া মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া বলিতেছে—

বরঞ্চ এমন কেহ মহামল্ল থাকে। বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া করি রাখে॥
চরণ ভাঙিলে ঘুচে গমনের আশ। ঘরে বসে চাঁদ মুখ দেখি বার মাস॥
রঞ্জাবতী এখানে যশোদা, শচীমাতা, খুল্লনার সগোত্রা।

আর শাকার মা লখাই বলিতেছে—
মোর দুধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি। তু বেটা তখনি কেন হয়ে না মরিলি।
তাহার স্ত্রী ময়ূরা বলিতেছে—
মহাগুরু বচন রাজার লুণ খেলে। পাতক সঞ্চয় কেন কর বুক হেলে।

শাকা যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইল। তাহাতে লখাই কাতর না হইয়া একে একে সকল পুত্রকে রণক্ষেত্রে পাঠাইল। তাহাদের পতনের পর নিজে গেল যুদ্ধে প্রাণ দিতে।

এই চরিত্রসৃষ্টিতে আতিশয্য-দোষ হয় ত একটু হইয়াছে, কিন্তু নারীচরিত্রের এই আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে অভিনব প্রবর্তন।

লাউসেন, ইছাই ও কালুডোমের চরিত্র ছাড়া বাকি পুরুষ চরিত্রগুলি বাস্তবতার অনুগামী, কাজেই এইগুলির মধ্যে যথাযথতা আছে, কিন্তু মনুষ্যত্বের অভাব।

কর্ণসেন যুদ্ধে ছয় পুত্র হারাইল। তাহার পুত্রবধূগণ সহমৃতা হইল—রাণী শোকদুঃখে প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধবয়সে কর্ণসেন আবার সুন্দরী রাজশ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করিল। রঞ্জাবতীলাভই হইল শোকজীর্ণ বৃদ্ধ রাজার সান্ত্বনা। ইহাতে অস্বাভাবিকতা কিছুই নাই। কিন্তু চরিত্রের মহত্ত্ব ইহাতে নষ্ট হইয়াছে।

গৌড়েশ্বরের চরিত্রে মেরুদণ্ড নাই,—সে তাহার অমাত্য শ্যালক মহামদের হাতের পুতুল। বৃদ্ধ বয়সে সে রাজা হরিপালের কন্যা কাণড়ার রূপের খ্যাতি শুনিয়া তাহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিবার চেষ্টা করিল।

মহামদ নিষ্ঠুর কুচক্রী হীনচেতা ও প্রজাপীড়ক। লাউসেনের মহত্ত্বের ও উদারতার মর্ম্ম সে কিছুতেই বুঝে নাই।

লাউসেনের মহিমার ধারা শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিবার জন্যই কবি এই চরিত্রটিকে সর্ব্ব বিপদ ও সর্ব্ব দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তাহার দণ্ডবিধান হইয়াছে। মহত্ত্বের উদ্দীপক হিসাবে এই চরিত্রটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

কর্পূর লাউসেনের ভাই—কিন্তু ভীরু, কাপুরুষ, বিপদের সময় ভাইকে ত্যাগ করিয়া সে পলায়ন করিত। কর্পূর আদর্শ চরিত্র নয়—কিন্তু কবির চরিত্রসৃষ্টির দিক হইতে বিচার করিলে এই চরিত্র সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও জীবন্ত। ইহাতে অলৌকিক স্পর্শ নাই—অদ্ভুত কল্পনার মিশ্রণ নাই। এই চরিত্র দেবতার হাতের পুতুলও নয়—দেবীর মন্দিরে বলির ছাগও নয়—দোষে গুণে জড়িত রক্ত-মাংসের মানুষ।

এই চরিত্র সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশ চন্দ্র বলিয়াছেন—

"একমাত্র কর্পূর চরিত্র বাঙ্গালীর খাঁটি নক্সা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কর্পূর জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাউসেনকে খুব ভালবাসে। কিন্তু সে দাদাকে যত ভালবাসে নিজেকে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল বাসে।"

লাউসেনের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী ঐতিহাসিক বীরের মত নয়—কতকটা রূপকথার রাজপুত্রের মত,—কতকটা পৌরাণিক বীরের মত।

আবার লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের হাতের মানবাকার যন্ত্রমাত্র। লাউসেনচরিত্রের বাস্তবতার অভাব সত্ত্বেও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের তৃণলতা-সমাচ্ছন্ন সমতলক্ষেত্রে লাউসেনকে একটি মহীরুহ বলিয়াই মনে হয়। যে যুগের সাহিত্যে সকল চরিত্রেই বাস্তবতার অভাব,—এমন কি ঐতিহাসিক চরিত্র শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ পর্য্যন্ত অবাস্তব

ভাববিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন. সেযুগের সাহিত্যে বাস্তবতার কথা বাদ দিয়াই চরিত্রবিচার করিতে হইবে।

দেবসেনাপতি কুমারের জন্মের মূলে যেমন উমার কঠোর তপস্যা বর্ত্তমান, লাউসেনের জন্মের মূলে তেমনি রঞ্জাবতীর কঠোর তপস্যা। সাহস, ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, সংযম. বিচক্ষণতা. দৈহিক বল, কর্ত্তব্যবোধ, সত্যনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতায় লাউসেন আদর্শ ধীরোদাত্ত প্রকৃতির বীর—মহাকাব্যের উপযুক্ত নায়ক। বঙ্গসাহিত্যে এরূপ চরিত্র দুর্ল্লভ। জিতেন্দ্রিয়তায় লাউসেনের চরিত্র একমাত্র গোরক্ষনাথের সহিত তুলিত হইতে পারে। আর একনিষ্ঠতা ও তেজস্বিতায় এই চরিত্রকে চাঁদসদাগরের চরিত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। রামায়ণের রামচন্দ্র চরিত্রের সঙ্গে লাউসেন চরিত্রের অনেক বিষয়ে সাম্য আছে। এইরূপ চরিত্রকে দেবানুগৃহীত এবং দেবতার হাতের পুতুল বানাইয়া নষ্টই করা হইয়াছে। চাঁদ সদাগরের চরিত্রের মর্য্যাদাও এইরূপ দেবতার দোহাই দিয়া ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। দেবতার অনুগ্রহকে Poetic & religious convention মাত্র বলিয়া বাদ দিলে লাউসেনের চরিত্র বঙ্গসাহিত্যে আদর্শবীর-চরিত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এই চরিত্রটির কলাসম্মত ক্রমোন্মেষ কবি দেখান নাই। সে কলাকৌশল সেকালের কবিদের অজ্ঞাত ছিল। নানা প্রকার শৌর্য্য ও মহত্ত্বের দৃষ্টান্তই কবি দিয়াছেন—সেইগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া চরিত্রটিকে মনের শ্রদ্ধামাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে।

রঞ্জাবতী ছিলেন রাজপুত-রমণীর মতই বীরাঙ্গনা—তেজস্বিনী, তপস্বিনী, মহাসতী। সন্তান লাভ করিয়া ইনি হইলেন খাঁটি বাঙ্গালী জননী—বাংলা সাহিত্যের যশোদা, মেনকা, খুল্লনা. সনকার সঙ্গে সমশ্রেণী ভুক্তা। বীরপুত্রের সুযোগ্যা জননী প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নাই।

কাশীরামের মহাভারতে জনা, কাশীরামের সৃষ্ট চরিত্র না হইলেও একমাত্র দৃষ্টান্ত। রঞ্জাবতী যে তপস্যা ও আত্মনিগ্রহের দৃঢ়তাবলে লাউসেনের মত পুত্রলাভ করিয়াছিলেন—সেই দৃঢ়তা যদি তাঁহার চরিত্রে বরাবর অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে তিনি বীরপুত্রের যোগ্যা জননীর মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিতেন এবং সেই মর্য্যাদায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোকিত হইতে পারিত। স্নেহাতিশয্যের দুর্ব্বলতা থাকিলেও রঞ্জাবতী চরিত্রটি বঙ্গসাহিত্যে উপেক্ষণীয় নয়।

অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে হরিহর বাইতির চরিত্র চমৎকার। লাউসেন পূর্ব্বের সূর্য্যের পশ্চিমে উদয় দেখাইলেন। তাহার সাক্ষী ছিল হরিহর বাইতি। সে যাহাতে গৌড়েশ্বরের সভায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সেজন্য সে মহামদকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইল, মিথ্যা না বলিলে তাহার প্রাণ যাইবে। হরিহর প্রাণভয়ে ও মহামদের তাড়নায় মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হইল। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু সে রাজদরবারে দাঁড়াইয়া কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারিল না, সত্যই বলিয়া ফেলিল। সে একজন নিম্নশ্রেণীর লোক। কিন্তু তাহার ধর্ম্মজ্ঞান সকলকেই লজ্জা দিল। অথচ সাধারণ মানুষের দুর্ব্বলতা হইতেও তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই। সে সারারাত্রি ধরিয়া বিবেকের সহিত সংগ্রাম করিয়াই শেষে সত্যের পথে বিজয়ী হইয়াছে অর্থাৎ তাহাকে জীবন্ত বাস্তবানুগ মানুষই করা হইয়াছে। সে শূলে আরোপিত হইয়া যে কথা বলিল—তাহার তুলনাও প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য দুর্লভ।

শূলিতে পরাণ যায় আমি নাহি কাঁদি তায়, কাঁদিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস মিথ্যাবাদে হয় নাশ, ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে কহে লোকে।

ধর্ম্মমঙ্গলকাহিনীটার দশভাগের নয় ভাগ অবাস্তব, আষাঢ়ে, আজগুবি। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিকতার সন্ধান করা বিড়ম্বনা।

সমস্তকাব্যখানিতে শুধু দেখানো হইয়াছে—ধর্ম্মের কৃপায় কি না হয়? ধর্ম্মের ভক্ত ও অনুগৃহীত কত অসাধ্য সাধনইনা করিতে পারে। অসাধ্যসাধনই যখন দেখাইতে হইবে—তখন বাস্তবতার সীমার মধ্যে থাকিলে চলিবে কেন? তাই একধার হইতে যত আজগবী অদ্ভুত সমস্যা, পরীক্ষা ও আপদবিপদের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য দেখানো হইয়াছে। বিপৎ সঙ্কট সৃষ্টির জন্যই মহামদের অবতারণার প্রয়োজন হইয়াছে এবং রাজাকেও মহামদের হাতের পুতুল করা হইয়াছে।

বহু রাজা মিলাইয়া গৌড়েশ্বরটির সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলের রাজাটি এমনই অপদার্থ যে, তিনি ধর্ম্মপালত নহেনই—পালবংশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন রাজাই নহেন। কোন রাজা কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন, কোন রাজা লক্ষ্মণসেনের মত শ্যালকতন্ত্রশাসনের অধীন ছিলেন, কোন রাজা ঈশ্বর ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কোন রাজা বুড়াবয়সে তরুণীবিবাহের জন্য ক্ষেপিয়াছিলেন, কোন রাজা ধর্ম্মপূজা করিতেন ঘটা করিয়া—এমনি বহু রাজার সম্বন্ধে জনশ্রুতি মিলাইয়া ধর্ম্মমঙ্গলের অপদার্থ রাজাটির পরিকল্পনা হইয়াছে।

লাউসেন অসংস্কৃত নাম—ইহার সংস্কৃত নাম লবসেন, কি লাবুসেন, কি রাহুসেন, কি নয় সেন, কি রঘুসেন. কি লঘুসেন তাহা বলা যায় না। এইনামে একজন ধর্ম্মপূজক বীরপুরুষ বৌদ্ধ বাংলায় বোধ হয় ছিল। ধর্ম্মমাহাত্ম্যকীর্ত্তনের জন্য ধর্ম্মের কৃপায় অসামান্য কিছু করানোর প্রয়োজন। পশ্চিমে সূর্য্যোদয়, মৃতের পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি যেমন তাঁহাতে আরোপ করা হইয়াছে—তেমনি অন্যান্য বীরপুরুষদের কামরূপ জয়, ইছাইবধ ইত্যাদিও হয়ত তাঁহাতে আরোপ করা হইয়াছে।

ইছাই ঘোষ নামে একজন বিদ্রোহী-সামন্ত রাঢ় অঞ্চলে হয়ত ছিল—

কিন্তু সে পালবংশের কোন রাজার সময়ে তাহা জানা যায় না। তবে এইটুকু এই প্রসঙ্গ হইতে বুঝা যায় যে, চণ্ডীভক্তদের সঙ্গে ধর্ম্মভক্তদের একটা দ্বন্দ্বসংঘর্ষ প্রায়ই হইত। চণ্ডীপূজার প্রসার বাড়িলে ধর্ম্মপূজার প্রসার কমিয়া যায়—অতএব ভক্তদের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি হওয়াই স্বাভাবিক। ধর্ম্মের বল খুব বড় করিয়া দেখাইতে হইলে প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতার বলও খুব বড় করিয়া দেখাইতে হয়। তাই ইছাইকে এমন বলবান্ করা হইয়াছে যে মহাপরাক্রান্ত গৌড়েশ্বরও তাঁহার কাছে দুর্ব্বল।

সহদেবের ধর্ম্মপুরাণ বা ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের কাহিনী নাই। ইহার কাব্য সাহিত্যাংশে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। সাহিত্যসৃষ্টি ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণনাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য।

ইহাতে ধর্ম্মের শুভঙ্কর মাহাত্ম্য অপেক্ষা অশুভঙ্করী মহাশক্তির কথাই বেশী। সহদেব ভয় দেখাইয়া লোককে ধর্ম্মপূজায় প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহার কাব্যে অমরানগরের অধিপতি ভূমিচন্দ্র, শ্রীধর, জাজপুরের ব্রাহ্মণগণ ও হরিশ্চন্দ্র রাজা ধর্ম্মনিন্দার ফলে ধনপতি চাঁদ সদাগরের মত অশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতেছে। ধর্ম্মের নিষ্ঠুর মূর্ত্তি ইহার কাব্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। নিরঞ্জনের রুষ্মা ধর্ম্মের প্রতিহিংসিকা প্রবৃত্তি দেখাইবার জন্যই রচিত।

হিন্দু দেবদেবীর উপাখ্যানের সহিত কালুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ ইত্যাদি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যের কাহিনী, তাহাদের অলৌকিক শক্তির বিবরণ ইত্যাদি তাঁহার কাব্যে আছে। হিন্দু দেব-দেবীর সহিত ধর্ম্মঠাকুরকে মিলাইবার প্রয়াসও আছে। গোরক্ষবিজয় কাব্যের মত ইহাতে নারীর মোহিনী শক্তির নিন্দা করা হইয়াছে এবং আত্মসংযমের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। নারীর মোহিনী মায়ায় আবদ্ধ

হইয়া বহু মহাপুরুষের পদস্খলন হয়, সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে হইলে কি করিয়া মায়াজাল এড়াইয়া চলিতে হইবে, তাহার যথেষ্ট উপদেশ ইহাতে আছে। কোন কোন উপদেশ গোরক্ষবিজয়ের মত প্রহেলিকার ভঙ্গীতে রচিত। এই প্রহেলিকাগুলিতে ব্রত-ভঙ্গজনিত একটা বেদনার সুর আমাদের চিত্তকে উদাস করিয়া দেয়। যেমন—

গুরুদেব; নিবেদি তোমার রাঙা পায়।
পুতকীর দুধে সিন্ধু উথলিল, পর্ব্বত ভাসিয়া যায়।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল পল্লব মঞ্জরিল পাষাণ বিঁধিল ঘুণে।
গুরুহে, বুঝহ আপন গুণে।
হের দেখ বাঘিনী আসে।
নেতের আঁচলে চর্ম্মমণ্ডিত করি ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হইল ছেলে চায় পায়রার দুধ।
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু কাঁকড়া ধরিল কাঁচি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাঁচি।
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু আঁধার হইল পুরী।
সহদেব গায় ভাবি কালুরায় শরীরবর্ণন চাতুরী।

মীননাথের মত কঠোর তপস্বী কতকগুলো 'নেতের আঁচল মোড়া বাঘিনীর' বশীভূত হইয়া জীবনের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিল—এই বেদনার কথাই এই প্রহেলিকার ইঙ্গনা। গোরক্ষনাথ প্রহেলিকার দ্বারা গুরুকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার চৈতন্য উদ্বোধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

বৌদ্ধ প্রভাব ও মঙ্গলকাব্যে শিব

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে শিবের গানও আছে। মহাযানী বৌদ্ধগণ শিবপূজাও করিতেন। বৌদ্ধসাহিত্যে শিবের স্থান বুদ্ধ বা ধর্ম্মের নীচে। শিব ধর্ম্মেরই আজ্ঞাবহ। শিব ছিলেন চাষবাসের দেবতা। বৌদ্ধ সাহিত্যিকগণ শিবকে দিয়া চাষ করাইয়াছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে শিব তাঁহার পত্নীর সহিত ঘরে অন্নাভাব লইয়া কেবল কলহ করেন এবং ভিক্ষা করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। শিবের এই চিত্র পরবর্ত্তী হিন্দু কবিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৭শ শতাব্দীতে রামকৃষ্ণ দেব ও ১৮শ শতাব্দীতে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের শিবায়ন গ্রন্থে বৌদ্ধ কবিদের পরিকল্পিত ভিক্ষুক গৃহস্থ শিবের জীবন-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন।

বৌদ্ধ নাই দেশে, তাই বলিয়া দেবতার ত অনাদর হইতে পারে না। হিন্দুরা ধর্ম্মরাজকে বুড়োশিব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ধর্ম্মঠাকুরের গাজন ও চড়ক শিবের গাজন ও চড়কে পরিণত হইল। শিবের গাজন ও ধর্ম্মের গাজন মিলিয়া মালদহে গম্ভীরা-উৎসবের উৎপত্তি। চড়ক-গাজনের গান ও গম্ভীরার গান বৌদ্ধসাহিত্যেরই পরিণতি। বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল বটে, কিন্তু ধর্ম্মদেবতার মাহাত্ম্যমূলক উপাখ্যান দেশে প্রচলিত থাকিল। হিন্দু কবিগণ ধর্ম্মঠাকুরের উপাখ্যান লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ময়ূরভট্ট ধর্ম্মমঙ্গলের আদিকবি। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন কিনা জানা যায় না, তবে তিনি সাহিত্যে ধর্ম্মের উপাখ্যানের

প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থ অবলম্বনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু গোবিন্দরাম ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। তারপর ক্রমে রূপরাম, মাণিক গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, রামচন্দ্র বন্দ্যোঃ, রামনারায়ণ, ঘনরাম, নরসিংহ, সহদেব চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি বহু হিন্দু কবি ধর্ম্মমঙ্গলের গান লিখিয়া গিয়াছেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মমঙ্গলের ধারা চলিয়া আসিয়াছে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে বজ্রতারা, আর্য্যতারা, আদ্যা, বজ্রেশ্বরী, বিশালাক্ষী ইত্যাদি নামে যে দেবী পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন—তিনিই হিন্দুর ভবানী দেবীর সহিত মিলিত হইয়া চণ্ডীরূপ ধরিয়াছেন। শিবঠাকুর আর ধর্ম্মঠাকুর যেমন এক হইয়া গিয়াছে—নিরঞ্জন-পত্নী আদ্যাও তেমনি শিবজায়া চণ্ডী বা শঙ্করীর সহিত এক হইয়া গিয়াছেন।*

ধর্ম্মঠাকুরের নাম পরবর্ত্তী চণ্ডীকাব্যেও আছে। অন্যান্য দেবতার সহিত ধর্ম্মদেবতার স্তব করিয়া হিন্দুকবিগণ মঙ্গলকাব্য রচনা করিতেন।

মনসামঙ্গলেও বৌদ্ধ প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। মনসামঙ্গলে দৈবজ্ঞ আচার্য্যদের যে শক্তির উল্লেখ আছে--তাহা বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত বলিয়া মনে হয়। মনসামঙ্গলে চাঁদসদাগরের

---

* শীতলামঙ্গলকাব্যের শীতলা দেবী বৌদ্ধ-ডোমপুরোহিতদের রূপান্তরিতা হ্বষিতীদেবী। আজিও ডোমশ্রেণীর লোকেরা শীতলার পূজারী ও শীতলামঙ্গলার গায়ক। মনীষী পাঁচকড়িবাবু বলেন—"বৌদ্ধমত, সহজমত, বাশুলী দেবীর মত প্রচ্ছন্নভাবে বাংলার মহিলাদের ব্রতমালার মধ্যে নিহিত আছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"চণ্ডীউপাসক মাত্রই বজ্রযানী বৌদ্ধ ছিলেন। চণ্ডী, শুভচণ্ডী (সুবচনী), কুলইচণ্ডী, বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজিতা চণ্ডী—সবই বৌদ্ধদেবীর রূপান্তর। এই চণ্ডীপূজায় বর্ণাশ্রমী পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না।"

যে মহাজ্ঞানের কথা আছে—তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের মহাজ্ঞানেরই অনুরূপ। হেঁতালের লাঠি, মনপবনের নৌকা ইত্যাদি বৌদ্ধ সাহিত্যেরই সামগ্রী। মনসামঙ্গলের শিবের মধ্যেও ধর্ম্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন আছেন।

ইহা ছাড়া, কেবল মনসামঙ্গলে নয়—সকল মঙ্গলকাব্যেই ব্রাহ্মণ জাতিকে কতকটা উপেক্ষা করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণেতর জাতির ভক্তি ও সদাচারের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ইহা বৌদ্ধ প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ সহজযানীদের মতে জীবাত্মার সহজধর্ম্মই অনুরাগ, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহা বেশ মিলে। বৌদ্ধসমাজের সহিত বৈষ্ণবসমাজের আচার আচরণে অনেক সাদৃশ্য আছে। সহজিয়া বৈষ্ণব সাহিত্য এই হিসাবে বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বারা আংশিকভাবে প্রভাবান্বিত। বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে বাহ্যকরণ ও শারীরসাধন প্রক্রিয়ার একটা দিক আছে। এই দিকটা বৌদ্ধতন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনপদ্ধতিরই রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব সাহিত্য ও সহজিয়া সাহিত্যের গুরুবাদ বৌদ্ধ সাহিত্য হইতেই সংক্রামিত। বৌদ্ধ সাহিত্যের দেহাত্মবাদ ও মহাসুখবাদ সহজিয়া সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মপূজকেরা সাহিত্যে শিবের যে রূপ দিয়াছেন, শিবমঙ্গল কাব্যগুলিতে দক্ষের শিবনিন্দায় সেই রূপই ফুটিয়াছে। কেবল ভারতচন্দ্র শ্লেষ অলঙ্কারের সাহায্যে শিবের নির্গুণ পরব্রহ্মত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণদেবের শিবায়নে দক্ষ শিবকে গালি দিয়া বলিতেছেন—

শুন মাগো সত্যবতী পাগল তোমার পতি নিমন্ত্রণ না করিনু লাজে।
কদাচার দিগম্বর অস্থিমালা অমঙ্গল দেবের সমাজে নাহি সাজে।
শ্মশানের ছাই মাথে ভূতপ্রেত সঙ্গে থাকে চূড়ামণি কলঙ্কের কলা।
ধুস্তুর তাহার ভক্ষ্য সিদ্ধিতে ঘূর্ণিত চক্ষ গরল যোড়িল সব গলা।

পুরাণের শিব আর্য্যদের শিব, তিনি রজতগিরিনিভ ধ্যানস্তব্ধ, তিনি তাণ্ডব নৃত্য করেন, পঞ্চমুখে আগম-নিগমের ব্যাখ্যা করেন। দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। * সতীদেহ স্কন্ধে ধরিয়া বিশ্বময় ভ্রমণ করেন, তপস্যায়

*দক্ষযজ্ঞনাশ মঙ্গলকাব্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ইহাতেও আর্য্যদের পরিকল্পিত রুদ্রদেব ও অনার্য্যদের পরিকল্পিত শ্মশানচারী শিবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞনাশের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা এই—

শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত রুদ্রের উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ইত্যাদির রুদ্রতার সমবায়ে বেদের এই রুদ্র-দেবতার পরিকল্পনা। বেদে সর্ব্ব দেবতার রুদ্রাভিব্যক্তির সমষ্টি-রূপকে পৃথক দেবতা বলিয়া যজ্ঞভাগ দান করা হইয়াছে। বেদেই তিনি ঈশান, মহাদেব, সর্ব্ব, ভব, উগ্র, পশুপতি ইত্যাদি অভিধা লাভ করিয়াছেন।

অনার্য্য লিঙ্গোপাসকগণের শিব শ্মশানচারী, প্রমথনাথ, কৃত্তিবাস, বিভূতিভূষণ, ফণিভূষণ, গিরিশ, দিগম্বর। ইনি পশুপতিও বটেন —তবে বৈদিক অর্থে নয়। পশুহন্তা ব্যাধদের দেবতা বলিয়া ইনি পশুপতি। ঋগ্‌বেদে যে লিঙ্গোপাসকদের উপদ্রব হইতে যজ্ঞরক্ষার কথা আছে, তাহাদের দেবতা এই শিব। অনার্য্যদের দেবতা বলিয়া ইনি যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন নাই। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মহাদেব গৌরীকে বলিতেছে—

সুরৈরেব মহাভাগে পূর্ব্বমেতদনুষ্ঠিতম্‌
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মম ন ভাগ উপকল্পিতঃ ॥
পূর্ব্বোপায়োপপন্নেন মার্গেণ বরবর্ণিনি।
ন মে সুরাঃ প্রযচ্ছন্তি ভাগং যজ্ঞস্য ধর্ম্মতঃ ॥

তুষ্ট হইয়া যত অসুরদানবকে এমন বর দেন যে দেবতারা বিপন্ন হইয়া চরণে শরণাপন্ন হয়—স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হয়। ত্রিপুরদৈত্যকে নিজহস্তে বধ করেন, কন্দর্পকে ভস্ম করেন ইত্যাদি। আর বাংলা সাহিত্যের শিব ভোলানাথ, দরিদ্র ভিখারী,

এই শিব দক্ষযজ্ঞনাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যদের যজ্ঞভাগ না পাইয়া অসন্তুষ্ট ছিলেন না। এই শিবের পূজায় ব্রাহ্মণপুরোহিতের প্রয়োজন ছিল না। হিন্দুজাতির গণ্ডীর মধ্যে আগত অনার্য্যজাতির লোকেরা নিজেরাই এই শিবের পূজা করিত। রাক্ষসদৈত্যদানবেরও উপাস্য এই শিব। পদ্মপুরাণে আছে—

দ্রব্যমন্নং ফলং তোয়ং শিবস্য ন স্পৃশেৎ ক্বচিৎ।
ন নয়েচ্ছিব-নির্ম্মাল্যং কূপে সর্ব্বং বিনিক্ষিপেৎ॥

এমন কি বৈদিক রুদ্রদেবতাকেও ভ্রমক্রমে ব্রাহ্মণেতর জাতির দেবতা বলা হইয়াছে—

রুদ্রার্চ্চনং ত্রিপুণ্ড্রশ্চ পুরাণেষ্বব গীয়তে।
ক্ষত্রবিট্-শূদ্র-জাতীনাং নেতরেষাং তদুচ্যতে।—বশিষ্ঠস্মৃতি

দক্ষযজ্ঞবিনাশের দ্বারা সূচিত হয়, অনার্য্যদের শিব বৈদিক রুদ্রদেবের সহিত একাত্ম হইয়া বৈদিক দেবমণ্ডলে স্থান পাইলেন—ব্রাহ্মণদেরও পূজ্য হইলেন।

অনার্য্যদের শিব ছিলেন পিনাকপাণি। তিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের পর নিজের অনার্য্যচিহ্ন ধনু ত্যাগ করিয়া শূলপাণি হইলেন। আর্য্য রুদ্রের সহিত অনার্য্য শিবের একাত্মকতা সাধনেরজন্যই সত্যরূপা সতীর আবির্ভাব। তাঁহার কার্য্যসাধনের পর তিনি পীঠতীর্থের বিস্তার-রূপে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইলেন। শিব সমগ্র ভারতে ভৈরবরূপে ভবানীর সহিত পূজিত হইলেন। অনার্য্যদের দেব-প্রতীক লিঙ্গমূর্ত্তিও

ষাঁড়ে চড়িয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান—ভাঙধুতুরা খান, বৃদ্ধ বয়সে বালিকা গৌরীকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, বিবাহসভায় তাঁহার বাঘছাল খসিয়া পড়ে, গৌরীর সঙ্গে কোন্দল করেন, গৃহে অন্নাভাবের জন্য গৌরীর গঞ্জনা সহ্য করেন, অভিমানে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, খাইতে খুব ভালবাসেন, তাঁহার আহারে খুব লোভ, তিনি পেটের দায়ে চাষ করেন, ইন্দ্রের কাছে জমি কবলা করিয়া লন, ডাঁশমশাজোঁকের কামড় সহ্য করেন, নারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গৌরীকে জব্দ করিতে চান, শাঁখারী সাজিয়া গৌরীকে ছলনা করিতে যান। তরুণী ভার্য্যাকে বাপের বাড়ী পাঠাইতে চাহেন না—পাঠাইলেও তিন দিনের জন্য।

নূতন ব্যাখ্যা ও সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত যুগনদ্ধ পুরুষের প্রতীকত্ব লাভ করিল, শিবের বেশভূষা আচার-আচরণও অভিনব আর্য্যসম্মত ব্যাখ্যা লাভ করিল।

আর্য্য ও অনার্য্যের উপাসনা-পদ্ধতির প্রথম মিলন এই শিবের মহাদেবত্বের প্রতিষ্ঠায়। এইখানে এক্থাও বলিয়া রাখি—অর্ব্বাচীন যুগের বৌদ্ধগণ যে শিবকে প্রধান দেবতা রূপে স্বীকার করিয়ছিল এবং ধর্ম্মঠাকুর যে শিবের মধ্যে সহজে আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইয়াছিল—শিব আর্য্যেতরদের দেবতা ছিলেন বলিয়া এবং সম্পূর্ণ আর্য্যপদ্ধতিতে তিনি উপাসিত হইতেন না বলিয়া।

দক্ষযজ্ঞনাশে শিবের বলপ্রয়োগের অর্থ হইতেছে এই—দেশে শিবপূজক আর্য্যেতর জাতির লোকের সংখ্যা এতই বেশী ছিল যে—তাহাদের প্রভাব বৈদিকধর্ম্মের উপর অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্ম দেবতারও শিবত্বলাভ এই ভাবেই ঘটিয়াছে।

এই শিব প্রথমে অনার্য্যদের, পরে বৌদ্ধদের শিব। বাঙ্গালী কবি বাঙ্গালীর আচার আচরণ, তাহার সংসারের সুখদুঃখ, তাহার বৃত্তিপ্রবৃত্তি আরোপ করিয়া এই শিবকে লইয়া রঙ্গব্যঙ্গ করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন—এই শিবের সঙ্গে বাঙ্গালী নাচিয়া কুঁদিয়া চড়কগাজনের গান গাহিয়াছে। যাত্রার অভিনয়ে এই শিবকে নাচাইয়াছে। আর বাঙ্গালীর বালিকারা ব্রতের ছলে তপস্যা করিয়া এই শিবের মত আত্মভোলা স্বামীই ছড়া গাহিয়া প্রার্থনা করে—বাঙ্গালী জননীরা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে এই শিবের কথা স্মরণ করিয়া কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠায়। এই শিবের গৃহিণী বলিয়া উমার মাধুর্য্য ও কারুণ্য আগমনীবিজয়ার গানের সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালী কবি শিবকে এমন করিয়া জাতীয় মনের মাধুরী দিয়া গড়িয়াছে যে তাহাকে ভালবাসা চলে—তাহাকে উপাসনা করা চলে না।

বৌদ্ধ ধর্ম্মমতের সহিত হিন্দুধর্ম্মমতের সমন্বয়ের দিনে ধর্ম্মসাহিত্যে শিব স্থান লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মদেবতার অধীনে। শূন্যপুরাণে শিবকে চাষী বানানো হইয়াছে—তারপর হইতে তাহাকে বাগদী চোয়াড়, কোচদের দলে চাষ করিতে হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুর সর্ব্বেশ্বর শিবের কৃষকত্বেই পর্য্যবসান হইতে পারে না। ত্রিলোচন তিনরূপে দেখা দিলেন। একরূপে তিনি বৌদ্ধ প্রভাবের অবসানের সঙ্গে ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া ধর্ম্মরাজ হইলেন। আজিও তিনি চড়কে গাজনে বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে পূজা লাভ করিতেছেন। আর একরূপে তিনি বঙ্গীয় কবিদের উপাস্য না হইয়া উপহাস্য হইয়া রহিলেন। এই শিবই বঙ্গসাহিত্যে কিছু রস সঞ্চার করিয়াছেন—একদিকে যেমন হাস্যরসের, অন্যদিকে তেমনি উমার প্রসঙ্গে করুণরসের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আর একরূপে ইনি হিন্দুপুরাণের ব্রহ্মময় শিব। এইরূপে তিনি

জ্ঞানিগণের আরাধ্য। এই শিবই চাঁদসদাগরের উপাস্য। মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের কাছে কিছু-না-কিছু প্রার্থনীয় আছে, শিবের কাছে প্রার্থনীয় কিছু নাই। তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভক্তি।

ইঁহার ভক্ত যাঁহারা ছিলেন—তাঁহাদের সঙ্গেই দেশে শাক্তসম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। বৌদ্ধ কবিরা, শিবকে কৃষকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, মঙ্গলকাব্যকারগণ ও গীতকারগণ শিবের সেই রূপ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনিই ক্ষেত্রনাথ বা ক্ষেত্রপাল। তিনি নিজেই ভিখারী।

'কি বর মাগিবে বল ভিখারীর ঠাঞি।
ক্ষমতা থাকিলে তার গৃহে অন্ন নাই'॥

রামাই পণ্ডিত ভক্তের মুখ দিয়া শিবকে তাঁতী ও চাষী হইতে বলিয়াছেন।

আহ্মার বচনে গোসাঞি তুমি চাষ চষ।
কখন অন্ন হএ গোসাঞি কখন উপবস।
ঘরে অন্ন থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাবে।
অন্নের বিহনে পরভু কত দুঃখ পাবে॥
কাপাস চষহ পরভু পরিবে কাপড়।
কতবা পরিবে গোসাঞি কেঁদো বাঘের ছড়।

এখানে উপাস্যের দুঃখে বিগলিত ভক্তের চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতেছে। এখানে ভক্তি—সমবেদনা ও করুণার রূপ ধরিতেছে। ইহাও একপ্রকার প্রেমেরই অভিব্যক্তি। কবিরাজ গোস্বামীর কথা মনে পড়ে—

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

শিবের প্রতি এই মনোভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিলুপ্ত ত বটেই, মানবের সাধারণ শক্তিও তাঁহাতে আরোপ করা হইল না। শিব এখানে

শিশুর মতই অসহায়। রসবিচারের স্তরে বাৎসল্যরসের নীচেই ইঁহার স্থান হওয়া উচিত। যে ঐশ্বর্য্য-সম্পর্কহীন সর্ব্বসংস্কারমুক্তিই প্রেমধর্ম্মের আদর্শ—উপাস্যের মধ্যে তাহারই আদর্শ ই-ত চাই। এই আদর্শ মানুষের মধ্যে শ্রীচৈতন্যে,—দেবতার মধ্যে এই শিবেই ত পাওয়া যায়।

তাহা ছাড়া, বাঙালী জাতির পাতিব্রত্যের চরম আদর্শের পরমাশ্রয় হইয়াছে এই অতিদরিদ্র বৃদ্ধ ভিক্ষুক শিবের অকিঞ্চনতা ও অনাসক্তি। চির দরিদ্র বাঙ্গালীসংসারের কন্যাদের পাতিব্রত্যের কঠোর পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন হইয়াছিল এইরূপ দরিদ্র সংসারধর্ম্মে উদাসীন শিবের।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার প্রাচীন কাব্যের শিবচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন—

দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্য-শৈলটাকে বেষ্টন করিয়া—হরগৌরীর কাহিনী নানাদিকে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। কখনও বা শ্বশুরবাড়ীর স্নেহ এই দারিদ্র্যকে আঘাত করিতেছে—কখনও বা স্ত্রীপুত্রের প্রেম এই দারিদ্র্যের উপর প্রতিহত হইতেছে। বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে ও দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য বা আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছেন —দরিদ্র সমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় সান্ত্বনা আর নাই। আমার সম্বল নাই যে বলে সেই গরিব, আমার আবশ্যক নাই যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের? শিব ত তাহারই আদর্শ।

স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনিকন্যা দরিদ্র পতি ও নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠে,

তখন গৃহধর্ম্ম কম্পান্বিত হইতে থাকে। দাম্পত্যের এই দুর্গ্রহ কেমন করিয়া কাটিয়া যায়, হর-গৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

সতী স্ত্রীর অটল শ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান, তাহার আর একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতামোচন—মাহাত্ম্যকীর্ত্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন এবং শ্মশানচারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্য বন্ধনের আর একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্দ্ধক্য ও কুরূপতা। হরগৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহ-সভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন—তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপযৌবন বসনভূষণে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক রূপযৌবন প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে। তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তিপ্রীতির উপর নির্ভর করে। হরগৌরীর কাহিনী সমস্ত বিশ্বের উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। স্বামী দীন-দরিদ্র বৃদ্ধ কুরূপ যেমনি হউক, স্ত্রী রূপযৌবন, ভক্তিপ্রীতি, ক্ষমা-ধৈর্য্য ও তেজোগর্ব্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারীর অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্পদলক্ষ্মী।"

ব্রহ্মময় মহাযোগী শিব জ্ঞানিগণের উপাস্য আর বৌদ্ধ শিব কবিগণের উপহাস্য, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদের চিরদিন অন্তরঙ্গ জন; নিম্নের কবিতায় সেই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

ভদ্রপাড়ায় ভিখ দিলে না আবার ফিরে এলে?
বেশ করেছ। ত্রিশূলখানা কোথায় এলে ফেলে?
আপদ গেছে। হেথায় থাক ঘুরতে কেন যাবে?
আমরা যদি দু মুঠো পাই তুমিও তাই পাবে।

খেটে খাবে? কি কাজ তুমি কর্‌তে বল' পারো!
কাজ দিয়ে ত দেখা গেছে কাজের কথা ছাড়ো।
আগ্‌লাতে ক্ষেত দিলে তামাম ফসল সাবাড় হয়।
ধানের বোঝা বইলে আধেক জটার ভিতর রয়।
গাই চরাতে দিলে বাছুর দুধ পিয়ে সব খায়,
সেঁচতে দিলে, সেচন ফেলে নাচন তোমার পায়!
কোদাল তোমার হাতে দিতে ভরসা কি হয় কারো?
আগাছা সব রেখে তুমি গাছের দফা সারো।
হল চালাবে নিজের হাতে? তবেই সর্ব্বনাশ!
ষাঁড়ের পিঠে চড়েই বসো কর্‌তে দিলে চাষ।
কাজের কথা আর তুলো না। যতই কাঙাল হই
তোমায় দুটো অন্ন দিতে আমরা কাতর নই।
বল্‌ছি ঠাকুর বাঘের চামড়া হবে না আর পরা,
তাঁতী খুড়োয় ব'লে তোমার বুনিয়ে দেব ধড়া।
মড়ার খুলি দাও ফেলে, ছি! দিচ্ছি পিতল লোটা,
যত পারো ওতেই খেও সিদ্ধি হ'লে ঘোঁটা।
আমরা তোমায় ভালবাসি কি আছে অই মুখে,
ইচ্ছা করে তোমায় ঠাকুর আঁকড়ে ধরি বুকে।
ভদ্রপাড়ায় আর যেও না ক্ষেপায় ওরা বড়,
মোদের সাথেই তামাক টানো গল্পগুজব কর'।
বাজাও শিঙা, নৃত্য কর, মোদের আঙিনাতে
ডমরু বাজায়ে মোরা নাচ্‌ব সাথে সাথে।

কাশীরাম দাস

মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র। কেহ কেহ বলেন ইহার নাম ছিল পরমেশ্বর। ইহার কাব্যের নাম পাণ্ডব-বিজয়। ইহা মহাভারতের গল্পের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক এক কবির দ্বারা মহাভারত অনুবাদ করান। এই মহাভারতকে পরাগলী মহাভারতও বলা হয়। ইহার পর দ্বিজ অভিরাম মহাভারতের অনুবাদ করেন। হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের অন্যতর সেনাপতি ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ করেন। ইহাদের পর যথাক্রমে—রামচন্দ্র খান, দ্বিজ রঘুনাথ, ঘনশ্যাম দাস, রাজেন্দ্র দাস ও নিত্যানন্দ ঘোষ মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। কাশীরামের মহাভারতের প্রচারের পূর্ব্বে পশ্চিম বঙ্গে নিত্যানন্দের মহাভারতই প্রচলিত ছিল। গৌড়ীমঙ্গল নামে একখানি কাব্যে দেখা যায়—"অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।"

কাশীরাম বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মণ্ডকুমার সিংগি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক। কথিত আছে কাশীরাম বিরাটপর্ব্বের কতক অংশ পর্য্যন্ত লিখিয়া স্বর্গত হ'ন। তাহা যদি সত্য হয়, তবে বাকি অংশ অন্য কেহ লিখিয়া কাশীরামের ভণিতা বসাইয়াছে অথবা অন্যান্য কবির রচিত ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্ব কাশীরামের অসমাপ্ত মহাভারতে যোগ দিয়া গায়কেরা গ্রন্থখানিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছে। এসম্বন্ধে মতভেদ থাকায় এ আলোচনায় ক্ষান্ত হইলাম।*

*কাশীরাম দাসের ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, পুত্র কিংবা গায়কগণের কেহ—

কাশীরামের যুগে বাঙ্‌লা ভাষা একটা সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শে পৌঁছিয়াছিল। সে সময়ে যে কেহ পয়ার ছন্দে কবিতা লিখিলে অন্যের রচনা হইতে তাহার পার্থক্য ধরা যাইত না। অপরের রচনা কাশীরামের ভণিতায় যদি প্রচলিত মহাভারতে স্থান পাইয়া থাকে, তবে রচনাশৈলী হইতে তাহা ধরিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, প্রথম মুদ্রণের সময় সমগ্র মহাভারতখানির ভাষা এক রচনাভঙ্গীর অধীন হইয়াছে। প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের প্রথমাংশের কবিত্বই কাশীরামের নিজস্ব বলিয়া ধরিতে কোন বাধা নাই।

কাশীরামকে যাঁহারা মহাভারতের অনুবাদক মাত্র মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কাশীরাম ছিলেন একজন মহাকবি—একজন প্রথম শ্রেণীর রসস্রষ্টা। যাঁহারা দ্বৈপায়নের মূল মহাভারত পড়িয়াছেন—তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, কাশীরাম মূল মহাভারতের অনুবাদ করেন নাই—মূল মহাভারতের আখ্যানবস্তু ও ঘটনাপরম্পরাও সর্ব্বত্র অনুসরণ করেন নাই। উদাহরণস্বরূপ—জনা প্রবীরের উপাখ্যান, ভানুমতীর স্বয়ম্বর, লক্ষণা-হরণ, অর্জ্জুনকে মুকুটদানে দুর্য্যোধনের প্রতিশ্রুতি পালন ইত্যাদি মূল মহাভারতে নাই। এমন কি, সুভদ্রাহরণ মূল মহাভারতে যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে কাশীরাম সে ভাবে বর্ণনা করেন নাই। এইরূপে দেখা যাইবে, বহু স্থলেই কাশীরাম মূল মহাভারত অনুসরণ করেন নাই।

যিনিই মহাভারত সম্পূর্ণ করুন—তিনি নিজে সমস্তটাই লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারতগুলির কোন কোন অংশ ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে ইহাতে দেখা যায়। বিশেষতঃ শেষ পর্ব্বগুলিতে নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত হইতে কিছু কিছু অংশ গৃহীত হইয়াছে।

কাশীরাম নব নব উপাখ্যান কোথা হইতে পাইলেন? তিনি কি এই উপাখ্যানগুলির সৃষ্টিকর্ত্তা? কাশীরাম উপাখ্যানগুলির সৃষ্টি করেন নাই,—তাঁহার কৃতিত্ব রসসৃষ্টিতে। সম্ভবতঃ কাশীরাম কোন উপাখ্যানই মূল মহাভারত হইতে গ্রহণ করেন নাই—হয় ত তিনি সংস্কৃত মূল মহাভারত চোখেও দেখেন নাই। বাংলাদেশে মূল মহাভারত ছিল কি না সন্দেহ। বাঙ্গালা দেশে ছিল 'বৃহৎ ব্যাসসংহিতা'। বাঙ্গালা দেশ সংহিতার দেশ। বিবিধ শাস্ত্রের সারভাগ গ্রহণ করিয়া এ দেশে এক একখানি সংহিতা রচিত হইয়াছিল। এ দেশে তাহাই চলিত। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণেরও রচয়িতা। মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের প্রধান প্রধান উপাখ্যান লইয়া এ দেশে একটি সংহিতা রচিত হইয়াছিল—তাহারই নাম বৃহৎ ব্যাস-সংহিতা। এ দেশে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন—তাঁহাদিগকে ব্যাসব্রাহ্মণ বলিত। এই ব্যাসব্রাহ্মণগণ ছিলেন ঐ বৃহৎ ব্যাসসংহিতার ভাণ্ডারী। ব্যাসব্রাহ্মণগণ ঐ ব্যাসসংহিতা অবলম্বনে এ দেশের গ্রামে গ্রামে কথকতা করিতেন। সম্ভবতঃ কাশীরাম ঐ ব্যাসসংহিতা হইতেই তাঁহার মহাভারতের আখ্যানবস্তু আহরণ করেন। কথকগণের মুখের ব্যাখ্যা শুনিয়াই হউক অথবা ব্যাসসংহিতা দেখিয়াই হউক কাশীরাম তাঁহার মহাভারত রচনা করেন। তাহা ছাড়া, আগেকার লিখিত বাংলা মহাভারত ত ছিলই।

তিনি সংস্কৃত জানিতেন বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার মহাভারত হইতে এমন অনেক অংশের উৎকলন করা যাইতে পারে, যে-সকল অংশের ভাষার গাঢ়বন্ধতা ও পারিপাট্য সংস্কৃত জ্ঞানের সাক্ষ্য দেয়।

আবার এমনও হইতে পারে প্রাচীন সংস্কৃতানুগ বঙ্গসাহিত্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। যে ভাবেই হউক সংস্কৃত

আলঙ্কারিকতা সম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

দ্রৌপদীস্বয়ংবর-সভায় অর্জ্জুনকে দেখিয়া দ্বিজগণের উক্তি—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা। মুখরুচি কত শুচি ধরিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল। খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্মভুরু ললাটপ্রসর। কি আনন্দ গতি মন্দ জিনি কবিবর।
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত। করিকর যুগবর জানু সুবলিত।
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য মেঘে আবরিত।
অগ্নিঅংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত।

কবি নবমদিনের যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন সাঙ্গরূপক অলঙ্কারে—

বহিল শোণিত নদী অতি ভয়ঙ্কর। লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যমঘর।
নদীফেনসম শ্বেত ছত্র ভাসে তায়। কচ্ছপ হইল চর্ম্ম, অসি মীনপ্রায়।
শৈবালসমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে। শুশুকসমান গজ ডুবিছে তাহাতে।
গ্রাহসম মৃত অশ্ব ভাসি যায় বেগে। হস্তপদ তৃণসম ভাসে চতুর্দ্দিগে।
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর। অস্ত্রগণ বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর।

ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, একসময়ে সেখানকার ধর্ম্মযাজকগণ লাটিন বাইবেলের একাধিকারী ছিলেন। জনসাধারণ লাটিনের চর্চ্চা করিত না—তাহাদের মধ্যে লাটিন বাইবেলের ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম্মজগতে একাধিপত্য রক্ষা করিয়া চলিতেন। বাইবেলের যাহাতে ইংরাজীভাষায় অনুবাদ না হয় সেজন্য তাঁহারা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে কেহ লাটিন বাইবেলের ইংরাজী অনুবাদ করিবে সে ধর্ম্মের ধর্ম্মাধিকরণে দণ্ডনীয় হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত করাইয়াছিলেন। এদেশেও অনেকটা অনুরূপ ব্যবস্থাই ছিল।

সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শ্লোক রচনা করিয়া অনুশাসন দিয়াছিলেন—কোন শাস্ত্রের প্রাকৃত ভাষায় ব্যাখ্যান বা অনুবাদ করিলে রৌরব নরকে গমন করিতে হইবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের এই ব্যবস্থা যখন উদ্দণ্ড হইয়া ছিল—তখন কাশীরামের পক্ষে বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা কতটা বিপৎসঙ্কুল, তাহা সহজেই অনুমেয়। নসরৎশাহ, বিশেষতঃ পরাগল খাঁ ছুটিখাঁর মত পৃষ্ঠপোষক তাঁহার ছিল না।

একে সর্ব্বশাস্ত্রের সমবায়গ্রন্থ মহাভারতের বাঙ্গালাভাষায় রূপান্তর সাধন—তাহাতে আবার তিনি কাশীরাম শর্ম্মা নহেন, কাশীরাম দাস। এরূপ ক্ষেত্রে বিনাদণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে কাশীরাম কারণে অকারণে মহাভারতের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বন্দনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বাঙ্‌ময় উৎকোচ দান করিয়াছিলেন—তাহাতে কিছু ফল হইয়া থাকিতে পারে। কেহ কেহ বলেন তিনি এই দুঃসাহসিক কর্ম্ম পুরীধামে বসিয়া করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে জগন্নাথদেবের জয়গানই তাহার নিদর্শন।

উপাখ্যানবস্তু আহরণ করা বড কথা নয়। তাহাকে রসে উত্তীর্ণ করিয়া কাব্যে পরিণত করাই দুরূহ ব্যাপার। আখ্যানবস্তু কাঠামো বা কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়া রস, রক্তমাংস, শ্রীসৌষ্ঠব ও লাবণ্যে গঠিত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন্ত প্রতিমা গড়াই মহাকবির কৃতিত্ব। এদেশে এক আখ্যানবস্তু লইয়া যে বহু কবি কাব্য রচনা করিতেন—তাহা দুই একজনের হাতেই সৎকাব্যে পরিণত হইত। যিনি প্রকৃত কবি, তিনিই আখ্যানবস্তুর সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন।

কাশীরামের আগে আরও অনেকে মহাভারতের আখ্যান-বস্তু লইয়া

কাব্যরচনার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু কাশীরামের প্রয়াসই প্রকৃত কাব্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির হৃদয় জয় করিয়াছে এবং অমরতা লাভ করিয়াছে। যাঁহার রৌরব নরকে গমন করিবার কথা,—তিনি সর্ব্বজাতির পুণ্যহৃদয়ের অক্ষয় স্বর্গে বিরাজ করিতেছেন,—শুধু বিরাজ কেন,—রাজত্বই করিতেছেন।

অত্যধিক সংস্কৃতচর্চ্চার অনিবার্য্য ফল এই হয় যে, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের দৃষ্টি কাল হিসাবে হয় পূর্ব্বাভিমুখী এবং দেশ হিসাবে হয় পশ্চিমাভিমুখী। কথাটাকে একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। সংস্কৃত পণ্ডিতদের দৃষ্টি প্রাচীনকালের দিকে এমন ভাবে নিবদ্ধ হয় যে, তাঁহারা বর্ত্তমানকে ভাল করিয়া দেখিতে পান না। আর তাঁহাদের দৃষ্টি পশ্চিম ভারতের দিকে ধাবিত হইতে থাকে—ফলে, বাঙ্গালাদেশ অর্থাৎ নিজের দেশ তাঁহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ইহার কারণ, সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাচীনকাল ও পশ্চিম ভারতের নিবিড় ও গভীর সম্বন্ধ। সেকালে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহাদের প্রতিভা ছিল, রচনাশক্তি ছিল, রসসৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ছিল, বাঙ্গালী জাতি কি চান তাহা তাঁহারা জানিতেন না। দেশের অন্তরের সংবাদও তাঁহারা রাখিতেন না—তাই তাঁহারা দেশের জনসাধারণের জন্য কিছুই রচনা করিতেন না। তাঁহারা আপনাদের দেশের ভাষাকে প্রাকৃত ভাষা বলিয়া উপেক্ষাই করিতেন। তাই তাঁহারা যাহা কিছু লিখিতেন—সবই সংস্কৃত ভাষায়। আমার মনে হয়—দেশবাসীর অন্তরের সহিত তাঁহাদের যদি যোগ থাকিত—জাতীয় জীবনের সহিত যদি তাঁহাদের পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা স্বদেশের ভাষায়, স্বদেশের ভূষায়, স্বজাতির আশা আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের সারস্বত সাধনাকে রূপান্তরিত করিতেন।

ইহা হইতে মনে হয়, সৌভাগ্যক্রমে কাশীরাম বোধ হয় বিশেষ

যত্নের সহিত সংস্কৃত চর্চ্চা করেন নাই। তাই তিনি সাম-সাময়িক বাঙ্গালী জাতির অন্তরের সংবাদ জানিবার,—তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রসতৃষ্ণার সম্পূর্ণ সংবাদ রাখিবার সুযোগ ও অবসর পাইয়াছিলেন। আর যদি কাশীরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, কৃত্তিবাসের মত প্রকৃত কবিজন-সুলভ মহাপ্রাণতা ও উদার দৃষ্টিই তাঁহাকে সঙ্কীর্ণতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। যাহাই হউক, কাশীরাম বাঙ্গালী জাতির সম্পূর্ণ অন্তরঙ্গ জন। বাঙ্গালী জাতি কি চায় তাহা তিনি জানিতেন—তাই বাঙ্গালীর হৃদয়মাধুরী দিয়াই তিনি রসসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতের কাঠামোকে বাঙ্গালার মাটি দিয়াই পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার নিজস্ব শ্যামলতায় তাহার অঙ্গে লাবণ্য সঞ্চার করিয়াছেন। কাশীরামের কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রার মধ্যে বাঙ্গালার মায়ের বৎসল হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে। কাশীরামের পঞ্চ পাণ্ডবে বাঙ্গালী সংসারের সৌভ্রাত্রের মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভীষ্ম, বিদুর, নীলধ্বজ, দ্রৌপদী ইত্যাদি বহুচরিত্রের মুখ দিয়া কাশীরাম শ্রীকৃষ্ণের চরণে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়, সমগ্র গ্রন্থখানিতে ভক্তিধারা কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকট ভাবে প্রবাহিত। কাশীরাম শুধু মহাকবি নহেন—তিনি সাধক কবি ও ভক্ত কবি। তাই কাশীরামকে মহাকবি মাইকেল বলিয়াছেন—"হে কাশী; কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।" ভক্ত কবি বা সাধক কবি না হইলে বাঙ্গালার প্রাণের কবি হওয়া যায় না। মহাভারতের কাহিনী—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র,—ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়ের কাহিনী, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মজীবনের অভিব্যক্তি, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত। কাশীরামের ভক্তহৃদয়ের আকিঞ্চন,

ও আবেদন ইহাতে ধর্ম্মের সহিত কাব্যের মিলন-সাধন করিয়াছে। —আজ প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশের আপামর সাধারণ ভক্তিভরে পূতচিত্তে, নতশীর্ষে ইহা শ্রবণ করিয়া আসিতেছে।

'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে'—একথাটি দ্বৈপায়নের মহাভারত সম্বন্ধেই খাটে, বলা বাহুল্য কাশীরামের মহাভারত সম্বন্ধে নয়। কাশীরামের গ্রন্থে সংক্ষেপে মহাভারতের মূল কাহিনীটিই আছে। মূল মহাভারতে নানাচরিত্রের মুখে কথিত অসংখ্য কাহিনীর সমাবেশ আছে—সে সকলের মাত্র ২।৪টি কাশীরাম গ্রহণ করিয়াছেন। মূল মহাভারত বহু দার্শনিক বিচার, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, নীতিকথা, গৃহসূত্র, আধ্যাত্মিকতত্ত্ব ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ, কাশীরাম সে সমস্ত বর্জ্জন করিয়াছেন। কাশীরামের গ্রন্থ জনসাধারণের শিক্ষার জন্য, বিদ্বৎ সমাজের অধিগম্য কোন তত্ত্বকথা ইহাতে থাকিবার কথা নয়। সমগ্র গীতা মূল মহাভারতের অন্তর্গত। এই গীতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কাশীরাম কাহিনীর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কয়েক পংক্তিতে বিবৃত করিয়াছেন—

রাজ্যে কার্য্য নাই মম, জীবন অসার।
কাহার নিমিত্ত করি বংশের সংহার।
এত বলি ধনঞ্জয় ত্যজি ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া বসিলেন রথোপর।
কৃষ্ণ তারে প্রবোধিয়া বলেন বচন।
কি কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন।
কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।
সবারে সংহরি আমি আমি সব করি।

জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নববস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চরে।
শরীর বিনাশ হয়, নহে জীব নাশ।
শুন কহি ধনঞ্জয় করিয়া প্রকাশ।

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ জড়ে জীবে সর্ব্বত্রই যে তিনি বর্ত্তমান, ইহাই অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য বৃক্ষের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, নদীর মধ্যে আমি গঙ্গা ইত্যাদি বলিলেন। এখানেও কাশীরাম ঠিক গীতার শ্লোকের অনুবাদ না করিয়া নিজের বিদ্যামত নির্দ্ধারের একটী বিবৃতি দিয়াছেন।

'হেনমতে যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে। তথাপি প্রবোধ নাহি মানে তাঁর মনে।' কাশীরাম কোন যোগের কথাই বলেন নাই। অর্জ্জুনকে প্রবোধ মানাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন। বিশ্বরূপের বদনবিবরে—'সর্ব্বসৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়। সলজ্জ সভয় চমৎকৃত অতিশয়।' গীতার কথা এইখানেই শেষ।

মূল মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব একখানি স্বতন্ত্র তত্ত্বমূলক বিরাট গ্রন্থ। কাশীরাম ইহার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের উপাখ্যান, ব্রহ্মহ্রদ ও গয়াক্ষেত্রের বিবরণ, পঞ্চপ্রেতের উপাখ্যান, শিবচতুর্দ্দশীর মাহাত্ম্যবর্ণন, অনন্তব্রতের উপাখ্যান,—এই কয়টি অকিঞ্চিৎকর উপকথার সাহায্যে কয়েকটি নৈতিক উপদেশ মাত্র দিয়াছেন। এই উপদেশ শান্তিপর্ব্বের উপদেশ নয়—নানা পুরাণের লৌকিক উপদেশ।

শান্তিপর্ব্বে বহুশাস্ত্রের জ্ঞান উপনিবদ্ধ আছে। ইহার প্রধান বিভাগ রাজধর্ম্মানুশাসন পর্ব্ব, আপদ্ধর্ম্ম পর্ব্ব, আনুশাসনিক পর্ব্ব ও মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্ব। কাশীরাম প্রথম তিনটি একেবারেই বাদ দিয়াছেন। মোক্ষধর্ম্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিয়াছেন বটে—তাহা ব্যাসের মহা-

ভারতের অনুগত নয় ; হরিভক্তিবিলাস এবং ব্যাসসংহিতার কোন কোন উপাখ্যানের অনুগামী।

মূল মহাভারতের বনপর্ব্বের প্রধান অঙ্গ তীর্থযাত্রাপর্ব্বাধ্যায় ও মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়—কাশীরাম এই দুটিকে বর্জ্জন করিয়া নলদময়ন্তী, শ্রীবৎস রাজার কাহিনী, সাবিত্রীসত্যবানের কাহিনীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কারণ, লোকশিক্ষার পক্ষে এই কাহিনীগুলির মূল্য খুব বেশী। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বলিয়াছেন—"তীর্থযাত্রা-পর্ব্বাধ্যায়—ভারতবর্ষের সভ্যতার যে কতদূর সমৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।" যাঁহারা তাহা জানিতে চাহেন—তাঁহাদের কাশীরামের পুস্তক পড়িলে চলিবে না। মূল মহাভারতে বকরূপী যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে শতাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—কাশীরাম কেবল চারিটি প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলি সন্নিবেশিত হইলে কাশীরামের কাব্য শাস্ত্রে পরিণত হইত। বহুস্থলেই কাশীরাম কাব্যত্ব রক্ষার জন্য তত্ত্বাংশ বর্জ্জন করিয়াছেন।

ব্যাসের মহাভারতে অশ্বমেধের অশ্ব ত্রিগর্ত্ত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সিন্ধুদেশ, মণিপুর, মগধ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, কোশল, চেদি, অঙ্গ, কিরাত, দশার্ণ, নিষাদ, দ্রাবিড়, অন্ধ্র, সুরাষ্ট্র, গোকর্ণ, প্রভাস, দ্বারকা, গান্ধার ইত্যাদি দেশে গেল, কোথাও যুদ্ধ করিতে হইল, কোথাও হইল না।

কাশীরামের অশ্ব যুবনাশ্বপুরী হইতে আনীত। অশ্ব মাহিষ্মতীপুরী (নীলধ্বজ রাজার), প্রমীলার পুরী ইত্যাদি মহাভারতে অনুলিখিত পুরীতেও গেল। অথচ মহাভারতোক্ত অধিকাংশ পুরীতেই গেল না।

মূল মহাভারতে দ্রৌপদীলাঞ্ছন-সভায় বিকর্ণের দীর্ঘ বক্তৃতা আছে—কাশীরাম অতি অল্পকথায় তাহার সার সঙ্কলন দিয়াছেন।

'ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর।'—এই একটি চরণে বিকর্ণের চরিত্র ফুটাইয়াছেন। এইসকল ক্ষেত্রে কাশীরামের কৃতিত্ব চমৎকার।

কেবল গীতা নয়, অনুগীতা মহাভারতের অন্তর্গত একটি তত্ত্বমূলক অঙ্গ। হস্তিনা হইতে শ্রীকৃষ্ণ বিদায়গ্রহণকালে অর্জ্জুনের অনুরোধে গীতার বাণীই গল্পচ্ছলে প্রাঞ্জলতর করিয়া বিবৃত করেন। কাশীরাম ইহার নামোল্লেখও করেন নাই। এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে হইবে কাশীরাম কেবল মহাভারতের অপরিহার্য্য মূল কাহিনীটিই বিবৃত করিয়াছেন অতিসহজে সরল ভাষায় ও ভঙ্গীতে লোকশিক্ষার জন্য।

যাহারা মহাভারতের মূল গল্পটি জানিতে চাহেন—তাঁহাদের কাশী-রামের গ্রন্থ পড়িলেই চলিবে। বৈয়াসক মহাভারতের 'চন্দ্রচূড়-জটাজাল' হইতে নবভগীরথ যে মহাভারতী সুরধুনীকে বঙ্গের সমতলে আনয়ন করিয়াছেন—তাহাতেই সাধারণলোকের রসতৃষ্ণা মিটিবে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করিতে চাহেন তাঁহাদের মূল মহাভারতের হিমাদ্রিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষায় বেদবেদান্ত, উপনিষদ্, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র ইত্যাদি কত শাস্ত্রই না আছে! কিন্তু তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী জনসাধারণের কি সম্পর্ক? সে সমস্ত চতুষ্পাঠীর সম্পত্তি, জ্ঞানাভি-জাত্যের অধিকৃত সামগ্রী। যাহাদের লইয়া এই বাঙ্গালী জাতি গঠিত, তাহাদের কাছে উহা দেববিগ্রহের মত দূর হইতে নমস্য। বাঙ্গালীজাতির প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুইখানি,—একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আর একখানি কাশীরামের মহাভারত। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া এ জাতির ধর্ম্মজীবনের ভার লইয়াছেন কাশীরাম ও কৃত্তিবাস। বাঙ্গালী জাতি আজ ধর্ম্মের যে স্তরেই অবস্থিত থাকুক—তাহার স্থান উঁহারাই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। চারিদিক হইতে বাঙ্গালী জাতির

দুর্দশার অবধি নাই, কিন্তু সে যে এখনও পশুত্বের স্তরে নামিয়া যায় নাই তাহা কেবল ঐ দুই মহাকবির অনুগ্রহে।

কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র কেন—কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীর কাধারে নীতিশাস্ত্র, কাব্য, কথাসাহিত্য ও ইতিহাস। বাঙ্গালী কাশীরামের মহাভারত হইতে যুগপৎ কাব্যের রস ও কথা-সাহিত্যের মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে—অথচ মহাভারতের ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে কখনও কল্পিত বা অলীক বলিয়া মনে করে নাই, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, কর্ণ, অর্জ্জুন, কুন্তী, সুভদ্রা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইত্যাদি চরিত্রকে বাঙ্গালী জীবন্ত বিগ্রহ অপেক্ষাও অধিকতর সত্য মনে করিয়াছে। তাই উহা বাঙ্গালীর কাছে শুধু সাহিত্য নয় ইতিহাস,—প্রাচীন ভারতের গৌরবময় ইতিহাস। ঐ চরিত্রগুলিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী নিজের নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে ও চেষ্টা করিয়াছে। সে জন্য ইহা নীতিশাস্ত্র।

কাশীরাম শুধু কবি নহেন—তিনি কবিগুরু। এদেশে কাশীরামের পর যত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহাদের সকলেই কাশীরামের নিকট অল্পবিস্তর ঋণী। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে এ দেশে যত কাব্য, দৃশ্যকাব্য, পাঁচালী, সঙ্গীত, যাত্রাভিনয়ের নাটক রচিত হইয়াছে, তাহাদের উপকরণ উপাদান ব্যাসের মূল মহাভারত হইতে সংগৃহীত হয় নাই,—সমস্তই কাশীরামের মহাভারত হইতে আহৃত বলিয়া মনে হয়। ইদানীং অনূদিত মূল মহাভারত মুদ্রিত আকারে সহজে হস্তগত হইতেছে বলিয়া কেহ কেহ উহা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বে এ দেশের কবিদের প্রধান সম্বল ছিল কাশীরামের মহাভারত।

যেমন,—প্রবীরজনার কাহিনী মূল মহাভারতে নাই—কাশীরাম

নিশ্চয়ই ইহা ব্যাসসংহিতা হইতে পাইয়াছেন। প্রবীরের পতন সংবাদ শুনিয়া জনা বলিতেছেন—

জনা বলে কি কথা কহিলে নরপতি। শত্রু সঙ্গে কেমনে করিবে প্রীতি।
প্রবীরে মারিয়া যে হইল মোর অরি। তারসঙ্গে প্রীতিকর, সহিতে না পারি।
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ। পার্থে মার কর মোর শোক নিবারণ।
ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম। শত্রুর আশ্রয় লবে বৃথা ধর নাম।

কাশীরামের এই কয়টি চরণ অবলম্বন করিয়া মাইকেল 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' এবং গিরিশচন্দ্র জনা নাটক লিখিয়াছেন। এই জনার বেদনা অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত কাশীরামের অন্তর স্পর্শ করে নাই। জনা যে শ্রীকৃষ্ণের বিরোধিনী। তাহা ছাড়া, অবান্তর কোন চরিত্র লইয়া বিলম্ব করিবার অবসর কাশীরামের ছিল না।

এ দেশের লোক-সাহিত্যের প্রধান জন্মক্ষেত্র কাশীরামের মহাভারত। যাত্রাভিনয়ের মধ্যে আমরা কাশীরামের অবদানকেই নাট্যাকারে দেখিয়া আসিয়াছি—বর্ত্তমান যুগের রঙ্গমঞ্চেও কাশীরামের দানই কত ভাবেই না রূপান্তরিত হইয়াছে! মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্যে, নবীনচন্দ্রের কুরুক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতায় কাশীরামের দানেরই পরিচয় পাইয়া থাকি। কাশীরামের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আজিও অনেক কবি কাব্যের প্রেরণা ও উপকরণ লাভ করিয়া নব নব সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন।

এ যুগেও অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তির মহাভারত সম্বন্ধে জ্ঞান কাশীরামের মহাভারত হইতেই আহৃত এবং ইহা প্রত্যেকেরই পাঠ্য।

কাশীরামের মহাভারত বাঙ্গালীর মুদির দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-অন্তঃপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ভক্তিনত শ্রোতৃমণ্ডলী মধ্যে শত শত বৎসর ধরিয়া পঠিত হইয়া আসিয়াছে। ইহা বাঙ্গালী বিধবার

প্রধান সম্বল, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, রোগশয্যার বন্ধু, সন্ধ্যার সুহৃদ, প্রবাসের সহচর এবং বাঙ্গালী নারীর জ্ঞানের প্রধান আশ্রয়। সর্ব্বোপরি ইহা গ্রন্থাকারে পল্লীবিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী পল্লীবাসীরা তিন শত বৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছে। অনেকের পক্ষে ইহাই একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্র।

কাশীরামের কথা লইয়া একটি বিরাট গ্রন্থ হইতে পারে—কত কথাই না মনে পড়িতেছে! বাল্য কৈশোরের কত মুহূর্ত্তই না কাশীরাম রসমধুর, শান্তিময়, অমৃতময় করিয়া দিয়াছেন। সে মুহূর্ত্তগুলির মত মূল্যবান মুহূর্ত্ত এ জীবনে আর পাই নাই। অতীত জীবনের সেই মধুময় মুহূর্ত্তগুলি হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চিত হইয়া আছে। অতীত জীবনের সকল মধুময়ী স্মৃতির সহিত কাশীরাম চির-বিজড়িত। শাখা ধরিয়া টান দিলে যেমন সমগ্র তরুই আন্দোলিত হইয়া যায়—আজ কাশীরামের কথা বলিতে গিয়া তেমনি আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে সমগ্র জীবনই। কাশীরামের প্রভাব মানসদেহে রোমাঞ্চের রূপ ধরিতেছে, নয়ন অশ্রুসিক্ত হইতেছে। মাইকেলের মত প্রত্যেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকের সাহিত্যের রসবোধের ও সাহিত্যানুশীলনের সূত্রপাত হইত স্নেহময়ী জননীর স্নেহাঙ্কের পরিবেষ্টনীতে কাশীরামের মহাভারতে। বিলীয়মান যুগের প্রত্যেক কবি-সাহিত্যিকের মত আমিও নিত্যই আমার সাহিত্যিক জীবনে আমার প্রতিবেশী পুণ্যশ্লোক মহাকবির আশীর্ব্বাদ ও স্নেহস্পর্শ অনুভব করি।

(কাশীরাম দাসের স্মৃতিসভার অভিভাষণ)

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণি-মালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য্য।"

—রবীন্দ্রনাথ।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল শাক্তসাহিত্য চণ্ডীমঙ্গল-শ্রেণীতেই পড়ে। অন্নাদামঙ্গলে চণ্ডীই সর্ব্বদ্বন্দ্ব জয় করিয়া তাঁহার রুদ্রাণীমূর্ত্তি পরিহার করিয়া ভক্তবৎসলা অন্নদার রূপ ধারণ করিয়াছেন। কোন দেবতার সঙ্গে আর তাঁহার দ্বন্দ্ব নাই, বরং যে দ্বন্দ্ব যাহার মনে উদিত হইয়াছে সে-দ্বন্দ্বের তিনিই নিরসন করিয়া দিয়াছেন। যে ব্যাসকে হরি ত্যাগ করিলেন, হর নানা ভাবে বিড়ম্বিত করিলেন, ব্রহ্মা আশ্রয় দিলেন না, গঙ্গা তুষ্ট হইলেন না, অন্নদা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

জগজ্জননী মাতা সবারে সমান। শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
হরিহর সকলেরই শত্রুমিত্র আছে। শত্রুমিত্র একভাব অন্নদার কাছে॥

চণ্ডীর এই জগজ্জননী-রূপ অন্নদামঙ্গলে ফুটিয়াছে। এই-রূপই ভারত-চন্দ্রের রচনায় অপূর্ব্ব কাব্যশ্রী সম্পাদন করিয়াছে।

ভারতচন্দ্র যে কবিকঙ্কণের নিকট যথেষ্টরূপ ঋণী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি—অন্নদামঙ্গলের অনেক অংশ কবিকঙ্কণের রচনারই সুমার্জ্জিত ও সুপরিচ্ছন্ন রূপ। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের সঙ্গেও কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয়। যে সকল অংশের জন্য ভারতচন্দ্র কবিকঙ্কণের কাছে ঋণী বলিয়া মনে হয়—সে সকল অংশ হয়ত কবিকঙ্কণেরও নিজস্ব নয়। মাধবাচার্য্যের চণ্ডী হইতেও কবিকঙ্কণ অনেক অংশ পাইয়াছেন অথবা কবিকঙ্কণ ও মাধবাচার্য্য দুইজনই পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থ হইতেই পাইয়াছেন;

বাঙ্গালা ভাষার যে কোন মঙ্গল-কাব্য সম্বন্ধেই একথা খাটে।

প্রত্যেক কাব্যই যেন কবিপরম্পরার দ্বারা রচিত। যাঁহার নামে প্রচলিত তাঁহার ব্যক্তিগত রচনাশৈলী ও কাব্য-প্রতিমার রঙ ফিরায় কিংবা রঙের উপর রসান দেয় মাত্র।

মঙ্গলকাব্যরচনার পদ্ধতিগুলির অধিকাংশ অন্নদামঙ্গলেও অনুসৃত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র অন্যান্য কবিদের মত দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইতেছেন। কবির প্রতিপালকও স্বপ্নাদেশ পাইতেছেন। অন্যান্য মঙ্গল-কাব্যের ন্যায় অন্নদামঙ্গলেও পূজাপ্রচারক ভক্ত অভিশপ্ত স্বর্গভ্রষ্ট দেবসন্তান। হরিহোড় ও ভবানন্দ দুই জনেই শাপভ্রষ্ট। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত অন্নদা-মঙ্গলেও দুইটি প্রধান অংশ।—পৌরাণিক অংশ ও লৌকিক অংশ। ব্যাসের কথা বাদ দিলে পৌরাণিক অংশে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে প্রভেদ নাই। লৌকিক অংশে অবশ্য বৈশিষ্ট্য আছে। অন্নদামঙ্গলের লৌকিক অংশ অনেকটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। ভবানন্দ মজুমদার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। মানসিংহ-প্রতাপাদিত্য-জাহাঙ্গীর-প্রসঙ্গও অনেকটা ইতিহাস-সম্মত। আপনার ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য দেবীর প্রয়াস সকল মঙ্গল কাব্যেরই একটি অঙ্গ। ভারতচন্দ্রের কাব্যে পূজাপ্রচারক ভক্ত ব্রাহ্মণেতর জাতির লোক নহেন—ইনি ব্রাহ্মণ ভূস্বামী। কায়স্থ হরিহোড়কে দেবী কৃপা করিয়াও কৃপা সংহরণ করিতেছেন।

বৌদ্ধপুরাণসম্মত সৃষ্টিতত্ত্ব, শ্লিষ্টবাক্যে আত্মপরিচয়, দেবীর ছদ্মবেশ, মোহিনীবেশ ও জরতীবেশ ধারণ, ইত্যাদি সকল মঙ্গলকাব্যের কবিপ্রথা। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, যাত্রার শুভাশুভ-সূচনা ইত্যাদির দীর্ঘ তালিকা অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের মত অন্নদামঙ্গলেও স্থান পাইয়াছে।

কলহের চিত্র মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। রঙ্গ-রসের কবি ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে অনেকগুলি কলহের চিত্র দেখাইয়াছেন।

শিবের বিবাহে নারদ উপস্থিত ছিলেন—তিনি যে ভাবে কলহকে আমন্ত্রণ করিতেছেন—তাহা বেশ উপভোগ্য। কলহচিত্রগুলির মধ্যে গঙ্গা ও ব্যাসের কলহ সকল কলহকে হার মানাইয়াছে।

কাব্যের প্রারম্ভে দেবদেবীদের যেরূপ বন্দনাযোজনার প্রথা অন্নদামঙ্গলেও সে প্রথা অনুসৃত হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের দিন ফুরাইয়াছে—তাঁহার বন্দনা নাই। তবে দুই একটি নূতন নূতন দেবদেবীর বন্দনাও সংযোজিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যগুলিতে শ্রীচৈতন্যও দেবতাদের সঙ্গে বন্দিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র নদীয়া রাজার সভাকবি হইয়াও নদীয়ানাগরের বন্দনা গা'ন নাই। শাক্ত নদীয়ারাজের সভায় ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় চৈতন্যবন্দনা করিতেও পারেন নাই।

কবি একস্থলে বলিয়াছেন, 'সপত্নী-কলহে খুব রস জমে।' বসুন্ধরাকে স্বর্গভ্রষ্ট করিয়া ভাঁড়ুদত্তের ঘরে জন্মদান করিয়াছেন। তাহার নামও দিয়াছেন সোহাগী। সে হরিহরের বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা হইল। তাহার সপত্নী ছিল ৪টি। সপত্নীকলহের ফলে বিরূপা হইয়া অন্নপূর্ণা তাঁহার গৃহ ত্যাগ করিলেন। ভারতচন্দ্র মুখেই একথা বলিয়াছেন—সপত্নী-কলহের চিত্রপ্রদর্শনের লোভ কবি এখানে সংবরণ করিয়াছেন। এব্যাপারটা কবি ভবানন্দের অন্তঃপুরের জন্য মুলতুবি রাখিয়াছিলেন. কিন্তু সেখানেও তিনি রস জমাইতে পারেন নাই। কারণ, কবি আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন—যেখানে কলহ, সেখানে অন্নপূর্ণা স্থায়ী হ'ন না।

অন্নদামঙ্গলের একটি বৈশিষ্ট্য—ইহার মধ্যে একখানি গর্ভ-কাব্যের স্থান হইয়াছে। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর এই গর্ভকাব্য। কালকেতুর

উপাখ্যান চণ্ডীমঙ্গলে গর্ভকাব্য নয়—ইহা স্বতন্ত্র কাব্য। চণ্ডীমঙ্গল যদি হয় যৌগিক-কাব্য; অন্নদামঙ্গল তবে মিশ্র-কাব্য।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় অন্নদামঙ্গল অনেকটা গীতি-ভাবাত্মক—ইহাতে প্রসঙ্গ-পল্লবের মাঝে মাঝে অনেক গীতি-কুসুম বিকসিত হইয়াছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় ইহাতে লৌকিক চরিত্রগুলি তেমন পরিপুষ্ট বা পরিস্ফুট হয় নাই।

দেবীর কৃপায় ঘুঁটেকুড়ানীর বেটা ধনেশ্বর হয়, কানুনগো ভবানন্দ রাজা হয়, পাতশাহের কারাগারে বন্দী ভবানন্দ অব্যাহতি পায়, নবাবী কারাগারে বন্দী কৃষ্ণচন্দ্র মুক্তি পায়। ইহাতে অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এহো বাহ্য। ব্যাসদেব যে হরিহরের রোষ হইতে রক্ষা পায়, সেটা আরো বড় কথা। তাহার চেয়ে বড় কথা—অনাদি নিধন মহাদেব মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিলেন—অন্নদার কৃপা ছাড়া ত্রিভুবনে একমুষ্টি অন্নও পাওয়া যায় না—স্বয়ং লক্ষ্মীও কাঙালিনী—একমুষ্টি অন্ন দিতে পারেন না। কবি এইভাবে অন্নদার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অন্নদামঙ্গল পড়িলে মনে হয়—ভয়ের মধ্য দিয়া যে ভক্তি, তাহার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে—করুণা ও কৃতজ্ঞতার মধ্য দিয়া সহজ ও স্বাভাবিক ভক্তির দিন আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"তখনকার দিনে নানা বিভীষিকাগ্রস্ত পরিবর্ত্তনব্যাকুল দুর্গতির দিনে শক্তিপূজারূপে এই যে প্রবলতার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহা আমাদের মনুষ্যত্বকে চিরদিন পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। যে ফলের মিষ্ট হইবার ক্ষমতা আছে সে প্রথম অবস্থার তীব্র অম্লত্ব পক্ক অবস্থায় পরিহার করে। যথার্থ ভক্তি সুতীব্র কঠিন শক্তিকে গোড়ায় যদিবা প্রাধান্য দেয়, শেষ কালে তাহাকে উত্তরোত্তর মধুর, কোমল ও বিচিত্র করিয়া আনে।

বাংলাদেশে অত্যুগ্র চণ্ডী ক্রমশঃ মাতা অন্নপূর্ণারূপে, ভিখারীর গৃহলক্ষ্মীরূপে, বিচ্ছেদবিধুর পিতামাতার কন্যারূপে, মাতা পত্নী ও কন্যা রমণীর এই মঙ্গলসুন্দররূপে দরিদ্র বাঙ্গালীর ঘরে যে রস সঞ্চার করিয়াছেন—ইহাই চণ্ডীপূজার পরিণামরমণীয়তার দৃশ্য।”

ভারতচন্দ্র গভীর ভাবের বা নিবিড় রসের কবি নহেন। ইঁহার কাব্যে আবেগের আতিশয্য নাই, বরং দীনতাই আছে। ইনি প্রধানতঃ রতিরস ও রঙ্গরসের কবি। চারিপাশের রসিক লোকদের মনোরঞ্জন ছাড়া ইহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না,—সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখ চাহিয়া তিনি লেখেন নাই।

ছন্দের বৈচিত্র্যে ও অনবদ্য গঠনে, আলঙ্কারিকতায়, বচন-পারিপাট্যে, মণ্ডন-কলায়, রঙ্গরসের সৃষ্টিতে তাঁহার কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

সকলের জানা কথাই তিনি স্পষ্ট করিয়া সরস করিয়া নিঃশেষেই বলিয়াছেন—তাহাতে লোকের মনোরঞ্জন হইয়াছে।

পরিকল্পিত চরিত্রের যথাযথ রূপদান এবং লৌকিক জীবন-যাত্রার বর্ণনা তাঁহার কাব্যে পাওয়া যায়। ইহা আজকাল প্রধানতঃ কথা-সাহিত্যিকের কৃতিত্বের গণ্ডীতে পড়ে।

সরস্বতী-বন্দনায় তিনি বলিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি গীতে দিলা অনুমতি করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয় না জানি কেমন হয় ভারতের ভারতী ভরসা॥

এই দ্বিধাটুকু সকল মঙ্গলকাব্যকারদের রচনাতেই দেখা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ঘনরামের—

লঘু নরে গুরুভার কিরূপে পাইব পার দুস্তর সঙ্গীতরস-সিন্ধু,
হইতে নিস্তার বীজ তব পদ সরসিজ স্মরণ ভাবনা দীনবন্ধু।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্রবর্ণনায় যে স্তাবকতা

করিয়াছেন, কেবল আলঙ্কারিকতার গুণে তাহা উপভোগ্য হইয়াছে। কবি ব্যতিরেক ও শ্লেষের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন—

চন্দ্রে সবে ষোলকলা হ্রাস বৃদ্ধি পায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥

'শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগে' দক্ষের মুখে শিবনিন্দা বসানো হইয়াছে। এই শ্লিষ্ট অংশে দুইটি করিয়া অর্থ আছে। একটি দক্ষের পক্ষ হইতে। কবি তাহার মধ্যে আর একটি অর্থ সংগুপ্ত রাখিয়া নিজের শিবভক্তির নিবেদন ও ব্যাজ-স্তুতি দ্বারা শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

সভাজন শুন জামাতার গুণ বয়সে বাপের বড়!
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥ ইত্যাদি

কঙ্কণ চণ্ডীতেও এই ভাবের শিবনিন্দা আছে।

হরগৌরীর প্রণয়-পরিণয়ব্যাপারে কবি ভাগবত মহিমা রক্ষা করিতে পারেন নাই, কুমার-সম্ভবের গাম্ভীর্য্য ইহাতে বিন্দুমাত্র নাই। রতিবিলাপে কিছু কবিত্বের আভাস পাওয়া যায়, তবু কবিকঙ্কণের রতিবিলাপ ইহার তুলনায় অধিকতর আবেগময়। ভারতচন্দ্রের নিম্নলিখিত চরণগুলি মর্ম্মস্পর্শী—

শিবশিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম বামদেব আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে তার দৃষ্টে প্রভু মরে এমন না দেখি কোনকালে॥
শিবের কপালে র'য়ে প্রভুর আহুতি লয়ে না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে অন্যের কপাল দহে আগুনের কপালে আগুন॥
অনলে শরীর ঢালি তথাপি রহিল গালি মদন মরিলে মৈল রতি।
এ দুঃখ হইতে পার উপায় না দেখি আর মরিলেও নাহি অব্যাহতি।
অরে নিদারুণ প্রাণ কোন পথে পতি যান আগে যারে পথ দেখাইয়া।
এমণ রাজীব রাজে মনঃশিলা পাছে বাজে হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া॥

শিবের বিবাহব্যাপারে রঙ্গরসের ছড়াছড়ি। সেকালে ইহাকেও কবিত্ব বলা হইত। হরগৌরীর বিবাদের মধ্যে বাংলার অভাবী সংসারের দাম্পত্য কলহের চিত্রের প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়। এই কলহে গ্রাম্যতাদোষ একেবারেই নাই। বিজয় গুপ্তের গৌরীর মত ভারতের গৌরী গালাগালি শাপশাপান্ত করেন নাই।

ব্যাসের ধর্ম্মদ্বিধার মধ্য দিয়া কবি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বটিকে বাণীরূপ দিয়াছেন—এ জন্য ব্যাসের কাহিনীটিকে Symbolical বলা যাইতে পারে। ব্যাস সেকালের বিবিধ ধর্ম্মমতের ভেদদ্বন্দ্বের আবেষ্টনীতে পরিবর্দ্ধিত জাতীয় মনেরই প্রতীক। ব্যাসের ছলনার জন্য অন্নদার জরতীবেশের বর্ণনা একটি চমৎকার রচনা। ইহাতে বীভৎস রসের সৃষ্টি হইয়াছে। কবির রচনাগুণে জরতীর মূর্ত্তিটি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। জরতীর রূপ-বর্ণনা বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন নয়। বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তনে বড়াইএর এই-রূপ একটা মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর জরতী রূপের বর্ণনা দিয়াছেন এইরূপ—

জরতী ব্রাহ্মণীর দেহ অস্থি চর্ম্মসার, পাকাচুলে ভরা মাথা, শ্বাসকাসে আতুর।
'বাতেতে কাঁকলি বাঁকা হয়্যা যেন ডড়ি। ওছাটের ঘায়ে চণ্ডী যায় গড়াগড়ি।'
বাম কাঁখে নিল মাতা রঙন চুবড়ি। ডানি করে লইলেন শিঙা বেত্রনড়ি॥

ভারতচন্দ্রের বর্ণনার কাছে এ সকল বর্ণনা অকিঞ্চিৎকর। ভারতচন্দ্র ধনিসমাজের কবি হইলেও দারিদ্র্যের চিত্রও সুন্দর ভাবেই আঁকিতে পারিতেন। তবে দরিদ্র কবিকঙ্কণের অশ্রুসিক্ত তূলিকা তিনি কোথায় পাইবেন? ভারতচন্দ্র হরিহোড়ের জননীর দৈন্যরূপ এইভাবে আঁকিয়াছেন—

হেনকালে এক বামা স্নান করি যায়। তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়।
লতাবাঁধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন। ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥

অন্ন বিনা কলেবর অস্থিচর্ম্মসার। গেঁয়োলোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি। পাণ বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি॥

পদ্মপাতা পরিধেয় বলিয়া এই কাঙালিনীর নাম পদ্মিনী। অন্নপূর্ণার অনুগ্রহে এই পদ্মিনীর এক পুত্র সন্তান হইল।

পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাই ঠাঁই। ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই।
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি। দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা 'হরি'

অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা—একটি চমৎকার রচনা। অন্নপূর্ণা কুলীনকন্যার ছদ্মবেশে ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় গাঙিনী পার হইতেছেন।

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ। কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥

কি সুন্দর এই চিত্রখানি।

পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥

পাটনী বলিল 'মা সেঁউতির উপরে পা রাখ'। অন্নদা সেঁউতিতে পা রাখিবামাত্র সেঁউতি সোনা হইয়া গেল। তাহার ফলে পাটনী মাকে চিনিল। মা বলিলেন—'তুই বর চা'। পাটনী তাহার বুদ্ধিবিদ্যার আশাআকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বরই চাহিল—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" পাটনীর মত সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই ইহার বেশি কিছু চায় নাই। যে বাঙ্গালী জাতি "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"—ইহার চেয়ে বেশি কিছু চায় না, সে বাঙ্গালীজাতির যোগ্য দেবতা যে অন্নপূর্ণা ছাড়া আর কেহ নয়—কবি তাহা এই কবিতার ব্যঙ্গার্থে ভোতনা করিয়াছেন।

অন্নপূর্ণা কুলীনকন্যার ছদ্মবেশে গাঙ্গিনী পার হইতে আসিয়া পাটনীকে যে পরিচয় দান করিতেছেন—তাহা চমৎকার শ্লেষালঙ্কারে সমৃদ্ধ। এক অর্থে তিনি তাঁহার লৌকিক পরিচয় দিতেছেন—অন্য অর্থে তাঁহার অলৌকিক মহাসত্তার ইঙ্গিত করিতেছে—

গোত্রের প্রধানপিতা মুখবংশজাত। পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিল মোরে অন্নপূর্ণা নাম। অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড়বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি। জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে। না মরে পাষাণ-বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল ভাই। যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই॥

এইরূপ শ্লেষাঢ্য বাক্যে আত্ম-পরিচয়দান বঙ্গ-সাহিত্যে নূতন নয়। কবিকঙ্কণের জরতীও এই ভাবের পরিচয় দিয়াছেন—

দারুণ কর্ম্মের গতি, দরিদ্র আমার পতি ধুতরা পাগল দিগম্বর।
ভিক্ষায় পরম ক্লেশ, সবে ধন বুড়া বৃষ, নিবাস কুমুদ মহীধর।
অবলম্ব নাই ঠাঁই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই, প্রাণনাথ কৈল বিষ পান।
দারুণ দৈবের দোষে, দু'টি পুত্র নাহি পোষে, কত কব দুঃখের আখ্যান।

কালকেতুর গৃহে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীও এইভাবে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্ম-মঙ্গলেও এইরূপ শ্লেষের দ্বারা চণ্ডীর আত্ম-পরিচয়ের কথা আছে। লাউসেনের নিকটে ছদ্মবেশধারিণী চণ্ডী বলিতেছেন—

মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর॥ * * *
যে ডাকে আদরভাবে যাই তার কাছে।

যাহাই হউক, ভারতচন্দ্রের হস্তে এই প্রসঙ্গটি অনবদ্য রূপ ধারণ

করিয়াছে। বাগ্‌বিন্যাসের অনবদ্য পারিপাট্যের জন্য ভারতচন্দ্রের রচনাই বঙ্গ-সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে।

ঈশ্বর পাটনী একজন রক্তমাংসে জীবিত খাঁটি বাঙ্গালী দরিদ্র ব্যক্তি। "ভারতচন্দ্রের বৃহৎ কাব্যের মধ্যে রক্তমাংসের মানুষ অর্থাৎ humam man পাই একটী। তাও ঠিক নয়—একটি মানুষের একটু ক্ষণিক আবির্ভাব। এ হইতেছে ঈশ্বর পাটনী।" ডাঃ সুকুমার সেন।

এই সমগ্র চিত্রটি বাংলার বাস্তবতার শ্যাম বর্ণে রঞ্জিত। এইখানেই ভারতচন্দ্র হইয়াছেন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। আর কোথাও ভারতচন্দ্রের কবিত্বের এইরূপ জাতীয় ভাবের অভিব্যক্তি দেখা যায় না।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোন মহান্ চরিত্র নাই, কোন উচ্চ আদর্শ নাই, দেব-মাহাত্ম্যও ইহাতে ফুটে নাই। দেবী নিজ পূজাপ্রচারের জন্য কোন ঘৃণিত উপায় বা ছলনার সাহায্য লইতেছেন না বটে, কিন্তু কোন মহাপুরুষ, সাধক বা মহাসতীকেও অনুগ্রহ করিতেছেন না। শিবের বিড়ম্বনা যতটা ফুটিয়াছে, শিবের মাহাত্ম্য ততটা ফুটে নাই। ব্যাসের মত জগৎপূজ্য চরিত্র লইয়া তিনি বাঁদরনাচ নাচাইয়াছেন। যে ব্যাসদেব নিজেই সর্ব্ব দেবদেবীর সমন্বয় ঘটাইয়া শ্রীভগবানের ব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তাঁহাকেই প্রাকৃত জনের ন্যায় ধর্ম্মদ্বিধার দোলাচলে দুলাইয়া আমোদ উপভোগ করা ভারতচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব।

দেবীর অনুগৃহীত ভবানন্দ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র, হরিহোড় ও সুন্দর। ভবানন্দ মানসিংহকে সহায়তা করিলেন প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য। এই সহায়তার পুরস্কার পাইলেন বাদশাহের কাছে রাজত্বের ফারমান। এই ভবানন্দ মহাপুরুষ ব্যক্তি নহেন। কবি ইঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভবানন্দেরই উপযুক্ত বংশধর। ইনিও অনেকটা ভবানন্দেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কবির কাব্য ইহারই নামাবলি গায়ে দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবি-প্রতিভার এমন দুর্দ্দশা আর কখনো হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

আজিকার দিনে একথা বলা সহজ। এখনকার কবির প্রতি-পালক কোন রাজাবাদশা নয়—সমগ্রদেশের লোকই তাহার শ্রোতা, রসবেত্তা এবং প্রতিপালক। বর্ত্তমানকালে কোন কবিকে ব্যক্তিবিশেষের মুখ চাহিয়া ব্যক্তিবিশেষের আদেশে কাব্য রচনা করিতে হয় না, কাহারও স্তাবকতাও করিতে হয় না। কিন্তু সেকালের কথা ভাবিলে মনে হয় গৃহভ্রষ্ট, প্রবল ভূস্বামিকর্ত্তৃক উৎপীড়িত, পথের ভিখারী কবিকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মাসোহারা ও নিষ্কর ভূসম্পদ দানে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার মধুর কাব্যের রসাস্বাদন করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি নিজেও একজন ভূস্বামীর সন্তান ছিলেন, বিলাসের মধ্যেই লালিত হইয়াছিলেন—পুরাদস্তুর ভোগী গৃহস্থই ছিলেন। বিদগ্ধজনোচিত ও সভ্যনাগরজনোচিত জীবনযাত্রানির্ব্বাহের প্রয়োজন তাঁহার ছিল। অতএব প্রতিপালকের মনোরঞ্জন করিয়া কাব্য-রচনা তাঁহার কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূতই ছিল মনে করিতে হইবে।

ভারতচন্দ্র স্বাধীন ভাবে গ্রন্থ রচনা করিলে ইহার চেয়ে উচ্চতর আদর্শের কাব্য রচনা করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কবি রাজা ও রাজ-পারিষদগণের মানারঞ্জন করিবার জন্য তাহাদের রুচির অনুগত করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। দেশের মুখপানে চাহিয়া কাব্য রচনা করিলে এতটা নিরঙ্কুশ বা নিঃসঙ্কোচও হইতে পারিতেন না।

বিদ্যাসুন্দরই অন্নদামঙ্গলে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার শ্রেষ্ঠাংশ আবার রতিরসকে অবলম্বন করিয়া রচিত। এই রতিরসের কাব্যকলা স্নায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধে অনির্ব্বচনীয় রসের স্তরে আরোহণ করে নাই। বৈষ্ণব কবিতার যে অঙ্গটা সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তাহাই শ্রেষ্ঠাংশ।

২

মানসিংহ-ভবানন্দ-প্রসঙ্গ অন্নদামঙ্গলের একটি প্রধান অঙ্গ। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে আসিলেন—
"দেখা হেতু দ্রুত হয়ে নানা দ্রব্য ডালি লয়ে বর্দ্ধমানে গেল মজুমদার।"
বর্দ্ধমানে মজুমদারের মুখে মানসিংহ বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী শুনিলেন। বিদ্যাসুন্দর পৃথক কাব্য নয়, অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত গর্ভকাব্য। মজুমদারের মুখে ইহা মানসিংহের পরিতোষের জন্য বিবৃত।

ভারতচন্দ্র যে-ভাবে 'ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ' বলিয়া প্রতাপাদিত্যের বিক্রমগাথার সূত্রপাত করিয়াছিলেন—তাহাতে মনে হইবে, কবি বুঝি প্রতাপাদিত্যের বীরাবদানের কাহিনীই এইবার বলিবেন। কিন্তু রাজভক্ত কবি এক কথাতেই প্রতাপাদিত্যকে হারাইয়া দিয়াছেন—
"বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া প্রতাপাদিত্য হারে।" তারপর মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পিঞ্জরে ভরিয়া দিল্লী লইয়া গেল।

প্রতাপ-আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে। ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে
কতদিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত। সাক্ষাৎ করিল পাতসাহের সহিত॥

বাংলার যে দেশভক্ত বীর মানসিংহ-প্রেরিত বেড়ী ও তলবারের মধ্যে তলবার তুলিয়া লইয়া বলিয়াছেন—

কহ গিয়া ওরে চর মানসিংহরায়ে। বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে যমুনার জলে ধুবো এই তলবারে॥

সেই প্রতাপাদিত্যের এই শোচনীয় পরিণামের কথা বিবৃত করিতে গিয়া কবির একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়িল না। কবির উদ্দেশ্য প্রতিপালকের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দের গুণগান। ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের শত্রুপক্ষে। মানসিংহের বিজয়ই ভবানন্দের বিজয়। তবে যে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমের অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া কবি প্রসঙ্গের

সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ—বিজয়ীর বিক্রম ও কৃতিত্বকে বড় করিয়া দেখাইতে হইলে বিজিতের বিক্রম ও বীরত্বকেও বড় করিয়া দেখাইতে হয় বলিয়া। ইহা ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতচন্দ্র দেশদ্রোহী ভবানন্দের গুণগান করিয়া চারণের উচ্চাসন হইতে ভাটের নিম্নাসনে নামিয়া আসিয়াছেন।

কবি ভবানন্দকে রণবীররূপে দেখাইতে পারেন নাই—কিন্তু তাঁহার বীরত্ব অন্যভাবে দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে বাক্যবীর করিয়া তুলিয়াছেন। জাহাঙ্গীর পাতসাহ যখন হিন্দুধর্ম্মের অজস্র নিন্দা করিলেন—তখন ভবানন্দ সহিয়া থাকিলেন না। তিনি মুখের উপর বলিয়া দিলেন—

দেবদেবীপূজা বিনা কি হবে রোজায়। স্ত্রীপুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের। হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥

অসংযত রচনার জন্য ভবানন্দের কারাবাস হইল। এখন কবির অন্নদার মহিমা প্রকাশের সুযোগ ঘটিল। ভক্তের বন্ধনে অন্নদা রাগিয়া গেলেন। জাহাঙ্গীর বলিয়াছিলেন—হিন্দুর দেবতা ভূত। তাই ভূতনাথ-জায়া অন্নদা ভূতলোকের সমস্ত ভূতকে ভূতলে ডাকিলেন। দিল্লীতে ভূতের উৎপাতে যে কাণ্ড হইল, জীবন্ত তৈমুর নাদিরও সে কাণ্ড করিতে পারেন নাই।

জাহাঙ্গীর বিপন্ন হইয়া দেবীর শরণাপন্ন হইলেন এবং মানসিংহের উপদেশে মজুমদারকে মুক্তি দিয়া নিজে বিপদ হইতে মুক্ত হইলেন। অন্নদা তখন দয়া করিয়া জাহাঙ্গীরকে দেখা দিলেন। জাহাঙ্গীর তখন মজুমদারকে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন—

দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া। তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে। পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥

বাঙ্গালা দেশ হইতে বাঙ্গালার মহাবীরকে মানসিংহ ঘৃতে ভাজিয়া

দিল্লীতে লইয়া গেল। আর মজুমদার তাহার বিনিময়ে ভূত দেখাইয়া জমিদারী ফরমান্ লইয়া আসিল। তাহাও সহ্য হয়। কিন্তু কবির যত আক্রোশ ছিল মুসলমান জাতির উপর, অভয়ার ও তাঁহার সঙ্গী ভূতগুলির মারফতে সে সব যে ভাবে ঝাড়িলেন—তাহা বড়ই কাপুরুষতা। ইহাই কি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুশিদাবাদে 'বৈকুণ্ঠবাসের' প্রতিশোধ। অন্নদার ভবিষ্যদ্‌বাণী স্মর্ত্তব্য—

আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে। নজরাণা বলি বারো লক্ষ টাকা চাবে।
বন্ধ করি রাখিবেক মুশিদাবাদে। মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে।

জাহাঙ্গীরের দিল্লী যে কি ছিল আর জাহাঙ্গীর যে কত বড় প্রতাপশালী সম্রাট্ ছিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা জানিতেনও না। ভারতচন্দ্রের কবিকীর্ত্তি প্রেতলোকে এমন কি দিল্লীতে পৌছিবারও সম্ভাবনা ছিল না—এমন কি মুশিদাবাদের নবাব কিংবা কোন প্রতাপান্বিত মুসলমানের গোচরে যাইবারও সম্ভাবনা ছিল না। তাই কবি নিশ্চিন্ত হইয়া বাদশাহকে লইয়া নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। দিল্লীর সম্রাটের কাল্পনিক বিড়ম্বনায় কৃষ্ণচন্দ্রও প্রাণ ভরিয়া আমোদ উপভোগ করিয়াছেন এবং নিজের পূর্ব্বপুরুষের ভৌতিক কীর্ত্তিতে খুবই গদ্‌গদ হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মুসলমানভয়ভীত, মুর্শিদকুলিখাঁ ও সরফরাজ খাঁর দ্বারা নিগৃহীত হিন্দু পারিষদগণও খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, যখন তাঁহারা ভারতচন্দ্রকে আবৃত্তি করিতে শুনিতেন—

বাদশা কহেন বাবা কি কৈল গোসাঁই।
সাত রোজ মোর ঘরে খানাপিনা নাই॥
মামুর হইল মোর বাবরুচি খানা।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা॥

বেগম বিবিদের বিড়ম্বনার কথা আর নাই বলিলাম!

মানসিংহের সুপারিশে, অন্নদার কৃপায় ও ভুতের সাহায্যে ফরমান পাইয়া মজুমদার দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তারপর তিনি ঘটা করিয়া অন্নপূর্ণার পূজা করিলেন। অন্নপূর্ণার পূজা-প্রচার হইলে তাঁহার শাপ-মুক্তি হইল। পূজাপ্রচারের জন্য অন্নদার রাজশক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল। তিনি তাই ভবানন্দকে এই রাজশক্তিপ্রাপ্তির সহায়তা করিলেন। তাঁহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল,—ভবানন্দের কথাও ফুরাইল।

এই সংক্ষিপ্ত কথাবস্তুর মধ্যে ভারতচন্দ্র কবিত্বপ্রকাশের অবসর পান নাই। যুদ্ধের বর্ণনা কয়েকটি মামুলী ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বারাই নিষ্পন্ন অর্থাৎ সশব্দ পদধ্বনির দ্বারা কবি রণতাণ্ডব প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যুদ্ধটা মানুষে মানুষে হইতেছে না—হইতেছে শব্দে শব্দে। সকল মঙ্গল কাব্যেই তাই। কেবল ঘনরামের যুদ্ধবর্ণনায় একটু বৈচিত্র্য আছে। ভারতচন্দ্রের যুদ্ধ-বর্ণনা অনেকটা মাধবাচার্য্যের চণ্ডীর যুদ্ধবর্ণনার মত।

মানসিংহ বাংলা হইতে সোজা পথে দিল্লী যান নাই—গিয়াছেন ভারতবর্ষ বেষ্টন করিয়া—তবু দীর্ঘ পথের কোন বর্ণনা নাই। দিল্লীর ঐশ্বর্য্য বা জাহাঙ্গীরের রাজসভার সমারোহের কোন বর্ণনা নাই। জাহাঙ্গীর যেন একজন জমিদার মাত্র, আর দিল্লী যেন আর একটা কৃষ্ণনগর। কবি বহু অবান্তর কথা দিয়া কবিত্ব-পুষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। এই কবিত্বও রসিকতা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

ভবানন্দের সঙ্গে রাণীদের মিলন চিত্রে কবি বলিয়াছেন—

কথার না সহে স্বর দুহে কামে জর জর কামক্রীড়া করিল বিস্তর।
ভারত কহিছে সার বিস্তর কি কব আর বর্ণিয়াছি বিদ্যার বাসর।

কবিত্বের পরাকাষ্ঠা ত তাহাতেই দেখানো হইয়াছে—এখানে আবার পুনর্বর্ণনা কেন ?

কাব্যের অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে তবে কিসে? অঙ্গপুষ্টি হইয়াছে কতকগুলি মামুলি কথায়। সে সব কথা পূর্ব্ববর্ত্তী মঙ্গলকাব্যেও নিকৃষ্ট উপাদান হিসাবে পূর্ব্বেই অঙ্গীভূত হইয়াছে।

জগন্নাথ পুরীর বর্ণনা, ডাকিনী যোগিনীর উপদ্রব, গঙ্গাবতরণের পৌরাণিক কথা, সংক্ষেপে রামায়ণ কাহিনী, এয়োদের নামের তালিকা, বাঙ্গালীর ভোজ্যদ্রব্যের তালিকা ও রন্ধন-গৃহের উপাদান উপকরণের বিশেষতঃ বিবিধ চাউলের ফিরিস্তি, অষ্টমঙ্গলার কথাসংক্ষেপ—এইগুলি দিয়া এই কাব্যাংশের অঙ্গপুষ্টি করা হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কবিত্বের কোন বালাই নাই।

বাদশাহী ব্যাপার বর্ণনায় কবির ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আছে। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বেও কোন কোন কবি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু আরবি পারশি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাহা এক হিসাবে অকারণে। কারণ, তাঁহারা মুসলমান-রাজদরবারের কথা কোথাও বলেন নাই—মুসলমানী পরিবেষ্টনীর সৃষ্টির প্রয়োজন তাঁহাদের ছিল না। ভারতচন্দ্র এই অংশে বাঙ্গালায় মোগল অভিযান ও মোগল দরবারের কথা বলিয়াছেন। যথাযথ আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে এবং রস জমাইতে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ভারতচন্দ্রও বলিয়াছেন—এসকল কথা আরবি পারশী ও হিন্দুস্থানীতে বলাই উচিত হইত। আমি আরবী পারশী হিন্দুস্থানী বই পড়িয়া ঐ সব ভাষা শিখিয়াছি—

"পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবার পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল ।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥"

প্রভূত পরিমাণে মুসলমানী শব্দের সমাবেশে ভারতচন্দ্র মানসিংহ-জাহাঙ্গীর-ভবানন্দের কাহিনীটিকে অভিনব একটা ভাষারূপ দিয়াছেন।

ভাষার ভঙ্গী ও পদবিন্যাস যে বিষয়ের অনুগামী হওয়া উচিত এবং ভাষাই যে বিষয়বস্তুর পরিবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারে, ভারতচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে এ বিষয়ে গুরুস্থানীয় ও নবরীতিপ্রবর্ত্তক এবং বর্ত্তমান 'যাবনীমিশাল' বাংলা ভাষার সূত্রপাত ভারতচন্দ্র হইতেই হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

কেবল অন্নদামঙ্গলের শেষ পরিচ্ছেদে নয়, বিদ্যাসুন্দরে ও অন্নদামঙ্গলের অন্যান্য লৌকিক অংশেও কবি মুসলমানী কথার প্রচুর প্রয়োগ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র পল্লীর কবি নহেন—তিনি নগরের কবি,—নবাবের আশ্রিত রাজার আশ্রিত কবি, ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের কবি। সেকালের সভ্যতা, শিক্ষা, নাগরিক জীবন। রাজ-রাজড়ার দরবার এবং ঐশ্বর্য্যপ্রতাপ—সমস্তের মালিক ছিল মুসলমান। কাজেই মুসলমানী ভাষা তখন নাগরিক সভ্যতারই ভাষা। এই ভাষাকে এড়ানো লোচনদাস নরহরির পক্ষে সম্ভব হইতে পারে, তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না—স্বাভাবিকও ছিল না। মুসলমানের সৌভাগ্যের যুগেই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র এই ভাষার সম্বন্ধে সুন্দর মন্তব্য করিয়াছেন। এই যুগের—

"ভাষাই বঙ্গদেশে হিন্দুর দুর্ভাগ্য ও মুসলমানের সৌভাগ্যের প্রমাণ দিতেছে। হিন্দুর গাঁ, মুসলমানের শহর, হিন্দুর কুঁড়ে

ঘর, মুসলমানের দালান ইমারত। শস্য কর্ত্তিত হইয়া যখন মুসলমানের সেবায় লাগে তখন তাহা ফসল। ক্ষুদ্র মেটে প্রদীপটি মাত্র হিন্দুর। ঝাড়, ফানুস, দেওয়ালগিরি ও শামাদান—সমস্ত বিলাসের আলোই মুসলমানের। হিন্দু অপরাধ করিলে কাজী মেয়াদ দেয়। বাদশাহ, ওমরাহ, উজীর, নাজির, পেযাদা, বরকন্দাজ, নফর সব মুসলমানী শব্দ—জমি জোত তালুক মুলুকও তাই।—কিন্তু স্বভাবের চন্দ্র সূর্য্য তরু ফুল পল্লবে হিন্দুর অধিকার ঘোচে নাই। পল্লীবাসী হিন্দু নিজের অন্তঃপুরে, নিজের ধর্ম্মটিতে ও প্রকৃতির মূর্ত্তিতে মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিতে দেয় নাই।"

তাই অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশ, বীরসিংহের অন্তঃপুর ও গাঙ্গিনী তীরের নাবিকটির কথায় মুসলমানী শব্দের ছোঁয়াচ বা আঁচ লাগে নাই। অন্নদামঙ্গলে সেকালের ইতিহাস সামান্য কিছু পাওয়া যায়। এই ইতিহাসটুকু কেবলমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তি ও অন্নদার মহিমা-প্রচারের জন্যই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুজাখাঁর পুত্র সরফরাজখাঁ ছিলেন বাংলার নবাব। আলিবর্দ্দি ছিলেন পাটনার শাসনকর্ত্তা। আলিবর্দ্দি সরফরাজকে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিলেন। দিল্লীর বাদশা তাঁহাকে মহাবৎজঙ্গ উপাধি দিলেন। কটকে কুলি খাঁ ছিলেন নবাব। তাহাকে দূর করিয়া আলিবর্দ্দি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৌলদজঙ্গকে (সৈয়দ আহম্মদ ?) উড়িষ্যার মসনদে বসাইলেন। মুরাদ বখর সৌলদকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করিল। আলিবর্দ্দি এ সংবাদ শুনিয়া সসৈন্যে উড়িষ্যায় গিয়া মুরাদকে যুদ্ধে হারাইয়া ও তাড়াইয়া সৌলদকে খালাস করিলেন। কটক হইতে যুদ্ধ জয় করিয়া আলিবর্দ্দি ভুবনেশ্বরে আসিয়া খুবই দৌরাত্ম্য করিলেন। *কবি বলিয়াছেন—নবাব

এই দৌরাত্ম্যের দণ্ড লাভ করিলেন বর্গীদের হাতে। ভুবনেশ্বরের সেবক নন্দী ত রাগ করিয়া সঙ্গে সঙ্গেই শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু শিব বলিলেন—"না না, এখানে রক্তারক্তি করে কাজ নেই—আমার ভক্ত বর্গীরাজকে স্বপ্ন দাও—সেই ব্যবস্থা করবে।"

ইহারই ফলে বর্গীর উপদ্রব। বর্গীর উপদ্রবে আলিবর্দ্দি বিব্রত হইলেন বটে কিন্তু হিন্দু প্রজাদেরই ত সর্ব্বনাশ হইল। কবি কৈফিয়ৎ দিয়া বলিলেন—'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?' এ কৈফিয়ৎ একেবারেই জোরালো নয়। কারণ, —'বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়।' এমন কি ধার্ম্মিকের চূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্র রায়েরই মহাবিপদ ঘটিল। 'মহাবৎজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়। নজরাণা ব'লে বারো লক্ষ টাকা চায়।'

এদিকে বর্গীরা দেশ লুটিয়া লইল—কৃষ্ণচন্দ্র কোথা হইতে টাকা দিবেন? তাঁহাকে আলিবর্দ্দি মুর্শিদাবাদে বন্দী করিয়া রাখিলেন। তিনি দেবীপুত্র, তিনি চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তব করিলেন। বলা বাহুল্য,

*মঙ্গলকাব্যগুলি মুসলমান রাজত্বে রচিত। মুসলমান ফৌজদার, সুবাদার, ডিহিদাররা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিত। এই অত্যাচারের কথা মঙ্গলকাব্যে একেবারে বর্জ্জন করা সম্ভব হয় নাই। ধর্ম্মমঙ্গলে সে কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই—তবে নিরঞ্জনের উষ্মা প্রকারান্তরে অত্যাচারেরই বর্ণনা। কবিকঙ্কণ কাব্যের সূচনায় আত্মকথাপ্রসঙ্গেই একথা বলিয়াছেন। মনসামঙ্গলকাব্যগুলিতে, বিশেষতঃ, বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ইহা বিস্তৃত ভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র মহবতজঙ্গ আলিবর্দ্দির অত্যাচারের একটি বর্ণনা দিয়াছেন।

চৌত্রিশ অক্ষরের স্তব শুনিলে দেবী আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তিনি অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বলিলেন—"যাও বৎস, তুমি কবি ভারতচন্দ্রকে আদেশ কর গিয়া আমার মঙ্গল গান গাইবার জন্য আর চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী তিথিতে আমার পূজা কর। তোমার আর ভয় নাই।" গ্রন্থের সূচনা ইহাতেই হইল।

যাহাই হোক, বর্গীরা বঙ্গদেশকে বার বার লুণ্ঠন করিয়া নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। সেই নিরন্ন দেশে যদি কোন দেবীর পূজা করিতে হয়, তবে যে অন্নপূর্ণারই পূজা করিতে হইবে এবং যদি কোন দেবীর মঙ্গলগান গাহিতে হয়, তবে যে অন্নদারই মঙ্গলগান গাইতে হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কবি তাই গোড়াতেই নিরন্ন দেশের একমাত্র উপাস্যা অন্নপূর্ণার স্তব করিয়া বলিয়াছেন—

কৃপাবলোকন কর ভক্তের দুরিত হর দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ।
তুমি দেবী পরাৎপরা সুখদাত্রি দুঃখহরা অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ।

ইহা অন্নের কাঙাল, নিঃসম্বল, হৃতসর্ব্বস্ব হতভাগ্য সমগ্র দেশের পক্ষ হইতেই কবির কাতর প্রার্থনা।

৩

ভারতচন্দ্র ধর্ম্মসম্বন্ধে সামঞ্জস্যবাদী। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে যে আমাদের সমাজে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব চলিতেছিল ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্যে সেই দ্বন্দ্বের নিরসন ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। এই সামঞ্জস্য-সাধনের জন্যই ব্যাসের বিড়ম্বনার একটি চিত্র আঁকিয়াছেন। শেষে অন্নদার মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

ইতঃপর ভেদদ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল। জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরিহর বিধি তিন আমার শরীর। অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলের চণ্ডীও এইরূপ কথা বলিয়া চাঁদকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

পদ্মাবতী পূজা কর চাঁদসদাগর। একই যুক্তি দেখ সব না ভাবিও পর ॥
ইতঃপর ভেদদ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল ॥
যেইজন দেখ বিষ্ণু সেই মহেশ্বর। কুবের বরুণ দেখ চন্দ্র দিবাকর ॥
যেইজন ভগবতী সেই বিষহরী। পদ্মার প্রসাদে আমি ভবসিন্ধু তরি ॥

কবি বলিয়াছেন—শিবের দেবত্ব স্বীকার না করিয়া বৈদিক ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। বৈদিক ধর্ম্মমণ্ডলে দক্ষযজ্ঞনাশচ্ছলে শিবের প্রবেশের কথা কবি তাই পরম উল্লাসের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। বেদে যে রুদ্র দেবতার কথা আছে—সেই রুদ্রই শিব, ইহা না বুঝার জন্যই দক্ষের সর্ব্বনাশ। প্রসূতির মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন—

বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়। সেই বেদ পড়ি মোর পতি হইল মূঢ় ॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ। দক্ষের এ দোষ নহে বেদের এ দোষ ॥

ইহার অন্য অর্থও আছে, বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই দক্ষ সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন—জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি ছিলেন তিনি উদাসীন। নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁহার ধারণাতীত ছিল। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতীক এই দক্ষ। শিবের দক্ষযজ্ঞনাশের অর্থ যজ্ঞসর্ব্বস্ব কর্ম্মকাণ্ডের অসারতা প্রদর্শন ও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। দক্ষের মুখে শিবনিন্দায় কবি শ্লেষের দ্বারা এই কথার ইঙ্গিত করিয়াছেন। এ শ্লেষ যেন কবির দক্ষের প্রতিই শ্লিষ্ট অনুযোগ।

সাকার-নিরাকার তত্ত্ব লইয়াও কবি আলোচনা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন সাকার দেবদেবী যে অভিন্ন একথা যেমন তিনি বলিয়াছেন—একই ব্রহ্ম যিনি নিরাকার—তিনিই যে ভক্তের জন্য সাকার হ'ন একথা বলিয়াও সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছেন—

সেই নিরাকার সেই সে সাকার তাঁরি রূপ ত্রিভুবনে।
তেজঃ ভাবে যোগী, দেবী ভাবে ভোগী কৃষ্ণ ভাবে ভক্তজনে।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষের বিশ্রাম কেবল তারে ভজনে।
ভারতের সার গোবিন্দ সাকার নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে।

পাতশাহের সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মমতের বিচারে ভবানন্দের মুখ দিয়া কবি বলিয়াছেন—

মাটি কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর। পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাহার মুরতি গড়ি পূজা করে যেই। নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবলি আঁচলে গিরা সার॥

কবি বলিয়াছেন—নিরাকার ব্রহ্ম জ্ঞানগম্য—তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইলেই সাকার ভাবিতে হইবে। নিরাকারকে ভক্তি করা চলে না। কৌতুকচ্ছলে কবি তাই একস্থলে বলিয়াছেন—

দেব উপদেব পড়ে মন্ত্রতন্ত্র ফাঁদে। নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে॥

ভক্তের জন্যই নিরাকার ব্রহ্ম দেহ ধারণ করিয়া করুণায় বিগলিত হ'ন।

ভারতচন্দ্র সামঞ্জস্যের কবি। তিনি সাংখ্য, বেদান্ত ও পুরাণের মধ্যেও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র এই বিশ্বকে এক ব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং জীব যে মায়া বা অবিদ্যার মোহে মুগ্ধ হইয়া এই পরম তত্ত্বকে ভুলিয়া থাকে একথাও বলিয়াছেন। বেদান্তের মত অনুসরণ করিয়া তিনি দক্ষের স্তবে বলিয়াছেন "তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর। নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।" মহামায়াকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন "সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া-ছায়া।"

তিনি সাংখ্যমতকে বেদান্তেরই অনুগামী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্রহ্মের সৃজনীশক্তিই বেদান্তের মায়া, বৌদ্ধদের আদ্যা এবং সাংখ্যের প্রকৃতি। এই মায়া, আদ্যা বা প্রকৃতিকেই ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন—ভবানী এবং চৈতন্যময় ব্রহ্মকে বলিয়াছেন—ভব বা শিব।

উত্তম মধ্যম স্থাবর জঙ্গম সব জীবের অন্তরে।
চেতন অচেতনে মিলি দুইজনে দেহী দেহরূপ ধরে ॥

এই দ্বৈতভাব লইয়া পুরুষপ্রকৃতির দ্বন্দ্বও দেখাইয়াছেন এবং দুই-ই যে এক, অর্দ্ধনারীশ্বর (হরগৌরী একতত্ত্ব হয়ে থাকে যবে) মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাও বলিয়াছেন। এখানে তিনি অদ্বৈতবাদী। আবার যখন বলিয়াছেন—

শক্তিযোগে শিব সংজ্ঞা শক্তিলোপে শব—
[শক্তিং বিনা মহেশানি সদাহং শবরূপকঃ।
শক্তিযুক্তো যদা দেবি শিবোঽহং সর্ব্বকামদঃ ॥]

তখন তিনি দ্বৈতবাদী। এই প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী —সত্ত্বগুণে ব্রহ্মা, রজোগুণে বিষ্ণু ও তমোগুণে মহাদেব তিনই প্রকৃতিরই সৃষ্টি, "হরিহর বিধি তিন আমার শরীর।"

ভারতচন্দ্রের চৈতন্যময় ব্রহ্মও শিব, আবার প্রকৃতির তমোগুণের অভিব্যক্তিও শিব। এই দুই শিবের পার্থক্য আছে। প্রথম শিব নির্গুণ ব্রহ্ম—দ্বিতীয় শিব সগুণ ব্রহ্ম। ভারতচন্দ্র শিবের কথায় এই পার্থক্য সর্ব্বত্র রাখিয়া চলেন নাই। শিবকে যেখানে নির্গুণ পর ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়াছেন, সেখানে শক্তি বা ভবানী হইয়াছেন মহামায়া। যেখানে সগুণরূপে কল্পনা করিয়াছেন সেখানে ভবানীকে প্রকৃতি-পুরুষ-রূপা ব্রহ্মসনাতনী ব্রহ্মময়ী বিশ্বমূলীভূতা বলিয়াছেন। তখন তিনি শিবেরও প্রসূতি। পুরুষ ও প্রকৃতি একই ব্রহ্মের অভিব্যক্তি—ইহা তত্ত্ব হিসাবে কবি স্বীকার করিয়াও কাব্যরচনায় রসসৃষ্টির জন্য তিনি দ্বৈতভাবকেই গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ, অদ্বৈত বুদ্ধিতে দর্শনতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা যায়—কাব্য-রচনার জন্য দুইকে পৃথক

করিয়া ভাবিতে হয়, নতুবা রসসৃষ্টি করা যায় না, অন্নদার মহিমাকীর্ত্তনও করা চলে না।

"গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে দোঁহে নানা খেলা করে।
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া একি করে চরাচরে।"

এই লীলার কল্পনা হইয়াছে—সাহিত্যেরই জন্য। ভারতচন্দ্র এই দ্বৈত-লীলাকে অবলম্বন করিয়াছেন—সাহিত্যসৃষ্টির জন্য।

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে আনন্দময় কোষ হইতে জ্ঞানময় কোষ, জ্ঞানময় কোষ হইতে মনোময় কোষ, মনোময় কোষ হইতে প্রাণময় কোষ, প্রাণময় কোষ হইতে অন্নময় কোষ। অন্নময় কোষের দ্বারা আত্মা জীবত্ব লাভ করিয়া সংসারে আসক্ত হয়। এই বিশ্ব প্রকৃতিরই সৃষ্টি। প্রকৃতি সৃষ্টি-রক্ষার জন্য জীবকে সংসারে আসক্ত করেন বলিয়াই ভারতচন্দ্র মায়া বা প্রকৃতিকে অন্নদার রূপে কল্পনা করিয়াছেন।

"অন্নপূর্ণা মহামায়া সংসার যাঁহার মায়া পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।"

জীবকে যে মহামায়ারূপিণী অন্নদা সংসারে আবদ্ধ করিতে চাহেন ইহা ভারতচন্দ্র বসুন্ধর—বসুন্ধরা, নলকুবর ও সুন্দরকে মর্ত্ত্যধামে অবতারিত করিয়াও দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইহারা মর্ত্ত্যের জীবত্বলাভ করিতে অনিচ্ছুক। ইহারা নরকে যাইতেও রাজী—তবু "মরতে যাইতে ভয় বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি।" "ভূমে কলি বড় বলবান—নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান।" মহামায়া বলেন "ভয় নাই—কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার। কর্ম্মহেতু জন্ম লৈতে আসা দেবতার।" এ সংসার কর্ম্মভূমি—কর্ম্মের মধ্য দিয়াই মুক্তি। অতএব জীবের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। মুক্তির আশ্বাস দিয়াই মহামায়া জীবকে সংসারে আবদ্ধ করেন, অন্ন দিয়া বাঁচাইয়া রাখেন এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়া মুক্তিরও সন্ধান দেন। অতএব তিনি জননী—তিনি বৈরিণী নন।

প্রকৃতি জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মের মধ্য দিয়া মুক্তি দিতে চাহেন—আর শিব চাহেন জ্ঞানের মধ্য দিয়া জীবকে মুক্তি দিতে। তিনি বলেন—মায়ায় আবদ্ধ হইও না,—পঙ্ক মাখিয়া স্নানের দ্বারা পঙ্ক মোচন করিয়া লাভ কি? যে সংসারে আবদ্ধ হইয়াছে তাহাকে—

চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেত-চিত্ত সেই সদা দুখী ॥

সংসারে অনেক সুখ আছে সত্য—তেমনি দুঃখও আছে। শিব বলেন, তোমার সুখেও কাজ নাই, দুঃখেও কাজ নাই। তুমি পরমজ্ঞান লাভ করিয়া চিদানন্দ উপভোগ কর। এই চিদানন্দের কাছে সংসারের সুখ তুচ্ছ,—অল্প। যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।

কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বই এদেশে লৌকিক ধর্ম্মদ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছিল এবং সেই দ্বন্দ্বই বিবিধ মঙ্গলকাব্যের রূপ ধরিয়াছিল। ভারতচন্দ্র এই দ্বন্দ্বের সমাধান করিয়াছেন—শিব ও শক্তির অভেদ কল্পনা করিয়া। তিনি দেখাইয়াছেন—কর্ম্মের মধ্য দিয়াই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। স্বভাবতঃ এ জ্ঞান জন্মে না। দক্ষ কর্ম্মকাণ্ডের মধ্য দিয়া নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া এই দিব্য জ্ঞান লাভ করিলেন। ব্যাসও কর্ম্মের মধ্য দিয়াই নিজের ভ্রান্তি বুঝিয়া এই পরমজ্ঞান লাভ করিলেন। অভিশপ্ত দেবসন্তানরা ঊর্দ্ধতন লোকের জীব মাত্র ছিল—তাহারাও অজ্ঞান ও অবিদ্যার মোহে মুগ্ধই ছিল। কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মের মধ্য দিয়াই তাহারা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইল। তপস্যার দ্বারা যে পরমজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়ীভূত নয়। গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া

বা গুরুর প্রসাদে যে জ্ঞান লাভ করা যায়—বিনা সাধনায় তাহা নিষ্ফল, —তাহা জীবনের অঙ্গীভূত হয় না। কর্ম্মের মধ্য দিয়া একে একে ভ্রান্তি দূর হইলে চিত্তশুদ্ধি ও মোহমুক্তি ঘটে এবং জ্ঞানের উদয় হয়—সে জ্ঞানের কাছে বহুশ্রুত-জাত জ্ঞান তুচ্ছ, গুরুপ্রসাদগত জ্ঞান তাহাতে পৌঁছিবার সোপান মাত্র। ভারতচন্দ্র গুরুর কৃপা পাইয়াও বলিয়াছেন—

ধর্ম্মে জানি সুখ হয় তবু মন নাহি লয়
অধর্ম্মে বিবিধ ভয় তবু তাই স্বাদে।
মিছা দারা সুত লয়ে মিছা সুখে সুখী হয়ে
যে রহে আপনা নিয়ে সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের
ভারত পেয়েছে টের গুরুর প্রসাদে।

বিদ্যাসুন্দর

ভারতচন্দ্র রঙ্গরস ও রতিরসের কবি। সে জন্য তাঁহার নিজস্ব কবিত্ব-প্রতিভা যেমন বিদ্যাসুন্দরে পরিস্ফুট, অন্নদামঙ্গলের অন্যত্র তেমনটি হয় নাই। অন্নদামঙ্গলের বাকী অংশ রসালফলের আচ্ছাদনীর মত। ইহার রসালো অংশ এই বিদ্যাসুন্দর। এই গর্ভকাব্যের রুচি বর্ত্তমান যুগের রসাদর্শের অনুগত নয়। তবু ইহার কবিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নায়ক-নায়িকার 'সুন্দর ও বিদ্যা' নামকরণ বেশ ব্যঞ্জনাময়। সৌন্দর্য্যবোধের সহিত বিদ্যাবত্তার মিলন বড়ই দুর্লভ ও দুরূহ—ক্বচিৎ কখনও ঘটে। যেখানে ঘটে, সেখানেই প্রকৃত কবিত্বের জন্ম হয়। এই মিলনের দূতীই প্রকৃতি—এই কাব্যে সেই পুষ্পকুঞ্জবাসিনী মালিনী। অন্তরের গভীর স্তরে এই মিলন—মনের সুড়ঙ্গ-পথে। এই মিলনের আনন্দ কবিচিত্ত গোপনেই উপভোগ করে—চরম দৈহিক আনন্দের Symbol-এর দ্বারাই বিদ্যাসুন্দরে সেই আনন্দের আভাস মাত্র দেওয়া হইয়াছে। কবিচিত্তের গোপন স্তরেই এই আনন্দলীলা পর্য্যবসান লাভ করে না। তাহা রসসৃষ্টির মধ্য দিয়া বহির্জগতে প্রকাশ লাভ করে। বিদ্যা ও সুন্দরের মিলন গোপনে সংঘটিত হইলেও তাহা গোপন থাকে না।

এখন এই কাব্যখানিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক—ইহাতে কতটা রসসৃষ্টি হইয়াছে।

তুলিকার কয়েকটি আঁচড়ে কবি বর্দ্ধমান শহরের ঐশ্বর্য্যের আভাস দিয়াছেন এইরূপ।

চৌদিকে শহর মাঝে মহল রাজার। আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার॥
থামে বাঁধা মত্ত হাতী হলকে হলকে। শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥

ইরাকী তুরাকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেশে থামে বান্ধা বাজী ॥
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু-পক্ষী যে আছে সংসারে ॥

সুন্দরকে দেখিয়া বর্দ্ধমানের কুলবধূগণের জল আনিতে গিয়া কি দশা হইল—তাহার রুচি যেমনই হউক, তাহার বর্ণনা বড়ই সরস—

দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচলী কষণ কটির বসন খসে অমনি ॥
চলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে এ বলে উহারে দেখ লো সই।
মদনজ্বালায় মরম গলায় বকুলতলায় বসিয়া অই ॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া যাই পলাইয়া সাগরপারে ॥
কহে একজন লয় মোর মন এ নব রতন ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া সোহাগে গালিয়া হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে ॥
আর জন কয় এই মহাশয় চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি।
হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে মাখি ॥
ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিণী ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥

ইত্যাদিতে শেষ পর্য্যন্ত রুচি শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছে। যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া কবি ঘন ঘন মিল দিয়া মালিনীর আবির্ভাবের আগেই ললিত পদের এই মালিকাটি গাঁথিয়াছেন।[১]

১ রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে ঠিক এই ছন্দে এইরূপ ভাবের রূপমুগ্ধা পুরনারীদের আক্ষেপের বর্ণনা আছে। ভারতচন্দ্র রঙের উপর রসান দিয়াছেন মাত্র।

ভারতচন্দ্রের হীরা একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বাস্তবনিষ্ঠ হীরা-চরিত্রটি কবি বাস্তব জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মনে হয়—ইহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের যেন পরিচয় ছিল এবং কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর কাছেই ইহার মালঞ্চ-ঘেরা বাড়ীটীও ছিল। হীরার পরিচয়—

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।
গালভরা গুয়া-পান পাকি মালা গলে।
কাণে কড়ি ক'ড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চূড়া বাঁধা চুল পরিধানে সাদা শাড়ী।
ফুলেব চুপড়ি কাঁথে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা মন্ত্র তন্ত্র জানে কতগুলি।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥

রামপ্রসাদের মত মালিনীর বেসাতিতে কবি যমকের একটা জমকালো তালিকা দিয়াছেন, সেটা বড় কথা নয়। ইহাতে মালিনীর যে চরিত্রটি

"হৃদয়-মাঝারে রাখিয়া ইহারে নয়ন-দুয়ারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো নিরখিতে ভালো দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥
কহে রামা আর গলে পরি হার এ হার কি ছার ফেলিগো টেনে॥
সাধ পুরে তবে হেন দিন হবে কোন জন কবে ঘটাবে এনে॥
বলে কোন আই আমি যদি পাই পলাইয়া যাই এদেশ থেকে।
নারী-কলা ফাঁদে বাঁধি নানা ছাঁদে প্রাণ বড় কাঁদে দে না লো ডেকে॥"

করিয়াছে তাহা কথা-সাহিত্যেরই উপযোগী। যে যুগে কথা-সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, কাব্যের মধ্যে তাহা অনুস্যূত থাকিত, সে যুগে এই চরিত্রটি কাব্যের রসপুষ্টিরই সহায়তা করিয়াছে।

বিদ্যার রূপ-বর্ণনা রচনা-চাতুর্যের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত—আলঙ্কারিকতার কসরৎ। বলা বাহুল্য, ইহাতে 'বিদ্যা'র রূপ কিছুই ফুটে নাই। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাবত্তা'র রূপই ফুটিয়াছে। ইহাতে একটি বাঙ্ময়ী অশরীরীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবন নাই।

সুন্দরের রূপ অবশ্য ইতিমধ্যেই ফুটিয়া উঠিয়াছে,—কোন বর্ণনার দ্বারা নয়—বর্দ্ধমানের কুলবধূদের রূপমুগ্ধতার মধ্য দিয়া।

বিদ্যার রূপবর্ণনাচ্ছলে কবি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ব্যতিরেক অলঙ্কারের সঙ্গে বাক্‌চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা এতই সুপরিচিত যে উৎকলন করিলাম না। এই যে বাকচাতুর্য্য—ইহাতেও ভারতচন্দ্র মৌলিকতার দাবী করিতে পারেন না। রামপ্রসাদও বিদ্যাসুন্দরে এইরূপ কষ্টকল্পিত আলঙ্কারিকতার সাহায্যে বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সেকালের চিরপ্রচলিত রূপবর্ণনার ভাষাই ছিল ইহা। তবু ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব আছে। উপমান-উপমেয়গুলিকে কবি অভিনব ঢঙে সাজাইয়াছেন। এই আলঙ্কারিক কলাচাতুর্য্যকে সে-কালের কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করা হইত। সে-যুগে সকল আর্টই ছিল decorative, কবিত্বের আর্টও সে-যুগে এইরূপ decorative না হইবে কেন?

আর একখানি সমসাময়িক কাব্য নিধিরাম আচার্য্যের কালিকামঙ্গল। ইহাতেও এই ধরণের রূপবর্ণনা আছে।

কবি বিদ্যা-সুন্দরের বিহার অসঙ্কোচে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সাহিত্যের বিচারে ইহা রুচিবিগর্হিত। বাক্‌-শিল্পরচনার দিক্ হইতে ইহাকে সরসই বলিতে হয়। কবি আলঙ্কারিকতার প্রাচুর্য্য ও

পদবিন্যাসের চাতুর্য্যের দ্বারা অশ্লীলতাকে কতকটা নিগূহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বিহার বর্ণনায় কবি সাধারণ ভাষা ত্যাগ করিয়া ব্রজবুলি ও বৈষ্ণব কবিদের ছন্দ আশ্রয় করিয়াছেন। এই ভাষায় এই ছন্দে রাধা-শ্যামের বিহারবর্ণনার প্রথা পূর্ব্ব হইতেই দেশে প্রচলিত ছিল। অন্নদার পূজার জন্য অবচিত পুষ্প বসুন্ধর কামার্ত্তা পত্নীর রতি-সজ্জায় নিয়োজিত করিয়া যে অপরাধ করিয়াছিল—রাধা-শ্যামের লীলা-বর্ণনার ভাষা ও ছন্দকে বিদ্যাসুন্দরের বিহারবর্ণনায় বিনিয়োগ করিয়া অনেকের মতে ভারতচন্দ্র সেই অপরাধ করিয়াছেন। এজন্য বসুন্ধরের মত ভারতচন্দ্রও বঙ্গ-সাহিত্যে শাপগ্রস্ত (রাহুগ্রস্ত ?) হইয়া আছেন।

বিদ্যাসুন্দরের মূল আখ্যান-বস্তুর সহিত কামকেলি-বর্ণনার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নয়। কামকেলির বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্য—বিদ্যা ও সুন্দরকে অবলম্বন করিয়া রসাইয়া রসাইয়া সেই কেলির বর্ণনা করিয়া নিজেও আনন্দ পাইয়াছেন—রাজশ্রুতিরও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। রাজসভার শ্রোতারাও ইহাতে নিশ্চয়ই প্রচুর রস পাইয়াছেন। এই অকারণ কেলিবর্ণনার জন্য বিদ্যাসুন্দর ব্রাহ্ম-যুগের সভ্যসমাজে অপাংক্তেয় হইয়াই ছিল। একশ্রেণীর শ্রোতা ব্রাহ্মযুগেও গোপাল উড়ের মারফতে ইহার রস কতকটা উপভোগ করিত।

শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যে খণ্ডিতার বর্ণনা একটা কবি-পদ্ধতি। বিদ্যা রহস্য করিবার জন্য সুন্দরের মুখে সিন্দুর-কাজল লাগাইয়া অন্যাসম্ভোগ চিহ্নিত করিয়া আসিয়া ঈর্ষ্যাকষায়িতা খণ্ডিতার রূপ ধরিল। ইহা গতানুগতিক কাব্য-পদ্ধতির অনুবৃত্তি মাত্র। ইহাতে কবির কোন মৌলিকতা নাই।

ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণে বিদ্যার মান ও মানভঙ্গের

চিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। মান-ভঙ্গের কিয়দংশ গীতগোবিন্দের অনুবাদ বলিলেই হয়। তবু ইহাতেও কিছু মৌলিকতা আছে, রূপের পূজারী রমণী-রসজ্ঞ কবি সুন্দরকে বিদ্যার পায়ে ধরাইয়া বলিয়াছেন—

হৃদে ধরে রাঙাপদ হ্রদে যেন কোকনদ নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার বলিহারি যাই তার হেন পদ মাথায় যে ধরে॥

রাধার মারফতে যে-সব কথা বলা হইত—বিদ্যার মারফতে সেসব কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র অল্প সাহসের পরিচয় দেন নাই।

চোরবেশে ধৃত সুন্দরকে দেখিয়া রাণীর মাতৃ-বাৎসল্যের উদয় ও খেদ বেশ সরস করিয়া বর্ণিত। সুন্দরকে দেখিয়া পুরনারীদের পতিনিন্দা—আর একটি সরস রচনা। পুরনারীদের পতিনিন্দা একটি চিরপ্রচলিত প্রথা, ইহাতে ভারতচন্দ্রের মৌলিকতা নাই। কিন্তু রচনা-চাতুর্য্যে কবি এ শ্রেণীর পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রচনাকেই পরাজিত করিয়াছেন। সহযোগী ও সমসাময়িক সুপরিচিত লোকদের লইয়া রঙ্গরস করাও কবির উদ্দেশ্য ছিল। সমস্তের মধ্য দিয়া সুন্দরের মদনমোহন রূপেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কবি এই প্রসঙ্গে সে-কালের কুলীন-রমণীদের জীবনের করুণ কাহিনীর আভাস দিয়াছেন—

দু' চারি বৎসরে যদি আসে একবার। শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার।
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়। তবে মিষ্টমুখ, নহে রুষ্ট হ'য়ে যায়।

কুলীন-কন্যা চরকায় সুতা কাটিয়া, সেই সুতা হাটে বিক্রয় করিয়া কিছু সঞ্চয় করিত—তাহাই দক্ষিণা দিয়া কুলীন পতির একদিনের দুর্লভ দাক্ষিণ্যটুকু লাভ করিত। এ কাহিনী বড়ই করুণ।

এক কথাতেই সমাজের একটি অঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—"শাশুড়ী বাঘিনী ননদ নাগিনী"—তখন ঘরে ঘরে। কিন্তু প্রত্যেক কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে তাহার উপর "সতিনী বাঘিনী।"

সারীকে ভৎ´সনাচ্ছলে শুকের মুখে সুন্দরের পরিচয় কবির রচনাচাতুর্য্যের একটি নিদর্শন। নববিবাহিতা বিদ্যার একটি বারমাস্যা বর্ণনা আছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর সুশীলার বারমাস্যায় ইহার চেয়ে ঢের বেশি প্রেমাকুলতা ও নবপরিণীতাসুলভ আসঙ্গলিপ্সা অভিব্যক্ত হইয়াছে।

সুন্দরকে ভারতচন্দ্র বিদ্যা ও সৌন্দর্য্য দিয়া গড়িয়াছেন—রক্তমাংসের দেহ সে পায় নাই। কাজেই তাহার বাঙ্ময় দেহে কবি প্রাণসঞ্চারের চেষ্টাও করেন নাই। কেবল কামসঞ্চারই ত প্রাণসঞ্চার নয়। যাহার দেহে ভৌতিক প্রাণই নাই—সে ঘাতকের কৃপাণের তলে প্রাণের জন্য আকুল হইবে কেন? সে রাজার সঙ্গে রসিকতা করিতেছে; আপনার পরিচয় না দিয়া রাজাকে হতবুদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে, চৌরপঞ্চাশিকার শ্লোকগুলি পাঠ করিয়া বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছে—শেষে মশানে গিয়া শব্দচাতুর্য্যের দ্বারা পঞ্চাশ অক্ষরে গ্রথিত স্তব পাঠ করিতেছে—কিন্তু নিজের আসন্ন মৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হইতেছে না। অক্ষর গণনার দ্বারা নিষ্পন্ন স্তব পঞ্চাশ অক্ষরে না হইলেও চৌত্রিশ অক্ষরে শ্রীমন্তও করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শ্রীমন্ত ছিল জীবন্ত—তাই সে প্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল—সে মৃত্যু আসন্ন জানিয়া অতি করুণ ভাষায় দাসী দুর্ব্বলার উদ্দেশেও তর্পণের জল নিবেদন করিয়াছিল। আসন্ন-মৃত্যুর ছায়ায় অঙ্কিত শ্রীমন্তের চিত্রের কাছে সুন্দরের চিত্র একটা ছায়ামাত্র।

একজন ছদ্মবেশী রাজপুত্র ও একটি রাজকন্যার গুপ্তপ্রণয়-কাহিনী লইয়া রচিত গল্প এদেশে বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। 'চৌরিপীরিতি'র মাধুর্য্য যে অপরিসীম, তাহা বহুকাল হইতে কবির

স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন—সে পীরিতি 'রেবারোধসি বেতসী-তরুমূলেই' হউক, আর 'যমুনারোধসি' তমালতরুমূলেই হউক। 'যমুনারোধসি' যে 'চৌরিপীরিতি' তাহা ধর্মভাবের সহিত বিজড়িত। ধর্মভাববর্জ্জিত চৌরিপীরিতির কাহিনী লইয়াও এদেশে বাংলায় কাব্য রচিত হইত। যেমন, কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর। মঙ্গলকাব্যের যুগে এই কাহিনী আবার দেবীর মহিমাপ্রচারের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া বিদ্যাসুন্দরের প্রচলিত কাহিনীর সৃষ্টি করিল। এই দেবী চণ্ডী নহেন, চণ্ডীরই রুদ্রাণীরূপ—কালী। ফলে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী কালিকা-মঙ্গল কাব্যের রূপ ধারণ করিল। এই কালিকামঙ্গলের প্রধান কবি গোবিন্দদাস (চট্টগ্রামের) ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের লোক। ইঁহার বিদ্যাসুন্দর অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট নয়। ভাষা সংস্কৃতানুগ, কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্যই ইহাতে বেশি। তারপর ক্ষেমানন্দ, মধুসূদন, কাশীনাথ, কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ইত্যাদির কালিকামঙ্গল। এই কাহিনীর সহিত কাশ্মীরের কবি বিহ্লনের চৌর-পঞ্চাশিকার কাহিনী সংযুক্ত হইল। কবি বিহ্লন কোন রাজকন্যার সহিত গুপ্তপ্রণয় করিয়া ধরা পড়েন। তাহার ফলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। কবি পঞ্চাশটি স্বরচিত আদি-রসাত্মক শ্লোক শুনাইয়া রাজাকে মুগ্ধ করেন। তাহার ফলে তিনি প্রাণ ও প্রাণাধিকা দুইই ফিরিয়া পান, কোন দেবদেবীর অনুগ্রহে নয়। এই কাহিনী বাংলার বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হওয়ায় প্রণয়ী রাজপুত্র একাধারে কালীর ব্রতদাস, অনুগৃহীত ভক্ত এবং কবিরূপে অঙ্কিত হইলেন এবং পঞ্চাশটি আদিরসাত্মক শ্লোকের দ্বারা কবিনায়ক রাজাকে মুগ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু নিস্তার পাইলেন—কালিকারই অনুগ্রহে। তাহা ছাড়া, কালিকার কৃপাতেই সুন্দর সিঁদকাঠির সাহায্যে সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া রাজকন্যার গৃহে প্রবেশ লাভ করিলেন।

বাংলার মঙ্গলকাব্যের ধারা ও পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যা ও সুন্দর শাপভ্রষ্টা দেবদেবী, কালিকার পূজাপ্রচারের জন্যই পৃথিবীতে অবতীর্ণ। ভারতচন্দ্র গ্রন্থশেষে বলিয়াছেন—কালী মূর্ত্তিমতী হইয়া সুন্দরকে বলিতেছেন—

তোরা মোর দাসদাসী শাপেতে ভূতলে আসি আমার মঙ্গল প্রকাশিলা।
ব্রত হইল পরকাশ এবে চল স্বর্গবাস নানা মতে আমারে তুষিলা ॥

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী ও চৌরপঞ্চাশিকা, কালিকামঙ্গল কাব্যের অন্তর্গত হইল। এই শ্রেণীর কালিকামঙ্গল কাব্য যতগুলি রচিত হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলই প্রাঞ্জলতায় ও কবিত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দররচনার অল্পদিন পূর্ব্বে রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। রামপ্রসাদও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগৃহীত কবি ছিলেন। রামপ্রসাদও সম্ভবতঃ রাজার আদেশেই এই কাব্য রচনা করেন। রাজা এই কাব্য পড়িয়া সম্যক্ তৃপ্তিলাভ না করিয়া ভারতচন্দ্রকে বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ দেন বলিয়াই অনুমিত হয়। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হওয়ার ফলে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের দশা হইল সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রের মত। রামপ্রসাদের গীতির ঐশ্বর্য্য ছিল—দেশের লোকও তাঁহার পদাবলীর ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া তাঁহার বিদ্যাসুন্দরকে ভুলিয়া গেল। রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক সম্বল ছিল, সে সম্বলের বলে রামপ্রসাদ চিরদিনই এদেশে ধর্ম্মগুরুরূপে পূজ্য। ভারতচন্দ্রের সে সৌভাগ্য হয় নাই। রামপ্রসাদ নিজেই বলিয়াছিলেন—গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হ'ব ব্যস্ত।

বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীর সহিত বর্দ্ধমানরাজপরিবারের কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন বিদ্যার পিতার রাজধানী রত্নপুর, কবি কৃষ্ণরাম বলিয়াছেন—বীরসিংহপুর। ভারতচন্দ্র

তাঁহার সুপরিচিত স্থানেরই নাম দিয়াছেন অর্থাৎ এমন একটা নগরের নাম দিয়াছেন যাহার বর্ণনায় কৃষ্ণনগরের বর্ণনা করিলেই চলিবে।

মানসিংহ প্রতাপাদিত্য-দমনের জন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছিলে ভবানন্দ তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বিবৃত করিতেছেন। মানসিংহের বঙ্গাভিযানের পরে বর্দ্ধমানরাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা। অতএব ইহা বর্দ্ধমানের কোন কাল্পনিক রাজার অন্তঃপুরের কাহিনী। এই বর্দ্ধমানকেই কবি ঘটনাস্থল কল্পনা করিয়াছেন—কাব্যের আবেষ্টনী-সৃষ্টির সুবিধার জন্য। বিহ্লনের চৌর-পঞ্চাশিকার রাজাটির নাম বীরসিংহ। ভারতচন্দ্র সেই নামই গ্রহণ করিয়াছেন। সুকবি সুপণ্ডিত সুন্দরের উপযুক্ত প্রণয়িনী রাজকুমারীকে এই কবি বিদুষী কল্পনা করিয়া তাঁহার নামও দিয়াছেন বিদ্যা। এরূপ ঘটনা যদি কোথাও ঘটিয়া থাকে তবে কাশ্মীরে কিংবা অন্য কোন স্থলে। ইতিহাসোক্ত ভবানন্দ-মানসিংহের সহিত সূত্রবন্ধনের জন্যই কবি বাংলা দেশের একটি সুপরিচিত স্থানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। নায়ককে কোন দূরবর্ত্তী দেশ হইতে সমাগত কল্পনা করার মধ্যে একটা Romance আছে—সেই Romance সৃষ্টির জন্য সুন্দরকে বহুদূরবর্ত্তী কাঞ্চীদেশের রাজকুমার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

বিদ্যাসুন্দরে দেবতার মহিমা প্রচার মুখ্য নয়—গৌণ; আদিরসাত্মক কবিত্ব-সৃষ্টিই মুখ্য। সুন্দর কালীপূজাপ্রচারের জন্য শাপভ্রষ্ট—কবি গ্রন্থশেষে এ কথার উল্লেখমাত্র করিয়াছেন। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে দেবতা আপন পূজা-প্রচারের জন্য যে ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন, যে সৎ ও অসৎ উপায়-কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন এবং যে ভাবে বিদ্রোহীর দণ্ডবিধান করিয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরে সে সকল কথা একেবারেই নাই। দেবদ্রোহী চরিত্রের সমাবেশ

একেবারেই নাই। তবে দেবী আপনার ভক্তকে অসাধ্য সাধনে সহায়তা করিতেছেন এবং ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য মশানে অবতীর্ণ হইতেছেন। ইহা মঙ্গলকাব্যের ধারারই অনুসরণ।

গুপ্ত প্রণয়ের কথা অথবা প্রণয়ি-প্রণয়িনীর উচ্চশ্রেণীর বৈদগ্ধ্যের কথা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে নাই। গোপনে গর্ভসঞ্চারের জন্য মায়ের তিরস্কার একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে মা ও মেয়ের কথা-কাটাকাটির মধ্যে যে ইতর শ্রেণীর রসিকতা ফুটিয়াছে—তাহাকে বিজাতীয় মনে করিবার কারণ আছে। কেহ কেহ মনে করেন—কুট্টনীচরিত্রের অবতারণা বিজাতীয়। দীনেশবাবুর মতে এই কুটনীচরিত্র মুসলমান সাহিত্য হইতে আমদানী করা। ইহা ঠিক নয়।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বড়াই-ই ত বাংলাসাহিত্যের আদি কুট্টনী। বৈষ্ণব সাহিত্যে বৃন্দা, ললিতা, বিশাখার কাজই অপকৃষ্টতা লাভ করিয়া মালিনীর কাজে দাঁড়াইয়াছে। কুট্টনী-চরিত্র কোন কোন মঙ্গল-কাব্যে ও গীতিসাহিত্যে পূর্ব্ব হইতেই ছিল। মীনচেতনে ছিল যোগিনী, ধর্ম্মমঙ্গলে ছিল নয়ানী। মৈমনসিংহ-গীতিকাব্যেও এইরূপ চরিত্রের সহায়তা লওয়া হইয়াছে। গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে রম্ভা, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে বিভুবামনী, কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে বিমলা, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে সে-ই হীরা। দূতীরূপে এ চরিত্রটি চিরকালই সাহিত্যে বর্ত্তমান আছে। ভারতচন্দ্র এই চরিত্র-রচনায় অনেকটা মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। হীরার বেসাতি কবিকঙ্কণের দুর্ব্বলার বেসাতিরই অনুসৃষ্টি। সুপুরুষদর্শনে পুরনারীদের মোহমুগ্ধতার বর্ণনা সংস্কৃত কাব্য হইতেই চলিয়া আসিতেছে—বাংলা কাব্যের ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। গৌর-গীতিকায় নদীয়-নাগরীদের রূপমুগ্ধতার

কথা নরহরি, লোচন দাস ইত্যাদি কবিরা খুব রসাইয়া রসাইয়া বলিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতচন্দ্রের চৌর-গীতিকায় মৌলিকতা নাই। বর্দ্ধমানের কবিরা নদীয়ানাগরীদের রূপরসিকতার বর্ণনা করিয়াছেন। নদীয়ার কবি বর্দ্ধমানের পুর নারীদের রূপমুগ্ধতার বর্ণনায় যেন তাহার পাল্টা জবাব দিয়াছেন।

দীনেশবাবু বিদ্যাসুন্দরে কয়েকটি অসঙ্গতির কথাও বলিয়াছেন। সুন্দর সন্ন্যাসী বেশে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় যে রঙ্গরসিকতা করিয়াছে, তাহা শ্বশুরের প্রতি জামাতার অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক আচরণ। জল্লাদের খড়্গ যখন সুন্দরের মাথার উপর—তখন সুন্দর নিশ্চিন্ত মনে গণিয়া গণিয়া পঞ্চাশ অক্ষরের আদ্যপ্রাসিক স্তব করিতেছে, ইহাও বড়ই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক। অর্থাৎ দীনেশ বাবু বিদ্যাসুন্দরে Realism বা বাস্তবনিষ্ঠতা প্রত্যাশা করিয়াছেন। আমি বিদ্যাসুন্দরকে অন্নদামঙ্গলের গর্ভকাব্য বলিয়াছি। বিদ্যার গর্ভসঞ্চার ছাড়া এই কাব্যে বাস্তবনিষ্ঠ কোন কথা নাই। যে কাব্যে ছয় মাসের পথ ছয় দিনে আসা যায় এবং দেবীদত্ত সিঁদকাঠি দিয়া মালিনীর বাড়ী হইতে রাজ-অন্তঃপুরের (কোন্ তলায়? একতলা নিশ্চয়ই নয়) বিদ্যার কক্ষ পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করা যায়—সে কাব্যে সঙ্গতি-অসঙ্গতি স্বাভাবিকতা-অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন তোলাই বিড়ম্বনা।

সুকুমার বাবু বলিয়াছেন। "রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে চরিত্রগুলি Typical প্রায় যেন Satirical. এই জন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিষ্প্রভ।" স্বাভাবিকতা দোষ নয়, গুণই। এ জন্য নয়, অন্যান্য অনেক কারণে রামপ্রসাদের কাব্য নিষ্প্রভ।

চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীস্তবের (চৌতিশা) প্রথা প্রচলিত ছিল,

ভারতচন্দ্র পঞ্চাশ অক্ষরের স্তব রচনা করিয়াছেন। বারমাস্যা বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। সুশীলার বারমাস্যার অনুসরণে ভারতচন্দ্র বিদ্যার একটি বারমাস্যা রচনা করিয়াছেন। শুক-শারীর মুখে কথা বসানো পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতি। বিদ্যাসুন্দরে সেই প্রথারই অনুবর্ত্তন করা হইয়াছে।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সহিত বিদ্যাসুন্দরের প্রধান প্রভেদ, বিদ্যাসুন্দরের রচনাভঙ্গীতে। বিদ্যাসুন্দর আখ্যান-মূলক খণ্ডকাব্য হইলেও ইহা প্রধানতঃ কতকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। গীতি-কবিতা হিসাবে অনেক প্রসঙ্গের স্বতন্ত্র মূল্য আছে। অন্যান্য মঙ্গল কাব্যে গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষার অজুহাতে অনেক অনাবশ্যক নীরস কথার সমাবেশ আছে, এ কাব্যে তাহা নাই। কবি যতটুকু সরস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন, ততটুকু বলিয়াই গল্পের ধারা রক্ষা করিয়াছেন। অন্যান্য কাব্যে নীতি-প্রচারের জন্য, লোকশিক্ষার জন্য এবং বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য যে অনেক অবান্তর কথার সমাবেশ হইয়াছে—অনেক পৌরাণিক উপাখ্যান আসিয়া পড়িয়াছে—এই কাব্যে তাহা নাই। ব্যক্তি, বস্তু, স্থান ইত্যাদির নীরস তালিকাও ইহাতে স্থান পায় নাই। কবি যেন কতকগুলি গীতি-কবিতাকে একত্র গ্রথিত করিয়া কাব্যখানিকে রূপ দান করিয়াছেন। মাঝে মাঝে অনেক গান এবং স্তবও সংযোজিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে আমরা যাহাকে গীতি-কবিতা বলি—বলা বাহুল্য বিদ্যাসুন্দরের গীতি-কবিতা সেই শ্রেণীর নয়। এইগুলিতে মনের আবেগের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি নাই। বেদনার কথা যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করা হইয়াছে। যেখানে বেদনার কথা আছে, সেখানে

কবি যে সংযম দেখাইয়াছেন, তাহা ইচ্ছাকৃত সংযম নয়। রঙ্গ-রসের কবি ভারতচন্দ্রের লেখনীতে বেদনার চিত্র স্বভাবতই ফুটিত না। অনেক স্থলে বেদনাকে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। রঙ্গরসের আতিশয্যে ছোটখাট সুখ-দুঃখ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। দাম্পত্য জীবনের গভীর বেদনাও তাহার পরিহাসের বস্তু ছিল। একমাত্র রতিরসের আবেশটাই কবির রচনায় আবেগে পরিণত হইয়াছে।

ভারতচন্দ্রের গীতি-কবিতা বাক্‌চাতুর্য্য ও মণ্ডনকলার সু-পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি মাত্র। রসের আবেদনটা হৃদয়-বৃত্তিকে আশ্রয় করে নাই—পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতা লাভ করিতে চাহিয়াছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে রঙ্গরস

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া অঞ্চলের লোকেরা চিরকালই রঙ্গপ্রিয়—বিশেষতঃ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাটি ছিল বঙ্গভূমির মধ্যে রঙ্গরসের রঙ্গভূমি। ভাঁড়-বিদূষকের দল সভাটিকে ইতরশ্রেণীর রসিকতাতেও মশগুল করিয়া রাখিত। এই সভার কবি ভারতচন্দ্রও প্রধানতঃ রঙ্গরসের কবি ছিলেন। তাঁহার লেখনীতে করুণরসের চিত্র তেমন ফুটিত না। তিনি যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনি একটু রঙ্গরহস্য করিয়া লইয়াছেন। অন্নদামঙ্গলে তিনি গোড়া হইতেই শিবকে পাইয়াছেন। শিবের আচরণ লইয়া রঙ্গলীলা দেখানোর পদ্ধতি সাহিত্যে আগে হইতেই প্রচলিত ছিল।

শিব বিবাহ করিতে গিয়াছেন। পরনে বাঘের ছাল সাপ দিয়া বাঁধা। 'কেশব কৌতুকী বড', কৌতুক দেখিবার জন্য কেশব গরুড়কে ইঙ্গিত করিলেন, অমনি গরুড়ের ভীতিপ্রদর্শনে সাপগুলি শিবদেহ ছাড়িয়া পলাইল। শিবের বাঘছাল খসিয়া পড়িল শিব হইলেন দিগম্বর! শাশুড়ী মেনকা ও এয়োরা লজ্জায় প্রদীপ নিভাইয়া দিল। 'দেখিয়া সকল লোক মশাল নিবায়।'

কিন্তু তাহাতেও সমস্যার সমাধান হইল না—'শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায়।' *

* বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গলে ব্যাপারটা আরো কুরুচিকর করিয়া লিখিয়াছেন ;

হাসি বলে শূলপাণি আইয়ো ভাণ্ডিতে জানি মধ্যে দাঁড়াইব লেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠাম আয়োর উড়িবে প্রাণ লজ্জা পাইয়া সবে যাবে ঘরে।

'একঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।"—কাজেই এ লোভ কি সংবরণ করা যায়? কাজেই নারদ ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

অনাদি-নিধন শিব শুধু অমর নহেন—তিনি অজরও। কবি রঙ্গরস-সৃষ্টির জন্য তাঁহাকে করিয়াছেন বুড়া। মেনকা বলিতেছেন—
আমার উমার দন্ত মুকুতা-গঞ্জন। বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন।
উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা। বুড়ার বিকট মুখে দাড়িগোপ পাকা॥
এ সমস্ত রঙ্গরস জমাইবার তৎকালসুলভ চেষ্টা।

উমাকে পাইয়া শিবের আনন্দের অবধি নাই। শিবের বিবাহের বৌ-ভাত ভাত দিয়া হইবে না—হইবে সিদ্ধি দিয়া। সতী দেহত্যাগ করার পর শিব আর সিদ্ধি খান নাই। তিনি নন্দীকে আদেশ দিলেন—
'অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বারো। ধুতুরার ফল তায় যত দিতে পার।
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত। সকলে প্রসাদ পাবে ঘোঁটি তারি মত।"

বিশ্বকর্ম্মা এই বিবাহে নূতন ঘোটনা কুণ্ডা যৌতুক দিয়াছেন। তাহাতেই সিদ্ধি ঘোঁটা হইল। কিন্তু শেষে মুশকিল হইল—"বস্ত্র বিনা বাস্তু ছেঁদা ছাঁকিবেন কিসে?" বাঘছালে ত আর ছাঁকা যায় না।

অভাবের সংসারে বাংলা দেশে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন্দল লাগিয়াই আছে। কবি এই লৌকিক ধারা অবলম্বন করিয়া নারদের সাহায্য না লইয়াও হরগৌরীর মধ্যে কোন্দল বাধাইয়া দিয়া করতালি দিয়াছেন। গৌরী বলিতেছেন—

গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ-পাথর-বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথাসিন্দুকের কুঁজি॥

বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।

ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধিলাড়ু॥

তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।

তবে মোরে অলক্ষণা কও কি কারণ।

করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।

তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে।

গৌরীর টিটকারিতে শিব রাগ করিয়া বাহির হইলেন। শিবের বাণিজ্য নাই, চাষ নাই, রাজসেবা তিনি জানেন না। তাঁহার সম্বল ভিক্ষা। অথচ ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার, চাষবাস বাণিজ্য-ব্যাপার।

সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়, নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥

শিব রাগ করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। পাগলা ভোলাকে পাইয়া পথের রঙ্গচিঙ্গারা রঙ্গ করিতে লাগিল—

কেহ বলে অই এল শিববুড়া কাপ।

কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥

কেহ বলে জটা হৈতে স্রাব কর জল।

কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥

কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল-ফল।

কেহ দেয় ভাঙ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥

কিন্তু কেহই এক মুঠা অন্ন দেয় না। কোথা হইতে দিবে? ভবানী শিবকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিশ্বের সমস্ত অন্ন সংহরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীর ঘরেও অন্ন নাই। শিব তখন বলিলেন—

গুমার হইল গুঁড়া না মিলিল ক্ষুদ-কুঁড়া ফিরিনু সকল পাড়াপাড়া,

হাভাতে যত্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়, হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া।

কত সাপ আছে গায়, হাভাতেরে নাহি খায়, গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জলে, দেহ না পোড়ায় বলে, না জানি মরিব কি ঔষধে।

অন্নপূর্ণার মহিমাকীর্ত্তনের জন্যই শিবের এই বিড়ম্বনার সৃষ্টি করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু—'অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে'—এই ব্যাপার লইয়া কবি যথেষ্ট রঙ্গ-রসেরও সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিবের পালা শেষ করিয়া কবি ব্যাসকে লইয়া পড়িয়াছেন। ব্যাসের যে রূপবর্ণনার দ্বারা কবি ব্যাসের কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতেই রঙ্গের ইঙ্গিত আছে—

দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তার, কক্ষলোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু,
পাকাগোঁপ পাকাদাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি, চলনে কতেক আঁটুবাঁটু।
কপালে চড়ক ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা, বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলিযুগ-বাঘ-থাবা, সারি সারি হরিনাম লেখা।

ব্যাস বড়ই হরিভক্ত—কাশীতে আসিয়া সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। হরি ছাড়া উপাস্য আর কেহ নাই—ইহাই প্রচার করেন। সেই সঙ্গে শিবের নিন্দা করেন—তাহার ফলে "ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল।" বিষ্ণু আসিয়া বুঝাইয়া গেলেন—"শিব পূজা না করিলে মোর পূজা নয়।" বিষ্ণুর কৃপায় ব্যাস কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইলেন। এইবার ব্যাস হইলেন—পরম শৈব। আর হরির নামও করেন না। "ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে হোক পরিণাম। অদ্যাবধি আর না লইব হরিনাম।" শিব ব্যাসের ভেদজ্ঞানে বিরক্ত হইয়া তাহার অন্ন বন্ধ করিয়া দিলেন। বুড়াকে সকলেই ভিক্ষা দিতে আসে, কিন্তু 'হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়।' তিন দিন ধরিয়া বুড়া উপবাস করিয়া রহিল। কাশীতে থাকিতে বুড়া ব্যাস অন্নাভাবে মারা যায়। তখন ভবানী মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া গৃহলক্ষ্মীরূপে ব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইলেন। শিব বৃদ্ধ

স্বামিরূপে গৃহে ছিলেন। তাঁহার সহিত ব্যাসের বিতর্ক হইল। তাহার ফলে শিব আত্ম-প্রকাশ করিয়া ব্যাসকে তর্জ্জন করিয়া কাশী হইতে দূর করিয়া দিলেন। ব্যাস শিবের উপরও চটিয়া গেলেন। তিনি হরিহর দুইজনকেই ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার উপাসনার সঙ্কল্প করিলেন এবং নূতন কাশী রচনার জন্য উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু গঙ্গা না হইলে ত' কাশী হয় না। ব্যাস গঙ্গার শরণ লইলেন। গঙ্গা ব্যাসকে ভর্ৎসনা করিয়া শিবনিন্দা করিতে নিষেধ করিল এবং ব্যাসের সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইল। ব্যাস তখন গঙ্গাকে গণিকা ইত্যাদি বলিয়া গালাগালি করিল।

"আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সেহ মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দবে পতঙ্গে প্রহার করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে।

ব্যাস গঙ্গার কাছে তিরস্কৃত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা শিবহীন কাশী গড়িতে চাহিল না। ব্যাস তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। তারপর ব্যাস ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—

জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঁই। তাঁর সঙ্গে তোর বাদ ইথে আমি নাই।

ব্যাস ফাঁফরে পড়িয়া তখন অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করিলেন। তিনি অন্নপূর্ণার কৃপার জন্য তপস্যায় বসিলেন। অন্নপূর্ণা পতিপুত্রদের পরিবেষণ করিতেছিলেন, এমন সময় ব্যাসের আহ্বানে তাঁহার ভাবান্তর হইল। একে ব্যাস শিবের সঙ্গে বাদ করিয়া নূতন কাশী রচনা করিতে চায়, তাহাতে অসময়ে আহ্বান। তিনিও ব্যাসের উপর রাগিয়া গেলেন। তারপর তিনি জরতীবেশ ধরিয়া ব্যাসকে

ছলনা করিতে চলিলেন। এই জরতী বেশের বর্ণনা রঙ্গচাতুর্য্যে অপূর্ব্ব। পাঠ্যপুস্তকের প্রসাদে ইহা সর্ব্বজনপরিচিত সেজন্য উদ্ধৃত করিলাম না।

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল—বল দেখি বাছা কোথা মরিলে সদ্যোমুক্তি লাভ করিব? ব্যাস বলিলেন—

"বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি হেথা বাস কর। সদ্যোমুক্তি হবি যদি এইখানে মর।"

ঝগড়া করিতেই বুড়ী আসিয়াছিল। সে রাগিয়া বলিল—

তোর মনে আমি বুড়ী এখনি মরিব। সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব।

ইহাত গালি নয়, ইহার চেয়ে পরম সত্য কি আর আছে?

এই বলিয়া জরতী ক্রোধভরে চলিয়া যান। ব্যাসদেব ধ্যানে বসিলেন—তাঁহার ধ্যান এখন অন্নদারই ধ্যান। কাজেই জরতীকে আবার ফিরিতে হইল! আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে মরিলে কি হইবে বলিলে? ব্যাস তাঁহার কথারই পুনরাবৃত্তি করিলেন। বধিরতার ভান করিয়া অধীরা হইয়া জরতী চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধ্যানের টানে আবার ফিরিতে হইল—এইরূপ বার বার ফিরিয়া জরতী একই কথা জিজ্ঞাসা করেন। ব্যাস কুপিত হইয়া বলিলেন,—"বিরক্ত করিস মাগী কিছু নাহি বোধ, ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে। গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে।" এইবার অন্নদার অভীষ্ট পূর্ণ হইলে 'তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈল অন্তর্ধান।'

এই উপাখ্যানটির মূলে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে সত্য, কিন্তু আগাগোড়া রঙ্গরসের ভঙ্গীতেই ইহা রচিত। কোন তত্ত্বের সন্ধান না পাইলেই রঙ্গসাহিত্য হিসাবে ইহা উপভোগ্য।

বিদ্যাসুন্দরের বহু স্থলেও কবি রঙ্গরসের অবতারণা করিয়াছেন। সুন্দরকে দেখিয়া পুরনারীরা আত্মহারা। কবি তাহাদের সম্বন্ধে রসিকতা করিয়া বলিয়াছেন—

সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কলসী খসিয়া। ভারত কহিছে শাড়ী পরলো কসিয়া।

মালিনীর আকৃতি ও চরিত্র বর্ণনায় কবি যথেষ্ট রঙ্গরসের পরিচয় দিয়াছেন। সুন্দর মালিনীর হাবভাব দেখিয়াই তাহার চরিত্র অনুমান করিয়া লইয়াছে। সে তাই ভাবিল—

মাসী বলি সম্বোধন করি আমি আগে।
নাতি বলে পাছে মাগী দেখে ভয় জাগে॥

কবি কড়ির গুণ গাহিয়া বলিয়াছেন—

কড়ি ফটকা চিঁড়া দই বড় নাই কড়ি বই কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়িলোভে মরে গিয়া কুলবধূ কড়ি পেলে ভুলে।

এই কড়িরোজগারের জন্য মালিনী কত ছলনাচাতুরীর সৃষ্টি করিতেছে—বিশেষতঃ মালিনীর বেসাতি-ব্যাপারের বর্ণনা বেশ কৌতুকাবহ। এই রঙ্গচিত্রের মধ্য দিয়া হীরার চরিত্রটি চমৎকার ফুটিয়াছে। অন্যভাবে তন্ময় সুন্দরের কাছে হীরার ছলনাময় এ আচরণ কৌতুকের বস্তু।

সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি, রাঙ তামা বারি করি, হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাতনাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া, দোকানী দোকান ঢাকে ডরে।
ভাঙাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট বলে শালা আলা টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটাআঁটি কান্দিয়া ভেজায় মাটি সাধু হয়ে বেণে হয় চোর॥
রাঙতামা মেকি মেলে রাশিতে মিশায়ে ফেলে বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে বাণিয়ারে ফেলে ফেরে কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া
দর করে এক মূলে জুখে লয় দুনা তুলে ঝগড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরূপণ কাহনেতে চারিপণ টাকাটায় সিকায় স্বীকার।
এরূপে করিয়া হাট ঘরে গিয়া আর নাট বাঁকা মুখে কথা কয় চোপা।
সুন্দর ওঝায় বোঝা তবু নয় মুখ সোজা যাবত না চোকে লেপাজোখা।

দিয়াছে যে কড়ি তার দ্বিগুণ শুনায় যার সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয় এই যে উচিত হয় বুনিপোর উপযুক্ত মাসী।

বিদ্যা ও 'নাতিনী ঘাতিনী' মালিনীর কথোপকথনেও রঙ্গরসের ছড়াছড়ি। বাহুল্য ভয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল না।

সুন্দরের সন্ন্যাসিবেশে রাজদর্শনের মধ্যে কৌতুকের অপপ্রয়োগই আছে। কোটালের নারীবেশধারণ এবং চাতুরী করিয়া সুন্দরকে ধরিয়া ফেলার বর্ণনায় কবি যথেষ্ট রসিকতা দেখাইয়াছেন। এখানে রসিকতা বেশ সুরুচিসম্মত হয় নাই। পুরনারীগণের পতিনিন্দা আগাগোড়া কৌতুকরসেরই রচনা। সেকালে হাস্যরসপুষ্টির সব চেয়ে বড় উপাদান ছিল অশ্লীল ইঙ্গিত। ইহাতে তাহার অভাব নাই। দোয়াত কলম সারস্বত সাধনার অঙ্গ। ইহা আমাদের কাছে পবিত্র দ্রব্য। এই দোয়াত কলম লইয়া নোংরা রসিকতা এ যুগের কোন পাঠক সহ্য করিবে কি ?
ভারতচন্দ্রের বেপরোয়া উপমায় হিন্দুর পরম পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞাহুতির যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহার তুলনায় দোয়াত কলমের অদৃষ্ট ভালো।

*   *   *   *   *

মানসিংহ ভবানন্দের অতিথি লইলেন। দারুণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মানসিংহের সঙ্গের লোকেরা বড় বিপদে পড়িল। কবি ইহাতে রঙ্গরসের অবসর পাইলেন। তিনি তাহাতে আমোদ পাইয়া লিখিলেন—
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার। ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার।
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি। কালোয়াত ভাসিল লাউ বুকে ধরি।

পাতশার সঙ্গে ভবানন্দের তর্কবিতর্ক হিন্দুমুসলমানের আচার আচরণ লইয়া রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দাসুবাসুর আক্ষেপও তাহাই। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব ঘটাইয়া কবি কৌতুক অনুভব করিয়াছেন।

'ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত, বিবি লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত।'
ইত্যাদি বর্ণনার দ্বারা কবি বিবিদের দুর্গতির কথা বলিয়া খুবই আনন্দ পাইয়াছেন। ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগের দ্বারা কবি রস জমাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ভবানন্দ দিল্লী হইতে রাজত্বের ফারমান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। কাহার ঘরে আগে যাইবেন—তাহা লইয়া দুই রাণীসতীনে কলহ। ইহাতে রঙ্গরস প্রচুর। কবি বলিয়াছেন—

দু' সতিনে কন্দল নইলে রস নহে, দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে।

বড় রাণী চন্দ্রমুখী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছে—

তিন ছেলে কোলে আর দড় হ'ব কবে।
আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে।
দড় বেলা জিনিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হইত প্রভু আনিতেন ধরি।
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া।
সুয়া যদি নিম দেয় সেই হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হ'ন তিনি।

পুরনারীদের পতিনিন্দায় ভারতচন্দ্র নিজের সহযোগী রাজ-কর্ম্মচারীদের লইয়াই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বোধ হয় এই অংশ বারবার শুনিতেন।

কবি নিজেকেও এই পরিহাস হইতে রেহাই দেন নাই। তিনি যে কামশাস্ত্রবিদ্ কবিটির কথা এখানে বলিয়াছেন—সে কবি তিনি নিজে ছাড়া আর কেহ নয়। অবশ্য কল্পিত দারিদ্র্য কাব্যালঙ্কারের জন্য।

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেঁটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিবাহের প্রভু॥

সেকালের বঙ্গরসিকতা এইরূপই ছিল। বর্ত্তমান যুগের মার্জ্জিত রুচি প্রবৃত্তির পক্ষে রস উপভোগ করা দূরে থাকুক, এ সমস্ত সহ্য করাই কঠিন। সে যুগের পাঠকদের বিচারে এই সমস্তই প্রথমশ্রেণীর বঙ্গ-সাহিত্য।

ভারতচন্দ্রের বাক্‌চাতুর্য্য

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যকারদের ভাষার তুলনায় ভারতচন্দ্রের ভাষার পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা বিশেষরূপ লক্ষ্যের বস্তু। ভাষার চমৎকারিত্ব ও হৃদয়গ্রাহিতার জন্য ভারতচন্দ্রের রচনা পড়িতে কোন কষ্ট ত হয়ই না, বরং বারবার পড়িয়াও তৃপ্তি হয় না। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করিলে অথবা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের সহিত তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে ভারতের রচনা কতটা সুখপাঠ্য। মঙ্গলকাব্যের অতিভাষণের যুগে ভারতচন্দ্রের মিতভাষণ সকল পাঠকেরই প্রীতিকর হইয়াছিল। যাহা সরস পরিচ্ছন্ন ভাষায় বলিতে পারিবেন না, কবি তাহা আদৌ বলেন নাই।

বর্ত্তমান যুগের ভাষার একটা মোটামুটি আদরা ভারতের ভাষায় পাওয়া যায়। ভারত 'যতদূর সম্ভব পাণ্ডিত্য সংবরণ করিয়া দুরূহ সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া খাঁটি বাংলা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। যে সকল শব্দের সহিত সেকালের পাঠক-সাধারণ সকলেই সুপরিচিত ছিল—কবি সে সকল শব্দেরই ভূরি প্রয়োগ করিয়াছেন। মুসলমানী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য 'যাবনীমিশাল' ভাষার যে প্রয়োজন—কবি ইহা ভাল করিয়াই বুঝিতেন।

ভারতচন্দ্র যে সকল চল্‌তি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন—আজকাল সেগুলির কিছু কিছু অচল হইয়া গিয়াছে,—যেমন—

আঁকশলী পোআ মোনা গড়ে মেকামেকি।

তবে অধিকাংশ শব্দই আমাদের সুপরিচিত। কবি যখন বলেন—

ফাঁফর হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো।
ভেভাচাকা লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো॥
আরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পয়ে।
হেন বর আনিলি কেমনে চোখ খেয়ে॥ অথবা

কপালে টনক নড়ে হাত হৈতে হাতা পড়ে উছট লাগিয়া পদ টলে।

তখন আমরা আমাদের খাঁটী মাতৃভাষার সাক্ষাৎ পাই:

ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, পার্শী, বাঙ্গালা ও হিন্দী এই চারি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। যথোপযুক্ত শব্দের অভাব তাঁহার কখনো ঘটে নাই। যেখানে যে ভাষার যে শব্দটির দ্বারা সম্যক্‌রূপ ভাবপ্রকাশ হইবে সেখানে ঠিক সেই শব্দটি বসাইতেন। তাহা ছাড়া, পরিবেষ্টনী সৃষ্টির জন্য যে শব্দাবলীর প্রয়োজন হইত—সেগুলি তিনি যে কোন ভাষা বা উপভাষা হইতেই গ্রহণ করিতেন। অন্নদামঙ্গলের পৌরাণিক অংশে সংস্কৃত শব্দেরই প্রাধান্য দেখা যায়। হাটহাজার, রাজদরবার, শহরের আহহাওয়া ইত্যাদির বর্ণনার সময় তিনি যতদূর সম্ভব সংস্কৃত শব্দ পরিহার করিয়া বর্ণনীয়ের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন উপভাষা হইতে নির্ব্বাচন করিয়া লইতেন।

কবি বাংলার বহু লক্ষ্যার্থক পদগুচ্ছ (Idiom) ও প্রবাদপ্রবচনকে কাব্যের চরণে স্থান দিয়াছেন। লোকে যে প্রবাদ-প্রবচনগুলিকে পূর্ব্ব হইতে ব্যবহার করিত সেগুলির অভিনবরূপ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাইয়া তাহারা পুরাতন রূপ ভুলিয়া নূতনরূপকেই গ্রহণ করিয়াছে। সেইরূপ কতকগুলি চরণ ও অলঙ্কারাঢ্য আভরাণকজাতীয় কতকগুলি চরণ এখানে উৎকলন করিতেছি।

১। হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায় হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া। ২। খুঞে তাঁতী হয়ে দেও তসরেতে হাত। ৩। মন্ত্রের

সাধন কিংবা শরীর পতন। ৪। যতন নহিলে কভু মিলয়ে রতন
৪। নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। ৬। কড়িতে বাঘের
দুধ মিলে। ৭। বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা। ৮। গোড়ায়
কাটিয়া মাথায় জল। ৯। বড়র পীরিতি বালির বাঁধ ক্ষণে হাতে দড়ি
ক্ষণেকে চাঁদ। ১০। পড়িলে ভেড়ার শিঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার
১১। ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে। ১২। সে কহে বিস্তর
মিছা যে কহে বিস্তর। ১৩। যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য
লোকে লাঠি বাজে। ১৪। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা
যখন। ১৫। দোষ হয়ে গুণ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়। ১৬। বুঝি ব
চোরের ধন বাটপাড়ে লয়। ১৭। হায় বিধি পাকা আম
দাঁড়কাকে খায়। ১৮। মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়
১৯। এক ভস্ম আর ছার দোষগুণ কব কার। ২০। না ধরিলে
রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ। সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ। ২১।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন। ২২। নগর পুড়িলে দেবালয়
কি এড়ায়। ২৩। খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট। ২৪। মাটিমুঠ
ধর যদি সোনামুঠা হবে। ২৫। কত কষ্টে এঁটে মেলে নাহি
মেলে থোড়।

"ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রবাদের যে অধিকতর প্রাচুর্য্য দেখিতে
পাওয়া যায় তাহার কারণ লৌকিক সাহিত্যের বাস্তবতা, আমোদ ও
রসিকতা এই ধরণের রচনায় অধিকতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল
বাক্যরীতিকে সরস, সহজ ও সতেজ করিবার জন্যই যে লৌকিক
প্রবাদ ও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ আপনাআপনি আসিয়া পড়িবে তাহা
কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তাহা ছাড়া, ভারতচন্দ্র ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও
সাহিত্যের স্বল্পাক্ষর গাঢ় রচনার রসজ্ঞ। সংস্কৃতের আদর্শে বাক্‌সংহতি ও

বাক্‌চাতুর্য্যের যে চমৎকারিতা ভারতচন্দ্রকে প্ররোচিত করিয়াছিল—তাহার সঙ্গে প্রবাদের সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় রসিকতার অনৈক্য ছিল না। এমন কি তাঁহার অনেকগুলি সরস প্রবচন সংস্কৃত বাক্যের ভাবানুবাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" [ডাঃ সুশীলকুমার দে]

বাংলা ভাষায় প্রচলিত লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গ (Phrase and Clause) ভারতচন্দ্রের রচনায় প্রচুর। যেমন—

১। ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল। ২। মুখে এক মনে আর কেবল ক্ষুরের ধার ঠারেঠোরে করিবে প্রচার। ৩। কেবা দুই মাথা ধরে গুপ্ত কথা ব্যক্ত করে। ৪। আকাশপাতাল ভাবি না পায় উপায়। ৫। সাতপাঁচ মন করি প্রেমেতে পূরিল। ৬। এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ। ৭। ইহা বই জানি যদি তোমার দোহাই। মরিলে না পাই গঙ্গা দুটি চক্ষু খাই। ৮। মাটি খেয়ে কহেছিনু বিদ্যা বিদ্যমানে। ৯। টালটোল এখন তখন। ১০। আটে পিঠে দড় যেই সেই দড় হবে। ১১। চোর হেন দাম্বর রমণী রৈল চেয়ে। ১২। যেমন নিমক খালি হালাল করিলি ভালি। ১৩। পাত্রমিত্র গোবরগণেশ। ১৪। এখনি ধরিবে সাপ কান্দনী গাইয়া। ১৫। সাপের মাথায় ভেকেরে নাচায় কেমন কুটিনী সে বা। ১৬। না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি কলসী কিনিতে তোরে। ১৭। বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধ'রে দিতে পারি চাঁদ। ১৮। তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে। ১৯। আমার মাথার কিরে চাতুরী না কর।

মিল, অনুপ্রাস ও বিবিধ অলঙ্কারের জন্য কতকগুলি চরণ যেন অলক্তরঞ্জিত হইয়া নীরস ভাষার সেঁউতিকে সোনায় পরিণত করিয়াছে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিই—

কিবা মনোহর কর মৃণালের গর্ব্বহর অঙ্গুলি চম্পক চারুদল !
ফনিরাজ ফণমণি কঙ্কণের কণকণি নানা অলঙ্কার ঝলমল। (১)
কমল পরিমল লয়ে শীতল জল পবনে ঢল ঢল উছলে কূলে
বসন্ত রাজা আনি ছয় রাগিণী রাণী করিল রাজধানী অশোক মূলে।
কুসুমে পুন পুন ভ্রমর গুণ গুণ মদন দিল গুণ ধনুক হুলে,
যতেক উপবন কুসুমে সুশোভন মধুমুদিত মন ভারত ভূলে। (২)

বসুন্ধরা বলে প্রভু এমন না শুনি কভু
একথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায় ওঝা গিয়া ঝাড়ে তায়
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে ? (৩)

সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার ;
সোনা ফেলি আঁচলে কেবলি গিরা সার। (৪)
দেব উপদেব পড়ে মন্ত্র-তন্ত্র ফাঁদে।
নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ে কাঁদে। (৫)
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িতে জিনে পয়োধরে হর ॥
জিনিলেক এত জনে যেজন বিচারে,
দেখলো লজ্জার হাতে সেই জন হারে। (৬)

নানাজাতি ফুটে ফুল উড়ি বসে অলিকুল কুহুকুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঋষির মন বসন্ত না ছাড়ে এক তিল। (৭)
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ। অস্ত গেল রোষ উদয় রস। (৮)
অধর বিম্বুর খাইতে মধুর চঞ্চল খঞ্জন পাখী
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক মদনের শুকপাখী। (৯)
শয্যা হইল শাল লজ্জা হইল কাল কি ছার বিছার জ্বালা। (১০)

উদর আকাশে সুতচাঁদের উদয়। কমল মুদিল মুখ রজ দূর হয়!
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনদিন উচ। অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ ॥(১১)
বাজ্য কৈলি ছারখার তল্লাস কে রাখে তার পাত্রমিত্র গোবরগণেশ।
আপনি ডাকাতি করি প্রজার সর্ব্বস্ব হরি হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ। (১২)

এইগুলি ছাড়া—রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গপ্রসঙ্গে। বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত। ফেরেব ফিরিবে কেরে ফাঁকিফুঁকি লেখে ইত্যাদি অনুপ্রাসাঢ্য চরণ বহুস্থলেই পাওয়া যায়।

কবি স্থলে স্থলে সাংসারিক অভিজ্ঞতা সূক্তি-সুভাষিতের ভাষায় ও ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।

আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার। সতিনী হইলে পতি বড়ই প্রহার।
বরঞ্চ শমনে লয় তাও সহে গায়। সতিনী হইলে স্বামী সহা নাহি যায়।
নারী যার স্বতন্তরা সেজন জীয়ন্তে মরা তাহার উচিত বনবাস।
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। যার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া।
এসুখে বঞ্চিত কহে রায় গুণাকর। দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর।
(বলা বাহুল্য ইহা কৌতুক মাত্র)

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর।
সেখানে দেবীর দয়া পীরিতি যেখানে।
যেখানে কোন্দল দেবী না রয় সেখানে।

ভারতচন্দ্র সুন্দরের মুখে অপূর্ব্ব কৌশলে সর্ব্বপ্রকার নায়িকার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ভারতের বাক্‌চাতুর্য্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

আপন চিহ্নিতে কেন হইলে খণ্ডিতা।
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা।
ভাবি দেখ বাসসজ্জা নিতি নিতি হও।
উৎকণ্ঠিতা বিপ্রলব্ধা একদিনও নও।
কখনো না হৈল করিতে অভিসার।
স্বাধীন-ভর্তৃকা কেবা সমান তোমার।
প্রোষিতভর্তৃকা হইতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাও আমায়।

অন্নদামঙ্গলের মধ্যে অনেক স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা আছে। এইগুলিতেও শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য, ছন্দের পারিপাট্য ইত্যাদি দেখা যায়। সেগুলিতে ভক্তিভাব বড় ফুটে নাই। অনেক স্থলে বক্তব্য বিশেষ কিছুই নাই—সম্বোধন পদ, বিশেষণপদ ও প্রতিশব্দসূচক পদের গুম্ফনমাত্র। ক্বচিৎ কোথাও একটু আধটু কবিত্বের ছায়াপাত হইয়াছে।

সূর্য্যবন্দনায়—অতিখরকর পোড়ে মহীধর সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে হাসে হৃষ্টমনে তোমার তত্ত্ব কে পায়?

সিদ্ধিপানমত্ত মহাদেবের কথায়—

খসিল বাঘের ছাল আলুথালু হাড়মাল
ভুলিল ডমরু শিঙা পিনাক ত্রিশূল।
ভারতের অনুভবে ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে
ভাবিনী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল।

শিবের স্তবে —

তব পদে আশুতোষ পদে পদে মোর দোষ
জানি কেন কর রোষ পামর উপর হে।

পিশাচে তোমার প্রীতি   মোর পিশাচের রীতি
তবে কেন মোব নীতি দেখে ভাব পর হে।

দেববন্দনাগুলিতে কবি তাঁহার প্রতিপালকের জন্য করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন। স্তবের বদলে মাঝে মাঝে গীত সংযোজন ও করিয়াছেন। এই গীতগুলিতে কবিত্বের ঐশ্বর্য্য বিশেষ না থাকিলেও রচনাচাতুর্য্য আছে। মিলের দৈন্য ত দূরের কথা—মিলের আতিশয্য দেখিয়া চমকিত হইতে হয়। মিলে কোথাও কৃচ্ছ্র চেষ্টা দেখা যায় না। ম+ন—এ মিল তিনি কখনো দিতেন না। হসন্ত বর্ণের সঙ্গে অকারান্ত শব্দের মিলও তিনি দিতেন না। কেবল শেষাক্ষরের মিল তাঁহাকে তৃপ্তি দিত না—শেষাক্ষরের পূর্ব্ব স্বরের মিলও তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রক্ষা করিয়াছেন। বর্ত্তমানযুগে উপধাস্বরের মিল না থাকিলে মিল বলিয়া স্বীকার করাই হয় না। ভারতচন্দ্র বহুদিন আগেই বর্ত্তমান যুগসম্মত মিলের পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আবার এ দেশের কবিরা মিল সম্বন্ধে শিথিলতা দেখাইয়াছেন।

এক বিষয়ে ভারতচন্দ্র বর্ত্তমানযুগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। লঘু ত্রিপদীর পর্ব্বে পর্ব্বে মিল এখন বাধ্যতামূলক নয়, তিনপর্ব্বে মিল ত দেওয়াই হয় না। ভারতচন্দ্র ত্রিপদীর দুই পর্ব্বে সর্ব্বত্র এবং তিন পর্ব্বে অনেকস্থলে মিল দিয়া গিয়া গিয়াছেন। পয়ারের পর্ব্বে পর্ব্বেও মিল দিয়াছেন, কোথাও কোথাও পয়ারের তিনপর্ব্বেও মিল দিয়াছেন। সংস্কৃতছন্দে মিল নাই—ভারতচন্দ্র সংস্কৃতছন্দে মিল ত দিয়াছেনই, তূণক ছন্দের অনুসৃতিতে পর্ব্বে পর্ব্বে মিলও দিয়াছেন। মিলগুলি অতিসহজে ও অনায়াসে তাঁহার লেখনীতে আসিত বলিয়া তাঁহার ভাষা কোথা আড়ষ্ট বা কষ্টার্থক হয় নাই।

ভারতচন্দ্র অলঙ্কারের রাজা। ভারতচন্দ্রের রচনা অনুপ্রাসে সমৃদ্ধ কতকগুলি অনুপ্রাসাঢ্য পংক্তি আগেই উদ্ধৃত হইয়াছে। যে অনুপ্রাস ঠিক অনুপ্রয়াস নয় অর্থাৎ কষ্টকল্পিত নয়, বাক্যের মধ্যে অনুস্যূত—সেই অনুপ্রাসের দৃষ্টান্তও অজস্র। দুই একটি উৎকলন করি।

হীরা এত বলি ছলে যায় চলি আঁচলে ধরিল ধনী
মাথাব কিরায় হীরায় কিরায় মণি ধরে যেন ফণী।

বাসার সুসারে হবে আশার সুসার। হীরারে শিরোপা দিল হীরাময় হার।
বদনে রদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত। সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত।

হেরি সুন্দর রূপ মনোহর স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরীভূষণ কাঁচলি কষণ কটির বসন খসে অমনি।
আশা বুঝি বাসু আশু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায়।

যমকের শ্রেণীবদ্ধ উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে মালিনীর বেসাতির হিসাবে। এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলিবার আছে :—এ যমকের জমকটা সংস্কৃত শব্দ অবলম্বনে নয়—২।১টা ছাড়া চল্‌তি বাংলা শব্দেরই যমক। বাছনি, খোঁটা, জুয়ায়, ভাঙ্গি, চিনি, জায়ফল, ফিরা, পান, আঁটি, পাতি চেয়ে ইত্যাদি বাংলা শব্দের যমক। রামপ্রসাদও এই অংশে যমকের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

এই অংশ ছাড়া—অন্যত্রও বহু যমকের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন—কাল পেলে শিরতোলা দিল যত শির। দোহাই না মানে হাই কথায় কথায়। দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলিমাছি তায়। বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম।

একই শব্দ একবার বাচ্যার্থে আর একবার লক্ষ্যার্থে প্রযুক্ত এইরূপ যমকের দৃষ্টান্তও আছে। যেমন—

মাটী খেয়ে এমন কৈল কাজ। পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সে লাজ!
কৃষ্ণচন্দ্রের মহিমা বর্ণনা ও বিদ্যার রূপ বর্ণনা ব্যতিরেক অলঙ্কারের তালিকা বা মালিকা।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে উপমার উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়।

দেখি সখীগণ চমকিত মন বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল রাজহংস দেখি হয়।

শতদল পদ্মমাঝে সূক্ষ্মদল সাজে। বিদ্যামুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে।

সজল জলদ তুল্য কজ্জল তাহায়।
কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায়।

না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ। সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ।
হৃদে ধরে রাঙা পদ হ্রদে যেন কোকনদ নূপুর ভ্রমর ধ্বনি ক'রে।

কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ,

এইরূপ—উৎপ্রেক্ষাও প্রচুর। যেমন—

সেই নয়নেতে যবে হয় দৃষ্টিপাত। বলবুদ্ধি হীন করে যেন অকস্মাৎ॥
কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ যেন শরজালে জরে। এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে ব্যাধের উপরে।
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায়। আর চক্ষু রাঙা হয়ে বড় জনে চায়॥
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষ্যে। এক চক্ষে তরুণী তরণী আর চক্ষে।
ক্ষীণ মাঝা দিন পেয়ে দিনদিন উচ। অভিমানে কালো মুখ নম্র-মুখ কুচ।
হরিদ্রা তড়িত চাঁপা স্বর্ণের শাপে। বরণ পাণ্ডুর বুঝি মমতার তাপে।

লুপ্তোপমার সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার সঙ্করও হইয়াছে কোথাও কোথাও—অবশ্য ইহাতে অলঙ্কারের দোষও ঘটিয়াছে। যেমন—

বদন মণ্ডল চাঁদ নিরমল, ঈষৎ গোঁপের রেখা
বিকচকমলে যেন কুতূহলে ভ্রমর পাঁতির দেখা!

এখানে বদন চাঁদের সহিত উপমিত হইয়াই সেই বাক্যেই উৎপ্রেক্ষায় আবার কমলের সহিত উপমিত হইতেছে। কিন্তু রূপকের সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার মিলনে নিম্নলিখিত পংক্তিতে কবি চমৎকার বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—

অধর বিম্বুর খাইতে মধুর চঞ্চল খঞ্জন আঁখি।
মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক মদনের শুকপাখী।

নাক বলিতে চঞ্চুই বুঝিতে হইবে। এ স্থলে ভারতচন্দ্রের অলঙ্করণে বেশ মৌলিকতা আছে। রূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে কবি যে সকল উপমা-রূপকের প্রয়োগ করিয়াছেন অধিকাংশস্থলে সেগুলিতে কবির মৌলিকতা নাই—সেগুলি সাহিত্যে চিরপ্রচলিত। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কবির নিজস্ব কৃতিত্ব আছে। যেমন, প্রতাপতপনে কীর্ত্তিপদ্ম বিকাসিয়া। রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচল করিয়া (পরম্পরিত রূপকের ইহা উৎকৃষ্ট নিদর্শন)। স্থলে স্থলে প্রচলিত ঔপম্যের রূপকেও বেশ বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে। যেমন—

যে দিকে নয়ন চায় ফুল বরষিয়া যায় মোহ করে প্রেমমধু ঢালিয়া রে।
নাসা তিলফুল পরে অঙ্গুলি চম্পক ধরে নয়ন কমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে অধর বান্ধুলী চাপে ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়ারে।

কবি শ্লেষ অলঙ্কারের চমৎকার উদাহরণ দিয়াছেন অন্নদার আত্মপরিচয়ে। সেই সুপরিচিত অংশ আর তুলিতে চাহিনা। দক্ষের শিবনিন্দায় ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত আছে, সেকথা আগেই বলা হইয়াছে। কৈলাসপর্ব্বতের বর্ণনা স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত। যখন করেন তিনি আলস্য মোক্ষণ · এলোকেশ শুদ্ধ বেশ মনোহর অতি। (চোর পঞ্চাশৎ—১২শ শ্লোকের বিদ্যাপক্ষের ব্যাখ্যা)—স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ব্যঞ্জনা-ধ্বনির একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত—বিদ্যা মানে বসিয়াছেন, মান ভাঙ্গানো বড়ই কঠিন। সুন্দর নাকে তৃণ দিয়া হাঁচিলেন।

"না কহিল সে বচন ত্যজেছিল আভরণ কর্ণমূলে কর্ণফুল দিল।"

হাঁচিলে 'জীব' বলিতে হয়। নিজের পতির কল্যাণকামনায় সধবার চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রকারান্তরে 'জীব' বলা হইল।

তুল্য-যোগিতার দৃষ্টান্ত—

তীর তারা উল্কা বায়ু শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে সঙ্গে বেগে যাবে কেবা॥
লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু পক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়॥
যেজন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারের উদাহরণ—

১। দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।
২। কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মমধু খায়।

বিশেষোক্তি অলঙ্কারের উদাহরণ—

করি যদি বিষ পান তথাপি না যায় প্রাণ অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়, চিরজীবী করিল গোসাঁই।

বিরোধ অলঙ্কারের উদাহরণ—

অচক্ষু সর্ব্বত্র খান অকর্ণ শুনিতে পান অপদ সর্ব্বত্র গতায়তি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি মুখ বিনা বেদ পড়ি সবে দেন কুমতি সুমতি॥

ইহাকে বিভাবনাও বলিতে পারা যায়—কারণ, এখানে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইতেছে।

অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত—

একের কপালে রহে আরের কপাল দহে কপালের কপালে আগুন।

অনুকূল অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত—যদিও জয়দেবের প্রসাদে।

অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।

বুকে চাপ কুচগিরি নখঘাতে চিরি চিরি দশনে করহ খণ্ড খণ্ড।

অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত—

রসিয়া চতুর করে চাতুরীর সার। অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার।

তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।

তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে।

অর্থান্তরন্যাসের উদাহরণ আছে বহু—

যেমন—

অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায় হেদে লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া।

একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।

তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইথে।

রাহুগ্রস্ত হ'ন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে।

অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।

পুষ্প সঙ্গে কীট সেও উঠে সুর মাথে।

বিরোধাভাসের দৃষ্টান্ত—

একি মনোহর দেখিতে সুন্দর গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।

গাঁথে বিনা গুণে শোভে নানা গুণে কাম মধুব্রত-পালিকা।

পরিবৃত্তির দৃষ্টান্ত—

মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া। ঘরে গেল দুঁহে দুঁহ হৃদয় লইয়া।

সমাসোক্তির দৃষ্টান্ত—

কহে একজন যায় মোর মন এ নবরতন ভুবন মাঝে

বিরহে জ্বলিয়া সোহাগে গলিয়া হারে মিলাইয়া পরিলে সাজে।

আর জন কয় এই মহাশয় চাঁপা ফুলময় খোঁপায় রাখি

হলদী জিনিয়া তনু চিকনিয়া স্নেহেতে ছানিয়া হৃদয়ে রাখি।

অপ্রস্তুত প্রশংসার দৃষ্টান্ত—

সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি। দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হ'ন তিনি

ইংরাজি antithesis-এর ধরণের অলঙ্কার—

জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার।
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়।

সহজিয়া সাহিত্য

বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের বহুপ্রদেশে বহু ধর্ম্মমতে অভ্যুদয় হইয়াছে। বঙ্গদেশ যে-ভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অস্বীকার করিয় তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে এমন কোন প্রদেশ নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম যুগ যুগ হইতে ভারতীয় সমাজকে শাসন করিবার জন্য বিধিনিষেধ ও অনুশাসনের বহু অস্ত্রশস্ত্র, বহু শৃঙ্খল, বহু পিঞ্জর, বহু অঙ্কুশ, বহু কশার ব্যবস্থা করিয়াছে। যাহাতে সমাজ কিছুতেই উচ্ছৃঙ্খল বা স্বেচ্ছাচারী না হয় সেজন্য এই রূপ ধর্ম্মশাসনের সতর্কতার কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই। বলা বাহুল্য, ইহাতে চিন্তা, চেষ্টা, বাক্য ও বুদ্ধির স্বাধীনতা যথেষ্টরূপে ক্ষুন্ন হইয়াছে। শাসনের দৃঢ়তা ও পরাধীনতা যাহারই হউক মানুষ তাহা বেশি দিন সহ্য করিতে পারে না। সেজন্য তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ খুবই স্বাভাবিক। বর্ণাশ্রমী শাসনের আতিশয্যের উত্তর দিয়াছে বাংলাদেশ বিদ্রোহের আতিশয্যের দ্বারা। বৈদিকযুগের পূর্ব হইতে প্রচলিত বাংলা দেশের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি বৈদিক সভ্যতাকে রাজশাসনেও নতশিরে বরণ করিতে পারে নাই। বাংলা দেশে তাই বহু অবৈদিক ধর্ম্মমতের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মের দিক হইতে তাহার কতটা লাভ হইয়াছে এপ্রবন্ধে তাহা আলোচ্য নয়। তবে তাহার আর একটা বড় লাভ হইয়াছে—তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের মূলে আছে, বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নব নব অবৈদিক ধর্ম্মের প্রচার।

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্য, সিদ্ধাচার্য্যদের চর্য্যাপদ, মঙ্গলকাব্য,

নাথযোগীদের সাহিত্য, পল্লীগাথাসাহিত্য, সহজিয়া সাহিত্য, বাউল সঙ্গীত ইত্যাদি সমস্ত সাহিত্যের মূলে অবৈদিক ধর্মের প্রভাব।

বাংলার বজ্রযানী বৌদ্ধগণ মুক্তির নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছিল—তাহারা বলিত জীবদ্দশাতেই মুক্তির স্বাদ লাভ করা যাইতে পারে। এই মুক্তি সর্ব্ববিধ সামাজিক, কৌলিক, পারিবারিক, জাতিভেদগত এবং ধর্ম্মনীতিগত সংস্কারের বন্ধন হইতে মুক্তি। এই মুক্তিই মহা-সুখ। বৌদ্ধেরা ঐশ্বরিক ও আধ্যাত্মিক শাসনের সংস্কার হইতেও মুক্তি চাহিয়াছে। স্বভাবতঃ ইহারা বৈদিক ধর্ম্ম ও সমাজের পরম বিরোধী। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ তাঁহাদের বাণীই বাংলার প্রথম নিজস্ব সাহিত্য। বৌদ্ধ সহজযানী বা সহজিয়া ইহাদের বলা হয়। ইহারা সংস্কারমুক্ত পুরুষ—ইহারাই প্রথমে সংস্কৃতের কঠোর সংস্কার বর্জ্জন করিয়া নিজস্ব অমার্জ্জিত ভাষাতেই আপনাদের বাণী উপনিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে কতকটা সন্ধি স্থাপন করিতে গিয়া হিন্দুদের একটি দেবতাকে বরণ করিতে পারিয়াছিলেন—সে দেবতা সর্ব্বসংস্কারমুক্ত মহাদেব। বৈদিক সংস্কারের বিরোধীদের উপযুক্ত দেবতা এই মহাদেব। ইহারা নাথযোগী সম্প্রদায়ের লোক। মহাদেবকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার মূলে আছে অবৈদিক নাথ-যোগীদের মহাদেব সম্বন্ধে বিশিষ্ট পরিকল্পনা।

বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যাদের অনুবর্ত্তী আর একটী সম্প্রদায় হিন্দুদের সঙ্গে ধর্ম্মমতের সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা তান্ত্রিক। ইহাদেরই একশ্রেণীর নাম কাপালী যোগী। তাঁহাদের দ্বারা তেমন কিছু সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই বটে, কিন্তু বাংলার শাক্তসঙ্গীতে তাঁহাদের

প্রভাব বিদ্যমান। সে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব লইয়া মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত—সে ধর্ম্মদ্বন্দ্ব প্রধানতঃ বৈদিক ধর্ম্মের সহিত বাংলার নিজস্ব লৌকিক ধর্ম্মের বিরোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে সেজন্য অবৈদিক দেবতাদের এবং ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রাধান্য দেখা যায়। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদিক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। যে ধর্ম্মে আপামরসাধারণ সকলেরই সমান অধিকার—জাতিকুল, শীল, জ্ঞান, বিদ্যা, আভিজাত্যের চেয়ে ভক্তিই বড়—পূজা, যাগযজ্ঞ, বলি ও পৌরোহিত্যের শাসন ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়া নামকীর্ত্তন করাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা—সেই বেদবিরোধী বেদান্তবিরোধী ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেব বৈদিকধর্ম্মের মূলকেন্দ্র নবদ্বীপের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হইয়া বর্ণাশ্রমী সমাজকে একেবারে বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। সেজন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বসংস্কার-মুক্তির বাণী বহন করে না। এক হিসাবে দেখিতে গেলে শ্রীচৈতন্যদেব বৈদিক ধর্ম্মের সহিত তাঁহার ভক্তিসর্ব্বস্ব ধর্ম্মমতের একটী সন্ধি-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভক্ত অনুচর সহচরগণ বর্ণাশ্রমী সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াই নিত্যানন্দ প্রচারিত তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের বাণীর সহিত তাহাদের রূপান্তরিত সামাজিক জীবনের সামঞ্জস্যসাধনের জন্য সর্ব্ববিধ বৈদিক সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে চাহিয়াছে। ইহারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। এই সহজিয়াদের মধ্যে আবার যাহারা কেবল বৈদিকসমাজ নয়, মানবসমাজের সর্ব্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্তি চাহিয়াছে তাহারা বাউল। "বাউলরা কাহারও প্রভাবে পড়েন নাই। শাক্ত প্রকৃতিপুরুষ কল্পনা বা বৈষ্ণব কৃষ্ণরাধা কল্পনা তাঁহাদের নিকট কোন অর্থই বহন করে না। অথচ বজ্রযানী সহজযানীদের নাড়ী, শক্তি প্রভৃতি বাউল ধর্ম্মে অপরিহার্য্য

সহজযানীদের মত সহজসুখ বা মহাসুখ ইঁহাদেরও উদ্দেশ্য।" (বাঙ্গালীর ইতিহাস)

রসসিদ্ধ যোগীরাও একশ্রেণীর সহজিয়া। ইঁহাদের মতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে জীবদ্দশাতে—এই মুক্তি কেবল সর্ব্বপ্রকার সংস্কার মুক্তিতে নয়, রসরসায়নের সাহায্যে এবং যোগবলে এই জড়দেহকেই সিদ্ধদেহ বা দিব্য দেহে পরিণত করিয়া শিবত্বলাভ করা যায়। এই শিবত্বলাভই জীবমুক্তি। ইহাই কায়া সাধন। এবিষয়ে নাথ-যোগীরা ইঁহাদেরই অনুবর্ত্তী।

গোরক্ষ বিষয়ে যোগীদের এই কায়াসাধনের কথা আছে। এই দেহকেই সাধনক্ষেত্র বাউলরাও মনে করিতেন—সেজন্য বাউলদের বলা যাইতে পারে। রসসিদ্ধ যোগীদের প্রশিষ্য

যোগসাধনার পথে যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি ও তন্ত্রের পথে যে সাধনার দ্বারা মহাশক্তির সাক্ষাৎ লাভ তাহাই বেদবিধিসম্মত।

ভক্তির পথে পরমতত্ত্বের যে রসরূপে উপলব্ধি—তাহাই বাংলার নিজস্ব সাধনা। নৈষ্ঠিক সাধকদের মধ্যে ব্রহ্মে রসোপলব্ধির ধারা দেশে চলিয়া আসিতেছিল, উপনিষদের যুগ হইতে। সগুণ ব্রহ্মে রসোপলব্ধির সাধনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারা মরমিয়া ও দরদিয়া সাধক। কবির, দাদূ, রজ্জব ইত্যাদি এই শ্রেণীর সাধক। রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়া রসের উপলব্ধি করিয়াছেন বৈষ্ণবগণ। ব্রহ্মময়ীর শ্যামারূপে মাতৃভাবে রসোপলব্ধি করিয়াছেন রামপ্রসাদ-প্রমুখ সাধককবিগণ। আর দেবদেবীর মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা, পরিচর্য্যা, উপাসনার দ্বারা প্রতীকের মধ্য দিয়া রসের উপলব্ধির প্রয়াস পাইয়া থাকেন গৃহী ভক্তেরা। সহজিয়ারা বলেন—নির্গুণ ব্রহ্মে, এমন কি সগুণ ব্রহ্মে রসোপলব্ধি কি করিয়া

সম্ভব? ব্রহ্মের প্রতি কখনো সহজ অনুরাগ জন্মিতে পারে না। ব্রহ্ম সগুণই হউক, আর নির্গুণই হউক, ইন্দ্রিয়ের অতীতের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ কি করিয়া সম্ভব? আর যদি ব্রহ্মের রূপকল্পনাই করিতে হয়—তবে জড় পাষাণ, দারু, ধাতুর মূর্ত্তি কেন? নিষ্প্রাণ দারু, পাষাণ, ধাতুর প্রতি অনুরাগ কখনো গভীর ও সহজ হইতে পারে না।

একমাত্র মানুষকেই আমরা সহজভাবে সত্যভাবে ভালবাসিতে পারি। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' ব্রহ্ম শূন্যে আছেন, বিশ্বে আছেন, স্বপ্নে আছেন, দারুপাষাণে আছেন—আর তিনি কি মানুষের মধ্যে নাই? পক্ষান্তরে, তিনি যদি কোথাও সম্পূর্ণ জীবন্ত ও জ্বলন্ত সহজ সত্যরূপে থাকেন—তবে মানুষের মধ্যেই আত্মারূপে আছেন। মানুষকে ভালবাসিয়াই পরম তত্ত্বের রস উপলব্ধি করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি জীবের (মানুষের) মধ্যে অনন্তকে অনুভব করার নামই ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। সমস্ত বৈষ্ণব তত্ত্বটির মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে।"

আদানে প্রদানে ভাববিনিময়ে মানুষের প্রতি ভালবাসাই ক্রমে নিবিড়তা লাভ করিয়া অলৌকিক হইয়া উঠিতে পারে। মহারসের আশ্রয় তাই ব্রহ্ম নহেন, ঈশ্বর নহেন, শ্যাম নহেন, শ্যামা নহেন, জড়প্রতিমা নহেন, মানুষই ঐ রসের আশ্রয়।

এই মানুষ সাধারণ মানুষ নয়, যাহাকে আমরা বলি বিশ্বমানব—সমগ্র মানবজাতি, (Humanity) তাহাও নয়। তাহা হইলে ইহা রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের বিশ্বপ্রেম হইত। মানুষমাত্রই অকৈতবী

ভালবাসার পাত্র হইতে পারে না। সহজিয়ারা সর্ব্ব মানবের প্রতি প্রেমানুভূতিকে অসহজ বা অস্বাভাবিক মনে করেন।

এই মানুষ 'আপন মনের মাধুরী দিয়া গড়া' মানুষ। সহজ আকর্ষণের পথ অনুসরণ করিয়াই প্রেমের পাত্র নির্ব্বাচন এবং সেই পাত্রটিকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত মাধুরী দিয়া পূর্ণ করা,—ইহাই সহজ সাধনা। সহজ মানুষ—man idealised, মনের মানুষ। এই মানুষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মধ্য দিয়া পরম তত্ত্বের রসোপলব্ধি সহজিয়াদের লক্ষ্য।

মানুষই রসের আশ্রয় বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান রূপে ভাবেন নাই—চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপেও ভাবেন নাই দ্বিভুজমুরলীধর মানবরূপেই কল্পনা করিয়াছেন—

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ। (চৈতন্য-চরিতামৃত)

তাঁহার প্রাকৃত নরলীলাই মাধুর্য্যের সার।

"ঈশ্বর স্বভাবে যদি মাধুর্য্য আস্বাদয়।
ভাবসিদ্ধ প্রেম তার কভু নাহি হয়।" রত্নসার।

শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য আরোপ করিয়াও মাধুর্য্য আস্বাদন করা যায়, কিন্তু তাহা নিম্নস্তরের সাধনা। তাহাকে ভাবসিদ্ধ প্রেমলাভ হয় না।

মনের মানুষ চেনার সঙ্কেত দিয়াছেন চৈতন্যদাস—

প্রেমে পুলকিত ভাবে বিভাবিত ডগমগ দুটি আঁখি।
রসের সাগরে সদাই সাঁতারে রূপ লাগি ধকধকি।
এই সব রস যাহাতে প্রকাশ স্বরূপ তাহার দেহে।
তাহারে ভজিবে স্বরূপ পাইবে শ্রীচৈতন্যদাস কহে॥

এই বর্ণনায় শ্রীচৈতন্য ছাড়া আর কাহাকেও মনে পড়ে না।

সহজিয়ারা বলেন—শ্রীচৈতন্যের অনুকল্পকেই ভাবারোপের দ্বারা মনের মানুষে পরিণত করিতে হইবে।

আমাদের অনুরাগ ধারা প্রধানতঃ দুই পথে প্রবাহিত হয়। একটি নারী-প্রেমের পথ—আর একটি ভক্তির পথ। যে মানুষের মধ্যে মহতী শক্তি নিহিত আছে, যে মানুষ নানা গুণে বিমণ্ডিত, যে মানুষ সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর, যে ভাবের মানুষ, রসের মানুষ, স্বভাবতঃ সে মানুষ ভক্তির পাত্র। সহজিয়াদের মতে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত সর্ব্ববন্ধনমুক্ত রসগদগদ মানুষই আদর্শ মানুষ। সেই মানুষে সহজিয়ারা ভাগবতী শক্তির বিকাশ দেখে। সেও অপূর্ণ মানুষ, কিন্তু সহজিয়ারা নিজের মনের গভীর ভক্তি আরোপ করিয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া লয়—সেই হয় সাঁই, নর-দেহে সেই ভগবান—সেই গুরুব্রহ্ম।

গুরু বিষ্ণু গুরুব্রহ্ম গুরুদান যজ্ঞকর্ম্ম গুরু হ'ন দেব মহেশ্বর।
গুরুর অধিক আর কি আছে সংসারে সার গুরুদেব সর্ব্বপরাৎপর।

এই যে গুরু ব্রহ্মকে ভজনা করিয়া পরম তত্ত্বের রসোপলব্ধি ইহাকেই লোকে 'কর্ত্তাভজা' বলে। গুরুবাদী সহজিয়া মতের তত্ত্ব ইহাই।

আর একটি পথ—নারীপ্রেমের পথ। আপনার নির্ব্বাচিতা দয়িতার মধ্যে আদর্শ নারীত্ব ও ভাগবতী শক্তির আরোপ। অন্তরের গভীর অনুরাগ ও মাধুর্য্য দিয়া এই নারীকে আদর্শ করিয়া রচনা করা হয়। 'মনের' উপাদানে ইহার ভাবময় গঠন—তাই এই নারীও মনের মানুষ। এই নারীও সর্ব্বসংস্কারমুক্তা সর্ব্ববন্ধনমুক্তা। তাই ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাসের মনের মানুষ রামী রজকিনী। সংস্কারের বাধা নাই বলিয়াই পরকীয়া প্রেমেও বাধা নাই।

বৌদ্ধ সহজিয়াদের কেহ কেহ বলিয়াছেন নরনারীর যৌন সম্পর্কের

মধ্য দিয়া মহাসুখের পূর্ব্বাভাস লাভ হয়। হিন্দু তান্ত্রিকরা সাধনসঙ্গিনীর সংসর্গে ইন্দ্রিয়দমনরূপ যোগাভ্যাস করিয়া মহাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন। এই সকল শ্রেণীর সাধনার মধ্যে বিশেষ ভাবে যাহা সাধারণ তাহা—সংস্কারমুক্তি।

শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মেরও মূলকথা রসসাধনা। সহজিয়াদের সঙ্গে প্রধান প্রভেদ—বৈষ্ণবধর্ম্মে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলায় গোপী ভাবে বিভাবিত সাধক সখীত্ব করিতেছেন এবং সখীত্বের আনন্দের মধ্য দিয়া রসোপলব্ধি করিতেছেন। আর সহজিয়ারা নিজে নরনারীর প্রেমের মধ্য দিয়া রসব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে চাহেন। বৈষ্ণবের রাধা ভাবময়ী—সহজিয়ার রাধা আপন প্রেয়সীর মধ্যে মূর্ত্তিমতী। বৈষ্ণব ধর্ম্মে Ideal realised— সহজিয়া মতে Real idealised. এক কথায় বৈষ্ণবসাধনা রসের পথে 'দেবতাকে প্রিয়' করে, সহজিয়া সাধনা ঐ পথে 'প্রিয়কে দেবতা' করে।

বৈষ্ণব সাধক কল্পলতার পরিপক্ক ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছে। সহজিয়ারা নারী দেহলতায় ফল পাকিয়া উঠিলেই তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছে।

যাহারা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে সহজ সাধনার অঙ্গীভূত মনে করে—তাহারা প্রকৃত সহজিয়া নয়। তাহারা যে মানুষের সঙ্গে পিরীত করে—সে মানুষ সামান্য মানুষ, সংস্কারদেহ মানুষ—'সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই সামান্য তাহার নাম।' ইহাদের আচরণ বা আদর্শ কোন সাহিত্যের প্রেরণাও দেয় নাই। মরমী সহজিয়ারা ইন্দ্রিয়াতীত মধুর রসের উপভোগ করিতে চায়—তাঁহাদের গুরু চণ্ডীদাস, লোচনদাস, নরহরি দাস ইত্যাদি। ইঁহাদের সহজ সাধনা—আধ্যাত্মিক সাধনা—অতি পিচ্ছিল দুর্গম পথে অভিসার—"চলইতে পঙ্কিল শঙ্কিল বাট"।

সহজিয়া সাধকগণ যে প্রেমের মধ্য দিয়া আত্মোপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন—সেই প্রেমের স্বরূপ চণ্ডীদাস এইভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন—

সখিহে, পীরিতি বিষম বড়।

যদি পরাণে পরাণে মিশাইতে পারে তবে সে পীরিতি দড়॥

ভ্রমরা সমান আছে কতজন মধুলোভে করে প্রীত।

মধুপান করি উড়িয়া পলায় এমতি তাহার রীত।

বিধুর সহিত কুমুদ পীরিতি বসতি অনেক দূরে।

সুজনে সুজনে পীরিত হইলে এমতি পরাণ ঝুরে।

কবি উপমার দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছেন এ প্রেম যৌন-সম্পর্কহীন—নিষ্কাম ও গভীর। বিধু ও কুমুদের উপমায় বলা হইয়াছে প্রেমই সাধনার ধন—সাহচর্যটা বড় নয়। ইহাকেই platonic Love বলে।

এই প্রেম যে অবাস্তব নয়, তাহা ইউরোপ ও এসিয়ার বহু কবি, শিল্পী ও সাধকদের জীবনসাধনা ইতিহাসে সাক্ষ্য দেয়।

সহজিয়ারা বলেন—

যেজন যুবতী কুলবতী সতী সুশীল সুমতি যার।

হৃদয় মাঝারে নায়ক লুকায়ে ভবনদী হয় পার।

প্রকৃত যে মনের মানুষ—সে যদি মনে বসতি করে—তাহা হইলেই প্রেম সাধনা সিদ্ধ হইল।

১। আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে ভিতর দুয়ার খোলা।
নিসাড়ি হইয়া চলো লো সজনি আঁধার করিয়া আলা॥

২। চণ্ডীদাস কহে লোকের বচনে কিবা সে করিতে পারে।
আপনা হৃদয়ে মনের মানসে নিরবধি ভজ তারে॥

কুল ত্যাগ না করিয়া মনে মনে যদি আপন প্রিয়তমসম্পর্কে কোন

নারী কুলটা (?) হয়—সহজিয়ারা তাহাকে সতীই বলিবে। বৈবাহিক সংস্কারটা বেদবিধিমূলক—উহার আবার মূল্য কি?

আর যদি প্রিয়তম বা প্রিয়তমার সঙ্গ লাভই হয়—তাহাতেই বা কি?

রজনী দিবসে হব পরবশে স্বপনে রাখিব লেহা।

একত্র থাকিব নাহি পরশিব ভাবিনী ভাবের দেহা।

যে মনের মানুষ, তাহার সম্বন্ধে একনিষ্ঠতা ও তন্ময়তাই সতীত্ব।

অন্যের পরশে সিনান করিব তবে সে এ নীতি সাজে।

আয়ানের সম্বন্ধে রাধার যে মনোভাব—নিজ পতির সম্বন্ধে সহজিয়া নারীর সেই মনোভাব। সহজিয়া নারীর পতি পার্থিব প্রিয়জন, আর মনের মানুষ অপার্থিব হৃদয়বল্লভ। পতি ও জগৎপতির মধ্যে এই চিৎপতির স্থান। মোট কথা, আসল সহজিয়ামতে নারীপ্রেম, ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগের জন্য নয়—ইহা মহাপ্রেমের অনুশীলনের জন্য। সহজিয়া সাধকগণ এমন কথাও বলিয়াছেন—

১। রাগের সম্মান জানে কামী কি কখন।
মদনাবিষ্টে আত্ম হারায় তখন। (রাগময়ী কণা)

২। যদি বাহ্য সুখে সদা মজ মোর মন
তবে ত না পাবে ভাই সে আনন্দ ধন। (প্রেমানন্দ লহরী)

৩। প্রকৃতি লইয়া বিলাস করিয়া কে কোথা পেয়েছে মণি।

দেহরতি লালসায় যে সাধক নারীদেহ স্পর্শ করে—সে জন্মে জন্মে নিস্তার পায় না। বাশুলী রামীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"ব্যভিচারী হৈলে প্রাপ্তি নাহি মিলে নরকে যাইবে তবে।

রতি স্থির মনে ভাব রাত্রি দিনে সহজ পাইবে তবে।"

এই ভাবে কামনাবর্জ্জিত সাধনার ফলে যখন নারীপুরুষে ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে তখনই পরম প্রেমের আবির্ভাব হইবে—

অভেদ পুরুষনারী যখন দেখিবে।
তখন প্রেমের তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিবে॥

প্রেম মানুষের সহজ ধর্ম্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—কিন্তু ইহার সম্যক্ অনুশীলনও তপস্যার ন্যায়। জ্ঞানতৃষ্ণা মানুষের সহজ ধর্ম্ম কিন্তু জ্ঞানের জন্য তপস্যা না করিলে সম্যক্ জ্ঞান লাভও হয় না। তেমনি যে মহাপ্রেমে আত্মার মুক্তি সে মহাপ্রেম বহুদিনের সাধনাসাপেক্ষ। এই প্রেমের যথাযথ অনুশীলনের জন্য নারীসংসর্গের প্রয়োজন। প্রকৃত প্রেমসাধনা গ্রন্থাদি অধ্যয়নে, শাস্ত্রবিধি-পালনে, সাংসারিক জীবন যাপনে, স্বার্থগত সকাম হৃদয়াবেগ-বিস্তারণে সম্ভব নয়। নারীর সহিত আত্মহারা প্রণয়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রেমের অনুশীলন সম্ভব—কিন্তু ইহাতেই পর্য্যবসান লাভ করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে—ইহা শুধু পরমতীর্থে পৌঁছিবার জন্য পথ মাত্র। হৃদয়ে মহাপ্রেমের উন্মেষ সাধিত হইলে আর নারীপ্রেমের কোন প্রয়োজন থাকিবে না। মধুচক্র রচিত হইলে আর পুষ্পের কি প্রয়োজন? বিল্বমঙ্গলের কথা স্মরণ করিয়া সহজিয়া বলে—'চিন্তামণি'র প্রয়োজন ততক্ষণই, যতক্ষণ না পরমচিন্তামণি লাভ না হইয়াছে।

সংস্কারমুক্তিই সহজিয়াদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বারবারই তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন তাঁহাদের সাধনা, আচরণ ও প্রেমসম্পর্ক সমাজশাসনের বাহিরে, বেদবিধির বিরুদ্ধ।

১। যুগল ভজন তাহার যাজন বেদ বিধি অগোচর।

২। মরম কহিতে ধরম না রহে বেদবিধি নয় রস।

৩। বেদবিধিপর সব অগোচর ইথে কি জানিবে আনে।
রসে গরগর রসের অন্তর সেই সে মরম জানে॥

৪। দক্ষিণ দিকেতে কদাচ না যাবে যাইলে প্রমাদ হবে।

(অর্থাৎ দক্ষিণাচার বা বেদবিধিসম্মত আচার গ্রহণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।)

৫। নগর ভিতরে আছে রসের মন্দির।
বৈধী ভক্তি আচরণ গড়ের প্রাচীর।
জ্ঞানযোগ কর্ম্মকাণ্ড গড়ন বিভিতে।
তাহা না লঙ্ঘিলে পুরী নারি প্রবেশিতে॥

ত্রিসন্ধ্যা-যাজন ও গায়ত্রীজপের অনাবশ্যকতা বুঝাইবার জন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীর উদ্দেশে বলিয়াছেন—"ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন তুমি বেদমাতা গায়ত্রী"।

একথা কোন বর্ণাশ্রমী সমাজগুরু সহ্য করিবেন না।

বৈদিক শাসনে জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলন করিবার কথা—যাগযজ্ঞাদি নানা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিবারও কথা. সহজিয়ারা এ সমস্ত কিছুই মানে না। বৈদিক শাসনে পূজা, উপাসনা, ব্রত, তপজপের সাহায্যে দেবতার প্রতি ভক্তি নিবেদন করিতে হয়। শাস্ত্রের আজ্ঞায় এই যে, দেবতার প্রতি ভক্তিনিবেদন, ইহাই বৈধী ভক্তি। সহজিয়ারা এই বৈধী ভক্তির পক্ষ ত্যাগ করিয়া রাগানুগা ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাদের 'প্রেমানন্দ লহরী'তে আছে।

বিধিপক্ষ পরিত্যজ রাগানুগা হয়ে ভজ রাগ নৈলে মিলে না সে ধন।

আবার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতে আছে—

জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে তার জন্ম অধঃপাতে যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতও ইহাই। তবে তাঁহারা বৈধী ভক্তিকে চিত্তশুদ্ধির জন্য নিম্নস্তরের সাধনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আর সহজিয়ারা বৈদিক সংস্কার ও বৈধী ভক্তির পথ কেবল ত্যাগ

করিতে বলেন নাই—তাহাকে নারকীয় মহাপাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ইহা কেবল বিরোধিতা মাত্র নয়—ইহা সশস্ত্র বিদ্রোহেরই মত।

রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলিতে সহজিয়ারা বুঝেন,—একেবারে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের বিলোপ করিয়া নিত্য বা ব্রহ্মকে মানুষ কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি প্রেমানুরাগ। এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সঙ্গে মূলতঃ পার্থক্য নাই।

সহজিয়া সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান এতদূর বেদবিরোধী যে, অনায়াসে মুসলমান সাঁই, দরবেশরা এই সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের আকর্ষণে কোন কোন মুসলমান বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ ও ইসলামী আচরণ ত্যাগ না করিয়াই বহু মুসলমান এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন।

বৈষ্ণব সাধকদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ এই ধর্ম্মমতের পোষকতা করেন নাই। তাঁহারা সহজে জাতিকুল বংশ ও বর্ণাশ্রমী সমাজের গৌরব ত্যাগ করিতে পারেন নাই, সংস্কারের বন্ধনও তাঁহাদের সুদৃঢ়। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তর সমাজের লোক সাধারণতঃ বর্ণাশ্রমসমাজে উপেক্ষিত, তাহাদের সংস্কারের বন্ধনও অনেকটা শিথিল। সহজেই তাহারা এই সহজিয়া ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া সংস্কারমুক্তির স্বস্তি লাভ করিয়াছিল। নিত্যানন্দের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সমাজেও নবনব সংস্কারের বন্ধন আসিয়া জুটিয়াছিল এবং নব আভিজাত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। সহজিয়ারা সে সমাজের গণ্ডীও ভাঙ্গিয়া স্বতন্ত্র সমাজের সৃষ্টি করিয়াছিল।

সর্ব্বসংস্কারমুক্ত এই উদার সমাজের সমস্ত দ্বারই উন্মুক্ত। যে কোন ধর্ম্মমত বা সমাজের লোক ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

সহজিয়াদের সংস্কারমুক্তির ব্যাপারে সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য আছে। বর্ণাশ্রমী সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র্য নাই, পত্নীকে মুখে সহধর্ম্মিণী বলা হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পত্নী ধর্ম্মানুষ্ঠানে পতির সহযোগিনী নয়, পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য—এই আশ্বাস দিয়া নারীদের নিরস্ত রাখা হয়। সামাজিক জীবনেও নারীর স্বাধীনতা নাই।

সহজিয়া সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী। নারীদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দান করা হইয়াছে। এসমাজে নারীর দাসীত্ব নাই। ভালবাসিবার শক্তি যখন নারীর পুরুষ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয় —তখন রাগাত্মক ধর্ম্মে তাহার অধিকার সমান না হইবে কেন? ইহা সম্পূর্ণ স্মৃতিশাস্ত্রবিরোধী ব্যাপার। কেবল বেদশাসিত সমাজে কেন জগতের বহু ধর্ম্মসমাজেই নারীর এইরূপ অধিকার নাই। বর্ত্তমান সভ্যতা বহু দ্বন্দ্বসংঘর্ষের ও ঘাত-প্রতিঘাতের পর নারীর অধিকার সম্বন্ধে যে সত্যে উপনীত হইয়াছে—অর্দ্ধসভ্য সহজিয়ারা তাহা সহজ ভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিল। সহজিয়া সমাজে নারীর স্থান হীন ত নহেই—বরং নারীই প্রেমগুরু বলিয়া দেবীর মর্য্যাদায় পূজিতা—নারীদেহেই সহজিয়া পুরুষরা ভাগবতী সত্তার আরোপ করিয়া তাহাকে একাধারে দেব-মূর্ত্তি ও মন্দিরের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগে অর্থাৎ chivalric age-এ নারীকে যে মর্য্যাদা দান করা হইত—সহজিয়ারা নারীকে তাহার চেয়েও বেশি মর্য্যাদাই দিয়াছে। সহজিয়া পুরুষরা বাংলার ধর্ম্ম-জগতে যেন Knights,

নাইটরা নারীবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া, নারীবিশেষের প্রেমকণা লাভ করিয়া অথবা নারীর দৃষ্টি হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করিয়া

অসমসাহসে সংগ্রাম করিত আততায়ীদের সঙ্গে। আমাদের দেশে গ্রাম্য Knight-গণকেও সংগ্রাম কম করিতে হইত না। তাহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইত সর্ব্ববিধ বৈদিক সংস্কার ও সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে। সর্ব্ববিধ সামাজিক উৎপীড়ন, লোকনিন্দা. কলঙ্ক ইত্যাদি বরণ করিতে হইত। ইহাতে কম শৌর্য্যের প্রয়োজন হইত না। ইহার উপর নারীসংসর্গে থাকিয়া ইন্দ্রিয়দমনের অসামান্য শৌর্য্যত আছেই।

পরকীয়াবাদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সহিত জড়িত। এক এক ধর্ম্মমতে পরকীয়াকে এক এক ভাবে ধরা হইয়াছে। সহজযানী বৌদ্ধ-সাধকগণ সর্ব্ববিধ সংস্কারের বিরোধী। বিবাহ একটা বৈধ সামাজিক সংস্কার। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে যাইতে হইলে স্বকীয়া ত্যাগ করিয়া পরকীয়া গ্রহণ করিতে হয়। পরকীয়া নারীতে প্রীতি যখন সমাজবিরুদ্ধ, তখন তাহাদের মতে তাহাই বৈধ। জাতি-কুল-গোত্র মানিয়া চলা একটা সংস্কার। তাহার বিরুদ্ধে যাইতে হইলে বাছিয়া বাছিয়া অতি নিম্নশ্রেণীর ও নীচ জাতির পরকীয়া রমণীর সংসর্গই সংস্কারমুক্তির চরম বৌদ্ধসাহিত্যে তাই ডোমনী সংসর্গ দেখা যায়। সাধনভজনের সহায়তা এই ডোমনী শ্রেণীর নারীর সংসর্গে কতটা হইত বলা যায় না।

অবশ্য এই অস্পৃশ্যা নারীসংসর্গের অন্য ব্যাখ্যাও আছে। নির্ব্বাণ মুক্তিকে বৌদ্ধ সাধকরা বলিয়াছেন—নৈরাত্মা দেবী। এই নৈরাত্ম ইন্দ্রিয়গোচরের অতীতা।—অতএব স্পর্শাতীতা বা অস্পৃশ্যা, অস্পৃশ্য বলিয়া ডোম্‌নীর সঙ্গে উপমিতা। এই ডোম্‌নী চর্য্যাপদে নৈরাত্মার উপমান মাত্র ছিল—পরে বোধ হয় এই ডোম্‌নী উপমালোক ত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে সাধকদের সাধনসঙ্গিনী হইয়া পড়িয়াছিল।

অর্ব্বাচীন বৌদ্ধযুগে সংঘারামে ভিক্ষুভিক্ষুণীরা একত্র বাস করিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রবেশ করিল। এ

ব্যভিচারের স্রোত রুদ্ধ করিতে না পারিয়া বৌদ্ধাচার্য্যগণ এই ব্যভিচারকে কতকগুলি সাধন-পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধর্ম্ম-সাধনার অন্তর্গত করিয়া লইলেন। ইহা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সহিত ধর্ম্মসাধনার নিবৃত্তিমার্গের একটা সন্ধিস্থাপন মাত্র।

তান্ত্রিকগণও বেদাচার বা দক্ষিণাচারের বিরোধী—তাহারা বামাচারী। তাহারাও প্রাজাপত্য বিবাহকে একটা কুসংস্কার মনে করিয়া বৌদ্ধদের মতই যে কোন নারীর সহিত শৈববিবাহে আবদ্ধ হইত। এস্থলে পরকীয়ার সহিত প্রেমসংসর্গের কথাটাই বড় নয়, সে শক্তি-সাধনার সহায়তা করিবে মাত্র। কি ভাবে তাহার সাহায্যে শক্তি-সাধনা হইতে পারে—তাহা আমরা বুঝি না। তান্ত্রিক মতে কোন একটি বিশিষ্ট নারীই চির দিনের সাধন-সঙ্গিনী না হইতে পারে। একই সাধকের বহু নারীর সহিত চক্রে চক্রে সংসর্গ ঘটিতে পারে। কারণ প্রেমের কথাটাই বৈষ্ণব সহজিয়াদের মত এক্ষেত্রে বড় কথা নয়। ভিন্ন ভিন্ন নারীর সংসর্গে আসিয়া ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা শক্তিসঞ্চয়—ইহাই তান্ত্রিক সাধকদের লক্ষ্য। আবার প্রবৃত্তির পরিপাকের ফলে—চরম ভোগের অনিবার্য্য পরিণতির ফলে নিবৃত্তিলাভের দ্বারা শক্তি সঞ্চারই তাহাদের লক্ষ্য এমন কথাও কেহ কেহ বলেন। সর্ব্ববিষয়ে বামাচারী হইতে হইলে নারীর সহিত যৌন সম্পর্ক বাদ যাইবার কথা নয়।

আমরা সাহিত্যের মধ্য দিয়া নারীকে মহাশক্তির অংশীভূতা শক্তিসঞ্চারিণীরূপে পরিকল্পিতা দেখিতে পাই। নারী তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী যোদ্ধাকে বীরধর্ম্মে প্রেরণা দান করিতেছে, প্রে াকাঙ্ক্ষী কবির লেখনীতে রসের সঞ্চার করিতেছে, জ্ঞান-সাধকের চিত্তে উদ্দীপনা দান করিতেছে, ব্রতী পুরুষের ব্রত উদ্‌যাপনে উৎসাহিত করিতেছে—এইরূপ নারীর শক্তিসঞ্চারণের কথা কেবল ভারতে নয়, সর্ব্বদেশের

সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইউরোপের মধ্যযুগের Knight-দের বীরধর্ম্মের মূলে ও রসশিল্পীদের শিল্পসাধনার মূলে এইরূপ বরেণ্যা নারীর শক্তিসঞ্চার দেখা যায়। ইহার সহিত যৌন সম্পর্কের কথা নাই। তান্ত্রিক সাধকদের শক্তিসাধনা এই শ্রেণীর বলিয়া মনে হয় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরকীয়াবাদ অন্যরূপ। অনায়াসলব্ধা স্বকীয়ার প্রতি যে অনুরাগ অথবা বিবাহসংস্কারের সাহায্যে অনায়াসে প্রাপ্ত পতির প্রতি তাহার স্বকীয়ার যে অনুরাগ তাহা এমন নিবিড় বা গভীর নয় যে, ভাগবতী প্রীতির সহিত তাহা উপমিত হইতে পারে— অথবা তাহার ভাষায় ভাগবতী প্রীতির গভীরতা অভিব্যক্ত হইতে পারে।

দুর্লভা হৃদয়হারিণী পরকীয়া নারীর প্রতি পুরুষের অথবা দুর্লভ প্রেমার্থী পুরুষের প্রতি নারীর যে দুর্দ্দম গভীর অনুরাগ সেই অনুরাগের ভাষায়, ভূষায় ও ঔপম্যেই গভীর ভাগবতী প্রীতির অভিব্যক্তি হইতে পারে।

স্কন্দপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকে বৈষ্ণবসাধনার সূত্র নিহিত আছে। যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।

মনোঽভিরমতে তদ্বৎ মনোঽভিরমতাং ত্বয়ি।

যুবকের আর্ত্তি যথা যুবতী দেখিয়া।
সেইমত আর কিছু না পাই ভাবিয়া॥
একারণে ভক্তগণ ভজে যদুপতি।
পত্নীভাবে তার প্রতি স্থির করি গতি॥

এই দুইটি উদ্ধৃতাংশে 'যথা' কথাটির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈষ্ণবের পরকীয়াবাদ Spiritual Symbol মাত্র।

এই পরকীয়াবাদ কেবল ব্রজের পক্ষেই বৈধ। "পরকীয়াবাদের উল্লাস। ব্রজবিনা তাহার অন্যত্র নাই বাস॥" পরকীয়া নারীর সহিত প্রণয়ের দ্বারা সাধনা করিতে হইবে, এমন কথা চৈতন্যদেব কিংবা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ কোথাও বলেন নাই। বৈষ্ণব সাধকগণও পরকীয়া নারীর সাহচর্য্যে প্রেমসাধনা করেন নাই। সহজিয়ারা চণ্ডীদাসের মত অনেক সাধকের স্কন্ধে পরকীয়া আরোপণ করিয়া নিজেদের দলে টানিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নিজেরাই নারীভাবে পরমপুরুষের প্রেমার্থী হইয়াছেন—নারীর সহায়তা তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই। গদাধর, জগদানন্দ, নরহরি ইত্যাদি সাধকগণ মধুর রসের সাধনায় নিজেদের পৌরুষশক্তির কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। ইঁহারা জানিতেন—।

পুরুষের দেহ তেয়াগ করিয়া প্রকৃতি স্বরূপ হবে।
তবে হে জানিহ রাধার স্বরূপ হৃদয়ে দেখিতে পাবে।

সহজিয়ারা বলিলেন নারীভাবে ভজনা বা শ্রীকৃষ্ণরাধার প্রেম-লীলার মধ্যে সখীভাবে প্রেমরস সম্ভোগ প্রকৃত প্রেমসাধনা নয়। রমণীর প্রেম নিজের হৃদয় দিয়া সম্ভোগ করিতে হইবে। স্বকীয়ার সাহায্যে তাহা যদি সম্ভব না হয় তবে পরকীয়া নারী চাই। সহজিয়া সাধক বলিবে—নিজের অভিজ্ঞতায় পরকীয়া রস কি না জানিলে, তাহার আর্ত্তি কত গভীর তাহা না উপলব্ধি করিলে তাহাকে কি করিয়া শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করা যাইবে? এই পরকীয়া চিরদিনই পরকীয়াই থাকিবে—কোন দিন স্বকীয়া বা কামনায় উপভুক্তা হইবে না। যে কোন পরকীয়াই সাধকের সাধনাসঙ্গিনী হইতে পারে না। যে নায়িকার প্রতি সাধকের দুর্জ্জয় দুর্দ্দম আকর্ষণ, যাহাতে তাহার চিত্ত স্নিগ্ধ হইবে, যাহার জন্য সে সর্ব্বস্ব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত—

সে দূরেই থাকুক আর নিকটেই থাকুক—সেই নায়িকাই তাহার ইষ্টজন, সে-ই তাহার উপাস্যা। কারণ, সাধক তাহাতে নারীত্বের চরম মহিমা এবং পরম ঈপ্‌সিত বস্তুর আরোপ করে। আধা সে বিধাতার সৃষ্টি, আধা সে সাধকের সৃষ্টি, অর্দ্ধেক মানবী সে যে অর্দ্ধেক কল্পনা।

নারীসম্পর্কে এই নিষ্কাম মনোভাব-পোষণ এক প্রকারের তপস্যা-চরণ।

সহজিয়ারা বলেন অনায়াসলভ্যা নারীর মধ্যে এমন আকর্ষণ নাই যাহা, আত্মবিলোপমূলক গভীর প্রেমকে অধিগম্য করাইতে পারে। যে দুর্ল্লভা, যে পরকীয়া তাহার প্রতি অনুরাগই হয় দুর্দ্দম ও গভীর। এই নারীর সাহত দেহসম্পর্ক ঘটিলেই সে আর দুর্ল্লভাও থাকিল না, পরকীয়াও থাকিল না। তাহার ফলে প্রণয়ের নিবিড়তা ও আকাঙ্ক্ষার প্রখরতা নষ্ট হইয়া গেল। যে নারীর মধ্যে ভাগবতী শক্তি বা পরমেষ্ট মহিমা আরোপ করা হইয়াছে তাহাকে ইন্দ্রিয়ভোগের নিম্নতলে নামাইয়া আনিলেই সে সামান্যা প্রাকৃতা নারী হইয়া গেল। সে যেমনই ভোগের সহায়িকা হইল অমনি সে সাধনার সহায়িকা আর থাকিল না। তাহাকে অবলম্বন করিয়া আর মহাপ্রেমের সাধনা সম্ভবপর হইবে না। এ যেন হৃদয়-বেদীতে দেবীপ্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা না করিয়া তাহাকে পুতুলনাচে ব্যবহার করা। তাই সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাস যদি বলিয়া থাকেন—

রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥

তবে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তাই সহজিয়া সাধকরা বলেন—

নায়িকা সাধন শুনহ লক্ষণ যেরূপে সাধিত হয়,
শুষ্ক কাষ্ঠের সম আপনার দেহেরে করিতে হয়।

রজকিনীর সঙ্গে ঐন্দ্রিয়িক সম্পর্ক থাকিলে চণ্ডীদাস রজকিনীকে মাতা পিতা, বাগ্‌বাদিনী, হরের ঘরণী, বেদমাতা গায়ত্রী ইত্যাদি বলিতে পারিতেন না।

সাধনার কথা বাদ দিলে ইহার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে—সমাজ তাহা স্বীকার না করিলেও সাহিত্য তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

যুবক-যুবতীর মধ্যে সহজ স্বাভাবিক একনিষ্ঠ ও একাগ্র আকর্ষণ বৈবাহিক সংস্কার ও সমাজশাসনের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলে যে প্রেমের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সত্যের অবমাননা হয়, মনুষ্যত্বের গৌরবহানি হয়, তাহা সকল দেশের সাহিত্য একবাক্যে বলে। সংস্কার যত বড়ই হউক, যত প্রাচীনই হউক, তাহার চেয়ে যে সত্যই বড় এবং ধর্ম্মসঙ্গত, তাহা সর্ব্বদেশের সাহিত্য একবাক্যে ঘোষণা করে এবং সংস্কারের যূপকাষ্ঠে স্বাধীন প্রেমের বলিদানে যে ঘরে ঘরে ট্র্যাজেডি ঘটিতেছে—তাহাই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বস্তু। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন অকপট স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রণয়ের প্রতিই সাহিত্যের গভীর সহানুভূতি।

সহজিয়া সাহিত্যের সহিত এ বিষয়ে বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যের কোন তফাৎ নাই। কথাসাহিত্যও প্রেম সম্পর্কে পরকীয়াবাদকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছে। ধর্ম্ম সাধনার জন্য সহজিয়া সাহিত্য যাহার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে—আর্টসৃষ্টির জন্য কথাসাহিত্য তাহাকেই আশ্রয় করিয়াছে। প্রেমের বৈচিত্র্য, সংস্কারের সহিত সত্যের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন মনোবৃত্তির মধ্যে সংঘর্ষ দেখাইবার জন্য, প্রেমের গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য কথাসাহিত্যে পরকীয়ার অবতারণা করা হয়। বঙ্কিম-

চন্দ্র প্রেমের বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য স্বকীয়াকেও পরকীয়া রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন কোন কোন উপন্যাসে।

কথাসাহিত্যে প্রেমস্বরূপ সত্যের আহ্বানে যে পরকীয়া রতি তাহাই চরম কথা, মনের মানুষের জন্য আত্মবিলোপেই তাহার পর্য্যবসান। সহজিয়া সাহিত্যে আমরা দেখি পরকীয়া রতি পারমার্থিক ও পরমেষ্ঠ ধনলাভের একটা উপায় মাত্র, পরমানন্দবিগ্রহের মন্দিরে আরোহণ-সোপান মাত্র।

এই যে পরমানন্দ ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ নয়—ইহা চতুর্ব্বর্গের অতীত। ইহাকে সহজিয়ারা নাম দিয়াছেন পঞ্চম।

চতুর্ব্বর্গ লব্ধ হয় বেদাচারে ক্রমে।
রসময় সেবা ভিন্ন মিলে না পঞ্চমে।

সহজিয়া কবিরা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের মত আপনাদের বক্তব্য হেঁয়ালির ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন—তাঁহাদের মর্ম্মকথা ঠারে ঠোরে বুঝিতে হইবে। যাঁহারা সহজিয়া রসের রসিক তাঁহারাই ভাল করিয়া বুঝেন, আমরা ইঙ্গিতে ঈশারায় কিছু কিছু বুঝি। চারিখানি সহজিয়া তত্ত্বগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়— ১। আগমসার। ২। আনন্দ ভৈরব। ৩। অমৃতরত্নাবলী। ৪। অমৃতরসাবলী (রসবল্লী ?)। এই গুলিতে সহজিয়া তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সহজিয়া সাহিত্য বলিলে সহজিয়া কবিদের পদাবলীকেই বুঝায়। কিন্তু সহজিয়া কবি বলিয়া কোন বিখ্যাত কবির পদাবলী পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস, নরোত্তম, চৈতন্যদাস, নরহরি, লোচনদাস ইত্যাদি বৈষ্ণব কবিগণও সহজিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের যে সকল পদে সহজিয়ারা নিজেদের মর্ম্মকথার সন্ধান পাইয়াছেন—সেই সকল পদকে তাঁহারা নিজেদের সাধনভজনের

উপকরণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সহজিয়ারা নিজেদের মতাদর্শ অনুসারে বহু বৈষ্ণবপদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কেবল তাহাই নয়। তাঁহাদের ব্যাখ্যা অনুসারে শ্রীচৈতন্য, রামানন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইত্যাদি ভক্তসাধকগণ ব্যাপকভাবে সকলেই সহজিয়া। ইঁহাদের বাণীর যতটা সহজিয়াদের বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের সঙ্গে মিলে, তাঁহারা ততটা গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, গোপীগণ, বৃন্দাবন ইঁহাদেরও আছে। ইঁহাদের পদে যশোদা সুবল সুদাম বা মথুরা নাই। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদেরও ভজনীয়—কেননা তিনিই যে আদর্শ সহজ মানুষ—অযোনি মানুষ। বৃন্দাবনের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া সহজসাধনই করিয়াছে। 'মানুষ ভজন করে গোপীগণ দেহ দিয়া তার সনে।'

বৈষ্ণব সাধকরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা উপভোগকেই চরম সাধনা মনে করেন। সহজিয়ারা বলে—'এহ বাহ্য।' নিজেদের জীবনে সহজ সাধন করিতে হইবে—এজন্য মনের মানুষ বা সহজ মানুষ খুঁজিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণকে সহজ মানুষ হিসাবে ভজন করিতে হইলে আগে রক্তমাংসের সহজ মানুষের প্রেমে তন্ময় হইয়া রসের অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় যাঁহারা তাঁহার সঙ্গ ও কৃপা লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহারা আদর্শ সহজ মানুষ পাইয়া সহজিয়া সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন। যে যুগে শ্রীচৈতন্যের মত সহজ মানুষ পাওয়া যায় না—সে যুগে তাঁহার অনুকল্পের সন্ধান করিতে হইবে—আপন মনের মাধুরী দিয়া সামান্য মানুষকেই সহজ মানুষে পরিণত করিতে হইবে। এসব কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সংক্ষেপে আর একবার বলি।

ভাব দিয়া পুনর্গঠিত হইয়া সামান্য মানুষের রাগে বা ভাবলোকে পুনর্জ্জন্ম হইবে—সে তখন অযোনি মানুষ হইয়া উঠিবে।

"সহজ মানুষ কোথাও নাই। খুঁজিলে তাহারে নিকটে পাই।"

যোনিতে জনম তাহার নয়। তাহার জনম রাগেতে হয়।"

এই আপন মনের মাধুরী দিয়া—রসতন্ময় ভাব দিয়া সামান্য মানুষের সহজ মানুষে পরিণতিসাধনই সহজিয়াদের ভাষায় 'আরোপ।' ব্যাপারটা সম্পূর্ণ Subjective, Object-এর উপর ইহা নির্ভর করে না। সাধনাব কালে ইহাতে ইতরবিশেষ হয়না। আরোপটাই যখন সবচেয়ে বড় কথা, তখন যাহার প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে—তাহাতেই ভাবারোপ করাই সহজ যেমন তরুণী যুবতী, তাহাতে ভাবারোপ আরও সহজ। পুরুষের পক্ষে সহজ সাধনের খুব বড় সহায় তাই নারী, নারীর পক্ষে পুরুষ।

রূপ দেখিয়া মনের মানুষ নির্ব্বাচন করিতে হয়না, হৃদয়ের সাধর্ম্ম্য ও রসাঢ্যতা দেখিয়া নির্ব্বাচন করিতে হইবে। কারণ,—"রসেতে রূপের জন্ম প্রেমের আলয়।" (অমৃত রত্নাবলী)। রসের চোখে কুরূপাও অপ্সরী হইয়া উঠে। রজকিনীর প্রতি চণ্ডীদাসের যে কামগন্ধহীন রাগসর্ব্বস্ব মনোভাব—তাহাই নারীসম্পর্কে সহজ সাধনের সার মর্ম্ম।

ভাবেতে রমণী কামেতে জননী ব্রজে রতিমতি যারা।
এ সব জানিয়ে করয়ে সাধন উপাসনা জানে তারা।
প্রকৃতি সাধন সিদ্ধপীঠাসন যদি স্থির হইতে পারে।
এ কাম রতিতে চঞ্চল হইলে উঠুডুবু করি মরে।

যে রমণীর সঙ্গে শুধু ভাবময় সম্পর্ক,—কাম সম্বন্ধে সে রমণীকে জননী জানিতে হইবে। অতএব এই সাধনা রীতিমত কঠোর তপস্যা—পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ।

ময়মনসিংগীতিকা

মৈমনসিং গীতিকাগুলি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। রস যদি সাহিত্যের প্রাণবস্তু হয়, তবে এই অমার্জিত ভাষায় নিরক্ষর বা প্রায়-নিরক্ষর কবিগণের রচিত গাথাগুলি গীতিসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার পরেই স্থান পাইবার যোগ্য।

এই গীতিকাগুলিকে একহিসাবে জাতীয় সাহিত্য বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালী জাতির সকল স্তরের লোকের জীবন ইহাতে প্রতিভাত এবং পরস্পর অনুস্যূত হইয়া সেকালের জাতীয় জীবনের একটা সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ ইহাতে পরিস্ফুট করিয়াছে। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, মুসলমান-কাজী, দেওয়ান, চণ্ডাল, বেদিয়া, ডাকাত, সওদাগর, চাষী, মইষাল গোপ, মাঝিমাল্লা ইত্যাদি সকলশ্রেণীর লোকের জীবনেরচিত্র-সমবায় এইগুলিকে জাতীয় সাহিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

এইগুলি একাধারে উপন্যাস, নাটক, গান ও কবিতা—বহুবিধ রচনাভঙ্গীর সাহিত্যশাখার মিলন হইয়াছে এইগীতিগুলিতে।

বাঙ্গালাদেশের সভ্যতর অংশ যখন মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণবগীতি কবিতায় মুখরিত, বঙ্গীয় কবিগণ যখন চিরপ্রচলিত মামুলি ধারায় পূর্ব্বকবিদের অনুসরণে গান রচনা করিয়া কবিখ্যাতি লাভ করিতে-ছিলেন—তখন বাঙ্গালাদেশের অসভ্য বন্য সীমান্তে নিরক্ষর অথবা অল্প-শিক্ষিত কবিগণ এইগাথাগুলি রচনা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অশিক্ষিত পল্লী-বাসীদের আনন্দদান করিতেছিল। এইগাথাগুলির ভাষা, ভঙ্গী, রসের আদর্শ ও ভাবধারা প্রচলিত-বঙ্গসাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা

বঙ্গের শিষ্টসম্প্রদায়ের প্রচলিত সাহিত্যের ধারার অঙ্গীভূত নয়—শাখা-উপশাখাও নয়।

মৈমনসিং জেলার পূর্ব্বাংশে এইগুলির জন্ম, ঐ অংশের মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ ছিল—লোকের মুখে মুখেই চলিত। ঐ জেলার সভ্যাংশের অধিবাসিগণ ও নিকটবর্ত্তী জেলার সভ্যলোকেরা হয়ত এইগুলির সংবাদ রাখিতেন। দরিদ্র অশিক্ষিত চাষীদের রচনার কোন মূল্য থাকিতে পারে, একথা পূর্ব্বে কেহই ভাবেন নাই। প্রচলিত সভ্যশিষ্টশ্রেণীর সাহিত্যের সহিত ইহার ভাবভাষায় কোন মিল না থাকায় এইগুলি পূর্ব্বে কখনও সমাদৃত হয় নাই। অনাদরে উপেক্ষায় ক্রমে এইগুলির বিলোপপ্রাপ্তি হইতেছিল। জাতীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধারের প্রয়াসে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের দৃষ্টি এইদিকে নিপতিত হওয়ায় এইগুলির আবিষ্কার ও প্রচার সম্ভবপর হইল। এইগুলির আবিষ্কারক পল্লী কবি 'চন্দ্রকুমার দে।'

কেহ কেহ এইগুলিকে চন্দ্রকুমারেরই রচনা বলিয়া মনে করেন। চন্দ্রকুমারকে ঘনিষ্ঠ ভাবেই আমি জানিতাম—ছন্দোবন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল, তাঁহার সুরজ্ঞানও ছিল—কিন্তু তিনি এত বড় কবি ছিলেন না,—যে ঐ অপূর্ব্ব গীতিগুলি রচনা করিতে পারিতেন। গীতিগুলি প্রথমশ্রেণীর কবির রচনা। প্রাচীনকালের মূর্খ পল্লীবাসীদের ভাষায় যিনি এমন গীতি রচনা করিতে পারেন, তিনি নিজের সুপরিচিত বর্ত্তমান ভাষায় লিখিলে গোবিন্দদাসের চেয়ে ঢের বড় কবি হইতে পারিতেন। চন্দ্রকুমারকে মহাকবিত্বের গৌরব ও অসামান্য আত্মোৎসর্গের গৌরব দুইএর একটিও দিতে আমরা রাজী নই। যাহা খণ্ডিত, ছন্ন, ছিন্ন, ব্যুৎক্রান্ত ও, অঙ্গহীন তাহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন চন্দ্রকুমার,—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সভ্যজনসম্মত শিষ্টসাহিত্যের ধারার সহিত মিল নাই বলিয়া পদ্মার এইপারে ঐগীতিগুলির নামও আমরা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু সে মিল নাই এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়াই ঐগুলি এত চমৎকার।

আমাদের শিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহিত্যকে প্রধানতঃ তিন ধারায় বিভক্ত করা যায়। একটি ধারা—মঙ্গলকাব্যের ধারা, একটি পদাবলী সাহিত্যের ধারা, আর একটি সংস্কৃত-পুরাণাদির অনুবাদের ধারা। এইগুলি কোন ধারাতেই পড়ে না। প্রথমতঃ—মঙ্গলকাব্যের ধারায় আমরা দেখি—তিনটি কি চারটি মাত্র কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া সেগুলি রচিত। এই গীতিকাগুলির সহিত সেই কাহিনী কয়টির কোন সম্পর্ক নাই। এদেশের কবিরা নূতন কাহিনী উদ্ভাবন করিতেই পারিতেন না। অথবা তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল—অন্য কোন কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিলে দেশে আদৃত হইবে না। কাহিনী উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হয় না।—বিধাতা নিত্যই আমাদের চারি-পাশে নব নব কাহিনীর সৃষ্টি করিতেছেন। আমাদের চারিপাশের জাতীয় জীবনের ঘটনাবলী লইয়া কিংবা আমাদের নিজেদের জীবনের কাহিনীগুলি লইয়া কাব্যরচনার প্রথাই ছিল না। এ বিষয়ে একটা প্রচলিত সামাজিক শাসনই যেন বিষয়বস্তুর উদ্ভাবনে অথবা প্রাকৃত জীবন হইতে আখ্যানবস্তু নির্ব্বাচনে বাধা ছিল।

পূর্ব্ব মৈমনসিংহের সীমান্তপ্রদেশ ব্রাহ্মণ্যশাসন হইতে দূরে অবস্থিত ছিল—কোনপ্রকার সামাজিক অনুশাসন এখানে কবিদের স্বাধীনতা হরণ করে নাই। এদেশের অশিক্ষিত কবিগণ তাহাদের চারিপাশে নরনারীর জীবনে যে সকল বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাই লইয়া গাথা রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথার

অনুবর্ত্তন করেন নাই—যাহা তাঁহাদের অমার্জিত হৃদয়কে মুগ্ধ, বিচলিত ও বিস্মিত করিয়াছে—তাহাকেই তাঁহারা সাধ্যমত রূপদান করিয়াছেন।

পদাবলী সাহিত্য রাধাশ্যামের প্রেমলীলা লইয়া ছোট ছোট গানের আকারে রচিত। এই শ্রেণীর গীতিসাহিত্যের সহিতও গীতিকারদের পরিচয় ঘটে নাই। তাই ইহাদের রচনায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় নয়—সাধারণ নরনারীর প্রণয়ই বিষয়বস্তু এবং গাথাগুলি ছন্দোবদ্ধ গল্পের আকার ধারণ করিয়াছে। গল্পের আকারে সাধারণ প্রাকৃত নরনারীর প্রেমানুরাগের কবিতা এদেশে একটা অভিনব বস্তু।

অসভ্য কৃষকসম্প্রদায় সংস্কৃতের ধার ধারিত না। কেবল পুরাণের যে সব কথা লোকমুখে মুখে সভ্যপ্রদেশের সীমা ছাড়াইয়াও আসিয়াছিল—কোন কোন গাথায় তাহাদেরই সামান্য উল্লেখ মাত্র আছে, কবিকঙ্কণের ফুল্লরার মুখে পুরাণের দোহাইএর মত।

সভ্যবঙ্গের সকলশ্রেণীর সাহিত্যই ছিল ধর্ম্মসাহিত্য—ধর্ম্মই মুখ্য, সাহিত্যই গৌণ। এই গীতিকাগুলিতে কোন শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের বালাই নাই, সেজন্য সাহিত্যই হইয়াছে মুখ্য। আর যে-ধর্ম্ম ইহাতে গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা মানবধর্ম্ম।

বঙ্গের যে অংশে এই গীতিকাগুলি রচিত হইয়াছে সে অংশ প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলাভূমি—নদীনদ, খালবিল, অরণ্য, পাহাড় ও পল্লীশ্রীর অপূর্ব্ব সম্মিলন হইয়াছে এখানে। ভিন্ন ভিন্ন বন্য, পার্ব্বত ও গ্রাম্য জাতির সমন্বয় হইয়াছে এখানে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের মধ্যে সীমারেখা এখানে খুব দুর্লঙ্ঘ্য নয়, বর্ণাশ্রমী হিন্দুদের সামাজিক শাসন এখানে বিশেষ প্রভাব লাভ করে নাই, রাষ্ট্রীয় শাসনও ছিল এ অঞ্চলে শিথিল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে এখানে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না—জীবনের সকল পথেই ছিল মুক্তি। এইসকল কারণে

মুক্তির আবহাওয়ায় এখানকার লোকের প্রকৃতি ছিল কতকটা অবাধ, শৃঙ্খলাহীন। তাহাদের জীবনের গতি ছিল উদ্দাম, তাহাদের চিন্তা ছিল স্বাধীন, অনুভূতি ছিল গাঢ়, মনোবেগ ছিল অবল্গিত। জীবনীশক্তির অবাধ প্রাচুর্য্যে তাহাদের মধ্যে একটা অব্যাহত সৃজনী শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। এই সৃজনী শক্তি কোন কলাশ্রীসঙ্গত বা অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত আদর্শ, বিধি-বিধান বা রীতিপদ্ধতি লাভ করে নাই। এই দেশেরই আত্মপ্রকাশের নিজস্ব একটা বাঁধা ছক বা আদরা ছিল তাহাকেই অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের প্রাণের বার্ত্তা অমার্জিত ভাষায় পঙ্গুদুর্ব্বল ছন্দে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রাণের অতি সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আবেগে। এগুলি অযত্ন-সম্ভূত বনফুলের মত—উদ্যানপুষ্পের শ্রীসৌরভ সৌষ্ঠবগৌরব ইহাদের নাই। লক্ষ লক্ষ বনফুলের মত এইশ্রেণীর রচনা ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িয়া যাইত, সভ্যলোক ইহাদের সন্ধান পাইত না। এ অঞ্চলেও এখন বর্ত্তমান সভ্যতার হাওয়া লাগিয়াছে—আর ঐশ্রেণীর গীতিকা রচিত হইবে না—কিন্তু যাহা রচিত হইয়াছে বর্ত্তমান সভ্যতা তাহাকে ধ্বংস পাইতে দিবে না।

এই গীতিকাগুলির মধ্যে, কোন তত্ত্বতথ্য নাই—কোন বিদ্যা বা জ্ঞানের পরিচয় নাই, বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয় এমন কোন উপাদান উপকরণ এইগুলিতে নাই। গীতিকারগণ যেমনটি দেখিয়াছে—তেমনটিই বর্ণনা করিয়া গিয়াছে অন্তরের দরদ দিয়া। মানবজাতি সভ্যতার ক্রমোন্মেষের ফলে যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছে তাহার কোন পরিচয় এইগুলিতে নাই। যে মনোবৃত্তিগুলির মানুষ অধিকারী হইয়াছে বন্য বর্ব্বর অবস্থা হইতেই, যে হৃদয়াবেগ মানবধর্ম্মেরই অন্তর্গত—যে বৃত্তি

প্রবৃত্তিগুলি লইয়া মানুষ পশু হইতে আত্মস্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে—এই রচনাগুলিতে সেইগুলিই রসরূপ লাভ করিয়াছে। ইহার দ্বারা যে সাহিত্য হইতে পারে সেকালের সভ্যলোকেরা তাহা জানিত না। যাহারা রচনা করিয়াছে তাহারা সাহিত্য বলিয়া অপূর্ব্ব কিছু সৃষ্টি করিতেছি তাহাও কোন দিন ভাবে নাই। তাহারা ইহাতে আনন্দ পাইয়াছে এবং সকলকে আনন্দ দিতে পারিয়াছে—ইহাই যথেষ্ট মনে করিয়াছে। ঘুণ আপন প্রয়োজনে কাঠ ফুটা করিয়া যায়—কিন্তু তাহাতে অনেক সময় অক্ষরের সৃষ্টি হয়। বর্ণজ্ঞ লোকে দেখে ঘুণ অক্ষর রচনা করিয়াছে চমৎকার। আমরা সেই ঘুণাক্ষরন্যায়ে আজ ঐগুলিকে সাহিত্য বলিয়া চিনিতে পারিতেছি। যতই অমার্জ্জিত হউক, যতই নিরাভরণ হউক, মানুষের গভীর হৃদয়াবেগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য আজ আমরা তাহা বুঝিতে শিখিয়াছি।

এই রচনাগুলির মধ্যে কোন পারিপাট্য বা কলাশ্রীসম্মত আভরণ নাই বলিয়া এগুলি অতিপিনদ্ধবল্কলা শকুন্তলা নয়—এগুলি যেন জেলের মেয়ে মৎস্যগন্ধা। এই মৎস্যগন্ধা 'সত্যবতী' বলিয়া শকুন্তলার মতই রাজরাণী হইবার যোগ্য।

সত্যবতীর সহিত এইগুলিকে উপমিত করা একেবারেই অসঙ্গত নয়। মানবজীবনের চিরন্তন 'সত্য' এইগুলির রসশ্রী সম্পাদন করিয়াছে। দেবতাকে মানুষ বানাইয়া এবং মানুষকে দেবতা বানাইয়া সভ্য বাংলা যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সত্যকে পূর্ণরূপে আশ্রয় করে নাই। এই গীতিগুলি মানুষকে মানুষ রাখিয়াই তাহার শক্তিসামর্থ্য, তাহার আশাআকাঙ্ক্ষা, তাহার সুখ দুঃখ, তাহার উত্থান পতনের কথাকেই রসরূপ দান করিয়াছে। এগুলির প্রধান অবলম্বন

মানবজীবনের গভীরতম সত্য। ধর্ম্মতত্ত্ব ও দেবদেবীকে বাদ দিয়াও যে সাহিত্য হইতে পারে—গীতিকারগণ তাহা দেখাইয়াছেন।

পল্লীজীবনকে বাদ দিলে বাংলা দেশের কি থাকে? বৃন্দাবনকে বঙ্গপল্লীর সহিত একাত্মক করিয়াই চণ্ডীদাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছেন। চণ্ডীদাস ছাড়া অন্যান্য বৈষ্ণব কবির বৃন্দাবন অবাস্তব—অপ্রাকৃত। মঙ্গলকাব্যে ও পদাবলী সাহিত্যে এই পল্লীজীবন উঁকিঝুঁকি দিয়াছে মাত্র,—তাহার যথাযোগ্য স্থান লাভ করে নাই। বাঙ্গালার পল্লী জীবন তাহার পরিপূর্ণ সত্যরূপে ফুটিয়াছে এই গাথাগুলিতে।

স্বতই এই গাথাগুলি দুঃখ, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, উৎপীড়নের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছে। সাহিত্য যদি জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি হয়—তবে বাঙ্গালার সাহিত্যে তাহা ছাড়া আর কি থাকিবে? চিরদিনই এই বঙ্গদেশ দুর্গত, লাঞ্ছিত, দরিদ্র,—বন্যাঝঞ্ঝা দুর্ভিক্ষ ও শত শত দৈবদুর্বিপাকে বিধ্বস্ত—জীবনের গতি এখানে পদে পদে ব্যাহত। গভীর হৃদয়াবেগের পরিণাম এদেশে শোচনীয়—আদর্শের অনুসরণ এদেশে সাফল্যমণ্ডিত হয় না। ইহাই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য। তাহার পক্ষে সিংহলযাত্রী সপ্ত মধুকর ডিঙ্গার স্বপ্ন অলীক, পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের বর্ণনা কেবল লোভার্ত্তিপ্রকাশ—'ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ' কাব্যালঙ্কার মাত্র, বাহির মহালে সাতমরাই টাকা, সোনার চৌদল, রূপার খাট ইত্যাদি মিথ্যা স্বপ্ন, দেবানুগ্রহের সাহায্যে তাহার জাতীয় সমস্যা-সমাধান অলীক জল্পনা মাত্র। বৃন্দাবনের অনাবিল মাধুর্য্য ও অব্যাহত স্বাচ্ছন্দ্য জাতীয় জীবনের পক্ষে রঙীন অসত্য। স্বাধীন প্রেমের প্রবাহ এইরূপ জাতীয় জীবনে বিয়োগান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। চেষ্টা করিয়া মিলনান্ত করা যায় না যে তাহা নয়, কিন্তু তাহা সত্য হইয়া উঠে না।

এই গীতিগুলির কাহিনীগুলি তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিয়োগান্ত। এবিষয়ে কবিগণ কোন মিথ্যা অনুশাসনকে মানে নাই। এঅঞ্চলে বিশেষতঃ বিজাতীয় শাসনে নারী যে বড়ই অসহায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নারীর জীবনে গভীর হৃদয়াবেগ Tragedyরই সৃষ্টি করে, একথা গীতিকারগণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা নারীকে দেবতার বেদীর সম্মুখে ছাগশিশুর মত শক্তি-হীন করিয়া আঁকেন নাই। নারী তাহার সমস্ত শক্তির নিঃশেষে প্রয়োগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছে। মঙ্গলকাব্যে আমরা দুইএকটি বীরহৃদয় পুরুষের সাক্ষাৎ পাইয়াছি—কিন্তু নারীর মধ্যে বিশেষ কোন শক্তির পরিচয় পাই নাই। ধর্ম্মমঙ্গলে যে নিম্নজাতীয়া নারীগণের চরিত্রে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই নারীগণ এই গীতিকাগুলির নায়িকাদের সগোত্রা। গীতিকার নারীগুলির মধ্যে আমরা মহাশক্তির আভাস দেখিতে পাইয়াছি। বিরুদ্ধ শক্তির নিকট নারীর পরাজয় যেমন সত্য—তাহার সহিত বীরাঙ্গনার মত সংগ্রামও তেমনি সত্য। গীতিকারগণ একথা ভুলেন নাই।

বৈষ্ণব কাব্যের রাধা মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনী শক্তিমাত্র, গোপীরা ভাব বিগ্রহময়ী, রক্তমাংসময়ী নয়। মঙ্গলকাব্যের বেহুলা, খুল্লনা ইত্যাদি কবিকল্পনামাত্র। কিন্তু এই গীতিকাগুলির মহুয়া, মলুয়া, সখিনা, মদিনা, সোনাই ইত্যাদি—খাঁটি রক্তমাংসের নারী। ইহাদের বেদনা আমাদের পারিবারিক জীবনের বেদনার মত পরম সত্য—বেদনাবিলাসমাত্র নয়। ইহাদের বেদনা মর্ম্মের গভীরতম তলকে স্পর্শ করে।

যে সকল কবি এই গীতিগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা নিরক্ষর হইলেও সাহিত্যরচনার মূলসূত্রগুলি তাঁহাদের স্বাভাবিক ভাবেই অধিগত ছিল। ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্যবোধ ও সংযম এমনি

ছিল যে কোথাও তাঁহারা কোন উপাদান উপকরণের আতিশয্যের প্রশ্রয় দেন নাই—তাই বলিয়া দৈন্যও কোথাও নাই। ভাবাবেগই ইঁহাদের রচনার প্রধান উপজীব্য।—অথচ কোথাও উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি নাই—কোথাও ইঁহারা অস্বাভাবিকতার সৃষ্টি করেন নাই—অত্যুক্তি বা অতিশয়োক্তি কোথাও নাই বলিলেই হয়।

ইঁহারা অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক ছিলেন—কিন্তু সভাকবিদের মত রসসৃষ্টির নামে অশ্লীলতার সৃষ্টি করেন নাই—দৈহিক আকর্ষণের কথা কোথাও নাই তাহা নয়, কিন্তু কোথাও রসাইয়া বিনাইয়া কামলীলার বর্ণনা করেন নাই। ইঁহাদের রচনায় উপমা উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কার ইঁহারা প্রয়োগ করিতে জানিতেন না—তাহা নয়। তবে অলঙ্কারের আতিশয্য কোথাও নাই যাহা আছে তাহা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ অনুগত। ইঁহারা উপমাদির মালা কোথাও গাঁথেন নাই—মাঝে মাঝে ভাবের ঘোরে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে যেগুলি স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে ইঁহাদের রচনায় কেবল সেইগুলির অতিসংযত প্রয়োগ দেখা যায়।

সভ্য কবিদের মত ইঁহারা কোথাও বস্তু বা ব্যক্তির তালিকা দেন নাই। অলস নির্জীব প্রকৃতিবর্ণনাও ইঁহাদের রচনায় নাই।

আখ্যানমূলক রচনায় মুহুর্মুহুঃ যে বৈচিত্র্যসম্পাদনের প্রয়োজন, তাহার কোথাও অভাব দেখা যায় না। পাছে চিত্তাকর্ষকতা হারায় সেজন্য কবিরা যথেষ্ট সতর্ক হইয়াছেন। মুখের কথায় নয়, ঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ভাব-সবলতার সৃষ্টি করিয়া চিত্রপরম্পরার সাহায্যে তাঁহারা আখ্যানবস্তুর উন্মেষ সাধন করিয়াছেন।

নানাপ্রকার প্রতিকূলতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাধা ও নবনব সমস্যার মধ্য দিয়া বিচিত্র চরিত্রের দ্বন্দ্বসংঘর্ষের মধ্য দিয়া রসের প্রবাহ উদ্বেল ও

ফেনিল হইয়া কলধ্বনির সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। মুহুর্মুহুঃ পটভূমিকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নবনব চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুইপাশে আশা নৈরাশ্য ভয় ভাবনা সুখদুঃখের আলোছায়া আলিম্পন রচনা করিয়াছে পথে পথে,—তাহার মধ্য দিয়া শ্রোতার কল্পনা সতত কুতুকিনী হইয়া চলিতে থাকে—ক্লিষ্ট হইবার বা আগ্রহ কৌতূহল হারাইবার অবসর পায় না। গৌণ বা অপ্রধান চরিত্রগুলি কেবল মূল চরিত্রের পোষকতাই করে নাই—তাহাদের নিজস্ব বিশিষ্ট গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। কবিরা সেগুলিকেও পরিপূর্ণাঙ্গ স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন।

এই কবিদের কল্পনা ছিল অবাধ, রাজার প্রাসাদ হইতে বেদিয়ার কুটীর, পাহাড়জঙ্গল হইতে গ্রামের মাঠ, রণক্ষেত্র হইতে রান্নাঘর, সমুদ্র হইতে গোষ্পদ সর্ব্বত্রই ছিল তাহার অবাধ গতি। গীতিকার চরিত্রগুলিকে ইঁহারা বল্গাবদ্ধ অশ্বের মত চালিত করেন নাই। তাহারা আপন স্বাভাবিক গতিতে ঝঞ্ঝাবজ্রময়ী প্রকৃতির মধ্য দিয়া জীবনের ঝঞ্ঝা বজ্রের সহিত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে চলিয়াছে যেন একমাত্র নিয়তির নির্দ্দেশে।

এই গীতিকারগণ অশিক্ষিত হইলেও ইঁহাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তি ও মনস্তত্ত্বের জ্ঞান অল্প ছিল বলিয়া মনে হয়না—ইঁহারা যেভাবে আশা নৈরাশ্যের দোলাচলচিত্ততা, প্রেমানুরাগের বিবিধ বৈচিত্র্য, নারী-হৃদয়ের স্বভাবসারল্যের অনিবার্য্য পরিণাম, ব্যাধের মায়াজালে আবদ্ধ চকিতপ্রেক্ষণা বনহরিণীর মত অবলাদের নানা বিড়ম্বনা ইত্যাদির কথা বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা পাকা নিপুণ আর্টিষ্টেরই মত।

ইঁহাদের রচনার উপজীব্য বড়ই করুণ। এত করুণ, এত মর্ম্মস্পর্শী, এত বেদনাঘন যে ইহাকে রসে উত্তীর্ণ করা বড়ই দুরূহ। কিন্তু কবিরা সর্ব্ববিধ আতিশয্য ও উচ্ছ্বাস বর্জ্জন করিয়া এমন স্বল্পাক্ষরে, তুলিকার

সংযত স্পর্শে—চিত্রগুলিকে ফুটাইয়াছেন যে কাব্যের রস চোখের জলে একেবারে লোনা হইয়া যায় নাই।

বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের যথাযথ প্রয়োগে উৎকৃষ্ট কাব্যের সৃষ্টি হয় কবিরা স্বভাবতই তাহা বুঝিতেন,—চিরপ্রচলিত বিভাবের খবর তাঁহারা রাখিতেন না—সহজ বুদ্ধিতে তাঁহারা স্বাভাবিক বিভাব বলিয়া যাহা মনে করিয়াছেন—তাহারই সাহায্যে তাঁহারা রসসৃষ্টি করিয়াছেন। মহুয়া নামক গীতিতে কবি রতিরসের এমন একটি উদ্দীপন বিভাবের অবতারণা করিয়াছেন—যাহাতে বর্ত্তমান যুগের রসতত্ত্ববিদ্‌গণও বিস্মিত হইবেন। মহুয়া বেদিয়ার প্রতিপালিত চুরিকরা মেয়ে, স্বাস্থ্যে যৌবনে পরিপুষ্টাঙ্গী, বনে জঙ্গলে সে বাস করে, গ্রামে গ্রামে বেদিয়াদের সঙ্গে বাজি দেখাইয়া বেড়ায়, রৌদ্রে হিমে জলে মুক্ত বায়ুতে অঙ্গের লালিত্য কতকটা বিনষ্ট, লাবণ্য কতকটা ম্লান, গঠনসৌষ্ঠবের মধ্যে পৌরুষের একটা ছাপ পড়িয়াছে। বাঁশের উপর উঠিয়া মহুয়া বেদেদের সঙ্গে বাজি দেখাইল। মহুয়াকে বাঁশে উঠিতে দেখিয়া—"বইস্যা আছিল নদ্যার ঠাকুর উঠ্যা হ'ল খাড়া।' তারপর সে—করতালের ঝুনু ঝুনু শব্দের সঙ্গে 'ঢোলে মাইলো তালি।' এই অবসরে নদ্যার ঠাকুরের বুকে মন্মথ ফুলশর হানিল। এইরূপ বিভাবের দ্বারা পূর্ব্বরাগসৃষ্টি চণ্ডীদাসের মত একজন বড় কবির উপযুক্ত।

সভ্যবঙ্গের সাহিত্যে প্রকৃতির স্থান নাই বলিলেই হয়। যেখানে আছে সেখানে সে নির্জীব নিস্তেজ, যেন পটে আঁকা সাজানো গোছানো চালচিত্রের মত। প্রকৃতির সহিত মানবজীবনের কোন গূঢ় সংযোগ নাই। প্রকৃতির শোভা যেন কাব্যালঙ্কারের অন্তর্গত, কচিৎ কোথাও চালচিত্রের কাজ করিয়াছে। এইগীতিকাগুলিতে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। গীতিকার চরিত্রগুলি প্রকৃতির নিজ হাতে গড়া ঘরের দুলালদুলালী।

মানবজীবন ও প্রাকৃতিক জীবন যেন ওতপ্রোত ভাবে অনুস্যূত,—Psycho-physical Parallelism এর মত একই জীবন-সত্তার যেন সমান্তরাল অভিব্যক্তি।

গীতিকাগুলিতে প্রকৃতির প্রাধান্য আছে বলিয়াই উহা যে মানুষকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়। শামুকের বহিরঙ্গের মত উহা তাহার জীবনসত্তার অঙ্গীভূত—তাহার বেশি নয়। মাঠগোঠ, গ্রাম, আম্রকুঞ্জ কেয়াবন ও বেতবনের মধ্য দিয়া যে প্রাকৃতিক জীবনের ধারা চলিয়াছে, গীতিকার চরিত্রগুলি যেন সে ধারা অবলম্বন করিয়া কল-হংসের মত নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছে।

প্রকৃতি যে পল্লীকবিদের মুগ্ধ বা বিস্মিত করিয়াছে, তাহা নয়—তাহারা যে প্রকৃতির মাধুর্য্য উপভোগ করিয়াছে, তাহাও নয়—মানব হৃদয়ের সহিত উহার গভীর সংযোগ বলিয়া মানবহৃদয়ের আকর্ষণে উহা স্বতই আসিয়া পড়িয়াছে। ক্বচিৎ কখনো পৃথকভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও অপূর্বতা মনের কোন বিশিষ্ট অবস্থায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সঞ্জীববাবু পালামৌএর কোলদের কথায় বলিয়াছিলেন—বন্যেরা বনে সুন্দর,—শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। গীতিসাহিত্যের চরিত্রগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যায়। উহারা উহাদের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যেই সুন্দর,—ঐ আবেষ্টনী হইতে বিচ্যুত হইলে ঐ সকল চরিত্রের সৌন্দর্য্য আর থাকে না।

কাহিনীগুলি আমাদের কাণের কাছে আহ্বান জানাইয়াছে গানে, কিন্তু প্রাণের কাছে আবেদন জানাইয়াছে চিত্রে। মনের গায়ে ছায়াচিত্র-পরম্পরার সন্নিপাত করিয়া এক একটি গীতি অগ্রসর হইয়াছে। এই চিত্রগুলিতে বর্ণচ্ছটা নাই, কিন্তু গভীর ভাবে মনের উপর দাগ আঁকিয়া যায়। কত স্বল্পাক্ষরে তাহারা চিত্র ফুটাইত তাহার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

বিদেশেতে যায় যাদু যদ্দুর দেখা যায়।
পিছন থাক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায়।
বাঁশের ঝাড় বন জঙ্গল পুতের পিঠে পড়ে।
আঁখির পানি মুছ্যা মায় ফিরা্যা আইসে ঘরে॥

গীতিকাররা স্বভাবতই বুঝিয়াছিলেন—পূর্ব্বরাগের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অনুরাগই প্রেম। সেই প্রেমই তাঁহাদের কাব্যে প্রধান উপজীব্য। মনে হয় পল্লীকবিদের সমাজে পূর্ব্বরাগের স্বাধীনতা ছিল। পূর্ব্বরাগজ প্রেমের মর্য্যাদা সে সমাজ স্বীকার করিত। স্বাধীনভাবে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের মিলন যে সাহিত্যের পরম সম্পদ্ একথা সভ্যদেশের কবিরাও স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু এমন নির্ভীকভাবে স্বচ্ছন্দে কয়জন কবি তাহাকে সাহিত্যে রূপদান করিতে পারিয়াছেন? সম্ভবতঃ সমাজের অনুশাসনই বাধা ছিল। অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া বৈষ্ণবকবিরা রাধাপ্রেমকে সাহিত্যে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন। গীতিকার কবিরা লৌকিক প্রেমকেই পরিপূর্ণ মর্য্যাদা দান করিতে পারিয়াছেন। এ প্রেম জাতিগোত্র মানে নাই, লৌকিক ধর্ম্মও মানে নাই, হিন্দুমুসলমানের যে দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ভেদ্য গণ্ডী তাহাও ইহা অনায়াসে পার হইয়াছে।

গীতিকাকারগণ প্রেমকে ছোট করিয়া পাতিব্রত্যকে বড় করিয়া দেখান নাই। তাঁহারা দেখাইয়াছেন পাতিব্রত্যের মূল ভিত্তি সমাজশাসন নয়, কোন বিশিষ্ট সংস্কার নয়, বৈবাহিক বন্ধনের মন্ত্রপাঠ নয়. ইহার মূল ভিত্তি প্রেমে। প্রেমই পাতিব্রত্যকে অটল করিতে পারে। প্রেম যে সামান্য পল্লীবালাকেও মহীয়সী মহিলা করিয়া তুলিতে পারে—প্রেমের জন্য নারী যে কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহার নারীত্বের মহাশক্তি যে কিরূপ রণরঙ্গিণী হইয়া উঠিতে

পারে—এবং পরিশেষে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গেলে কিরূপে হাসিতে হাসিতে মরণকে বরণ করিতে পারে, গীতিকারগণ-তাহা দেখাইয়াছেন।

গীতিকাগুলিতে এই প্রেম নানা অবস্থা, নানা বিচিত্র সংস্থিতির মধ্য দিয়া—নানা দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে চলিয়াছে, কর্ম্মজীবনে সহযোগিতার মধ্য দিয়া ও ইহা আপনাকে সার্থক করিয়াছে। অবাঞ্ছিতকে এড়াইবার জন্য, অত্যাচারীর হস্ত হইতে আপন দয়িতকে বাঁচাইবার জন্য, এই প্রেমকে নিষ্কলঙ্ক চির-ভাস্বর রাখিবার জন্য নারী আপনার কমনীয়তা ও সৌকুমার্য্য বিসর্জন দিয়াছে। সাধ করিয়া নারী প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া শুনিয়া অপার দুঃখ বরণ করিয়াছে। সমাজ তাহাকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত-হয় নাই। সমাজের নিষ্ঠুর দণ্ডকে বরণ করিয়াই প্রেম সর্ব্বত্যাগী হইয়াছে। প্রেমের গৌরবেই সকল দুঃখের মধ্যেও প্রেমিকা সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে এবং তাহার গৌরব রক্ষার জন্য হাসিতে হাসিতে মরণকে বরণ করিয়াছে। প্রেমের আহ্বানে দয়িতের জন্য মৃত্যুবরণ—ইহা প্রশস্ত বটে, কিন্তু ইহার চেয়েও বড় ত্যাগ প্রেমিকা দয়িতের সুখের জন্য সপত্নীর করে দয়িতকে সমর্পণ করিয়া নিজে চিরদাস্য বরণ করিয়া লইয়াছে। এরূপ সর্ব্বসংস্কারমুক্ত সর্ব্বস্বপণ প্রেমধর্ম্মের উচ্চাদর্শ কি করিয়া অশিক্ষিত কবিরা লাভ করিল ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

গীতিকার কবিগণ স্বাধীন প্রণয়ের জয়গান করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেন—প্রেম স্বাভাবিক ভাবে সঞ্জাত না হইলে তাহা লইয়া সাহিত্য রচনা হয় না। তাই বলিয়া তাঁহারা সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। বরং ইঁহাদের রচনায় যদি কোন নির্দিষ্ট কল্যাণময় লক্ষ্য থাকে, তবে সতীধর্ম্মেরই মহিমাকীর্ত্তন। এই সতীধর্ম্ম ইঁহাদের মতে প্রথাগত সংস্কার মাত্র নয়—যে সতীধর্ম্মের মূল পূর্ব্বরাগের মধুর

আবেষ্টনীর মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়ে গাঢ় মিলনে—সেই সতীধর্ম্মের স্বর্গীয় মহিমাই ইঁহাদের বহু রচনার উপজীব্য।

কোন অতিপ্রাকৃত ব্যাপারের সহায়তায় নয়, কোন দৈবশক্তি-বলে নয়, সিদ্ধপুরুষপ্রদত্ত মন্ত্রাদিবলে নয়, সতী আপনার অন্তর্গূঢ় মানুষী শক্তির দ্বারা সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে—কবিরা তাহাই দেখাইয়াছেন। সতী প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মজীবনকে ওষ্ঠপুটে ধরিয়া আততায়ীর খড়্গের তল দিয়া পাষণ্ড মায়াবীর মায়াজাল ছেদন করিয়া, শতপ্রলোভনের ব্যূহভেদ করিয়া বারবার বিজয়িনী হইয়া চলিয়াছে।

মৃত্যুবরণ না করিয়া অসহায়া দুর্ব্বলা নারী ত নিজের সতীধর্ম্মকে বিজয়ী করিতে পারে না—বিধাতা নারীকে সে শক্তি দেন নাই। কবিরা একথা বুঝিতেন। তাই তাঁহাদের সাহিত্য অসত্য হইয়া পড়ে নাই। নারী প্রাণপণে সংগ্রাম করিয়াছে—কিন্তু তাহার নারীত্বের শক্তিও-ত সীমাবদ্ধ। সে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত জীবন ও সতীধর্ম্ম দুই-ই একসঙ্গে রাখিতে পারে নাই—জীবনের বিনিময়ে সে প্রেমের মর্য্যাদা রাখিয়াছে, সতীধর্ম্মকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। যতক্ষণ জীবন রাখিতে পারিয়াছে ততক্ষণ সে সহস্র লাঞ্ছনার মধ্যে বেদনার পরাকাষ্ঠার মধ্যেও তাহার ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছে। যখন আর উপায় নাই তখন সে জীবনদান করিয়াছে, সংগ্রাম করিতে সে ছাড়ে নাই।—এইখানেই স্বাভাবিকতা,—ইহাতেই সাহিত্য সৃষ্টি। কবির কৌশলে যদি সহস্র বিরুদ্ধ শক্তির সহিত যুঝিয়া দুর্ব্বল নারীদেহে প্রেম ও জীবন দুই-ই বিজয়ী হইত—তাহা হইলেই অস্বাভাবিক হইত। আততায়ীর শিরে সহসা বজ্রাঘাত হইলে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ প্রবৃত্তি তৃপ্তি লাভ করিত বটে,—রসতৃষ্ণার পরিতৃপ্তি হইত না।

সতীজীবনে দারুণ সমস্যার যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, সমাধানের ব্যবস্থা তিনি করেন নাই; সংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছেন—যুঝিবার জন্য যিনি অপরিমেয় শক্তি দেন নাই—সেই বিধাতাকে নিষ্ঠুর বলিয়া আমরা নিন্দা করিতে পারি—কিন্তু যাহা সত্য তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে এবং সাহিত্যও তাহাই লইয়া রচিত হইবে, উপায় নাই।

আমাদের দেশের সাহিত্যে প্রাচীনকাল হইতে একটা কথা চলিত আছে—'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী।' যে বিধাতা সুস্বাদু মাংস দিয়া বনের হরিণীকে গড়িয়াছেন—তিনি-ই নারীর দেহে রূপযৌবন দিয়াছেন। এই রূপযৌবনই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। কখনও কখনও সৌভাগ্যের নিদান, কিন্তু অনেক স্থলে ইহাই পরম শত্রু। আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে এই সত্যটিকে স্বীকার করা হইয়াছে—কিন্তু কোথাও ইহাকে রসসাহিত্যে রূপায়িত করা হয় নাই। গীতিকাকারগণ এই সত্যের গভীর কারুণ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাকে রসরূপ দিয়াছেন। অসহায়া দুর্ব্বলা কোমলাঙ্গী রমণীকে এত সম্পদ যিনি দিয়াছেন—তিনি দস্যুর হস্ত হইতে এই সম্পদ্ রক্ষা করিবার শক্তি দেন নাই। এই অবিচারের বেদনা জগতের সাহিত্যকে যুগে যুগে করুণ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান মানবসভ্যতা বিধাতার অবিচারের কতকটা ক্ষতি পূরণ করিয়াছে বলিয়াই তাহার প্রধান গৌরব। বর্ত্তমান যুগে সভ্যদেশে ধনসম্পদ যেমন সহজে দস্যুরা হরণ করিতে পারে না—নারীও তেমনি রূপযৌবন লইয়া কোন সভ্যদেশে সহজে বিপন্ন হয় না। গীতিকাকারগণ যে দেশের যে যুগের যে সমাজের জীবনযাত্রা সাহিত্যে ফুটাইয়াছেন—সে দেশ সে যুগ ও সে সমাজ সভ্যতার রক্ষাকবচ লাভ করে নাই। তাই তখনকার দিনে যাহা সত্য ছিল—কবিরা কঠোর ও নিষ্করুণ হইলেও তাহাকে

বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং গভীর দরদের সঙ্গে তাহাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়াছিলেন।

বুদ্ধি অনেক সময় দুর্ব্বলকে রক্ষা করে—চাতুরী ক্ষীণপ্রাণের পক্ষে কম বল নয়। এমন অনেক জীব আছে, যাহারা কেবল চাতুর্য্যবলে হিংস্রজীবের কবল হইতে আত্মরক্ষা করে। বনের হরিণ বড় সরল—বাঁশীর শব্দে সে মোহিত হইয়া ব্যাধের ফাঁদে পড়ে। হিংস্র জন্তুর কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সেও একটা শক্তি লাভ করিয়াছে—তাহা চরণের লঘুতা। সে অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারে। যে নারী বনের হরিণীর মত সরলা, অবলা ও অখলা—অথচ আত্মরক্ষার কোন উপায় জানে না—তাহার কি উপায়? অতিসারল্যের দণ্ড তাহাকে ভুগিতেই হয়। বিধাতার এ বিধান বড়ই ক্রূর,—কঠোর হইলেও ইহা সত্য। তরলচিত্ত সবল পুরুষের আঁখির মোহ দুই দিনেই কাটিয়া যায়— অবলা নারী দলিত বনমালার মত পথের পাশে পড়িয়া থাকে। নারীজীবনের এমনি কারুণ্যময় সত্যগুলিকে লইয়া কি চমৎকার সাহিত্যই না পল্লীকবিরা গড়িয়াছেন!

এই গভীর কারুণ্যকে তাঁহারা রসে উত্তীর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন কঠোর সংযমের দ্বারা,—উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে বা ভাববিহ্বলতার অশ্রুজলে রসকে লবণাক্ত করেন নাই।—অধিকাংশকে অব্যক্ত রাখিয়া দুইচারিটি ব্যঞ্জনাময় বাক্যে আংশিক চিত্র দিয়া অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের কবিকর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের পদাবলী

১

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরকে গ্রাস করিয়াছে—কিন্তু রামপ্রসাদের বাৎসল্যরসাত্মক পদাবলীকে আজিও কোন রচনা কবলিত করিতে পারে নাই। অসহায় শিশুর মত অসহায় বাঙ্গালী জাতির মর্ম্মের আবেদন প্রাণের ভাষায় রামপ্রসাদের পদাবলীতে ব্যক্ত হইয়াছে—তাই বাঙ্গালী, প্রসাদী পদাবলীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনায় এইগুলি কাব্যাংশে উৎকৃষ্টতর নয়, কিন্তু অবৈষ্ণবদের এইগুলিই সম্বল। শাক্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া এইগুলির মর্য্যাদা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পদগুলির নিজস্ব মূল্য অল্প নয়—ভক্তির দিক হইতেও বটে, রসের দিক হইতেও বটে।

রামপ্রসাদ ছিলেন অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সাধক। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবার আগে রামপ্রসাদ বৈধী ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। জ্ঞানযোগী অদ্বৈতবাদীর সাধনা ধারা এদেশে বহুপূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়াছিল। ভক্তিমার্গের সাধক হইলে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণ সাকাররূপে উপাসনা বা উপলব্ধি করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণরূপে ব্রহ্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তান্ত্রিক শাক্তগণ তাঁহাকে তারা ব্রহ্মময়ী বলিয়া উপাসনা করিতেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের আগে পর্য্যন্ত তারা ব্রহ্মময়ী কেবলমাত্র উপাস্যাই ছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবে এই উপাসনায় রসের আবির্ভাব হইল রসের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর সংসারজীবনে উপাসনার বাহ্যরূপও

আর থাকিল না—ইহা রসানুগা ভক্তির আকিঞ্চনে পর্য্যবসিত হইল। বৈষ্ণবগণ ভক্তিকে শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্তরে বিভাগ করিয়া অধিকারভেদে সাধনার অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ বাৎসল্যরসের সহিত তাঁহার ভক্তিকে একাত্মক করিয়া লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ যেমন পদাবলীর মধ্যে তাঁহাদের সাধনাঙ্গের বিবিধ রসকে রূপ দিয়াছিলেন, রামপ্রসাদও তাঁহার পদাবলীতে বাৎসল্য রসকেই রূপদান করিয়াছেন। সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ বাৎসল্য, মাতার প্রতি সন্তানের মনোভাবকে প্রতিবাৎসল্য বলা যাইতে পারে। এই প্রতিবাৎসল্য রসের পদগুলিই রামপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই পদগুলিতে সন্তানের সহিত মাতার মধুর সম্বন্ধের সকল বৈচিত্র্য বিকাশলাভ করিয়াছে। যে পদগুলিতে কবি জগজ্জননীর প্রতি আবদার. অভিমান, অনুযোগ, আপাতবিদ্রোহ প্রকাশ করিয়াছেন —সে পদগুলি সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার হইয়াছে।

এই শ্রেণীর পদ ছাড়া রামপ্রসাদের বহুবিধ পদ আছে। তিনি সাধনার পথে যেমন যেমন অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহার পদাবলীর ভাবাদর্শও তেমনি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার পদাবলীতে তাহার সাধকজীবনের নানাস্তরের পরিচয় পাই। তিনি যখন কালীমহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন—মহাকালীকে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন এবং বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া তাঁহার স্তবগান করিয়াছেন—তখন শাক্ত সাধনশাস্ত্রেরই অনুসরণ করিয়াছেন—তাহাতে মাতৃভাবের মহিমা বিকশিত হয় নাই। এখানে মহাকালী ঐশ্বর্য্যময়ী—মাধুর্য্যের সঙ্গে তাঁহার যোগ নাই। যখন তিনি শঙ্করের বামে মহামায়াকে প্রেমময়ী মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন তখন মাধুর্য্যের যোগ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে তাঁহার নিজস্ব হৃদয়াবেগ পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি তাঁহার উপাস্যাকে

বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তিতেও দেখিয়াছেন—ইহাতে তাঁহার দার্শনিক মনোভাব প্রকট হইয়াছে ইহাতেও মাধুর্য্য আছে, কিন্তু তাহা নিম্নস্তরের। চিন্ময়ী বা মনোময়ী কুলকুণ্ডলিনীরূপেও কবি শ্যামা মাকে উপাসনা করিয়াছেন। কবি তাঁহার উপাস্যাকে মানস-পদ্মবনের হংসরূপা বলিয়াছেন—ইহাতেও রসের ঘনতা হয় নাই। ইহার পর তিনি দেখিয়াছেন বিশ্বজননী মাতৃ-মূর্ত্তিতে—এইখানেই পরিপূর্ণ মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছে।

এইরূপ নানাস্তরে আরোহণ করিতে করিতে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। এই জ্ঞানই তাঁহার সঙ্গীতে রসরূপ লাভ করিয়াছে।

এইরূপ স্তর হইতে স্তরান্তরে যাইতে যাইতে কখনও তাঁহার মনে হইয়াছে—লৌকিক উপাসনার মূল্য আছে, আবার কখনও মনে হইয়াছে—তাহার কোন মূল্য নাই। কখনও কবি পৌত্তলিক—কখনও তিনি পৌত্তলিকতার অসারতা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন—

ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।

যিনি জগৎকে সাজান—ডাকের গহনা দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে চাস্! জাঁকজমকে পূজা করিলে মনে মনে অহঙ্কারই জন্মে।

তীর্থের প্রতি কবির একদিন লোভ ছিল, পরে তীর্থবাসের অসারতা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—

কাজ কি আমার গিয়ে কাশী।

মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে গয়া-গঙ্গা-বারাণসী।

সাম্প্রদায়িক ভাব তাঁহার মনে একদিন ছিল—পরে তিনি বুঝিয়াছিলেন—

আমি বেদাগম পুরাণে করলাম কত খোঁজ তলাসি।

ঐ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম সকল আমার এলোকেশী।

কালীই রাসবিহারী, শ্যামা ও শ্যামে তফাৎ নাই। নিজেকে আহ্বান করিয়া সাধক বলিয়াছেন—

পেয়ে শক্তিতত্ত্ব হলি মত্ত হরিহর তোর এক হলো না।

শ্যামশ্যামাকে প্রভেদ কর চক্ষু থাকতে হলি কানা।

ধনসম্পদ্ না পাওয়ার জন্য কবি একদিন শ্যামা মা'র কাছে অনুযোগ করিয়াছিলেন—তাহারপর চিন্তামণির সন্ধান পাইয়া ধনসম্পদের অসারতা বুঝিয়া বলিয়াছেন—'বিষয় না দিয়া ভাল করিয়াছ মা'। অর্থাৎ 'বঞ্চিত ক'রে বাঁচালে মোরে।'

শমন ভয়ে কবি একদিন মায়ের শরণ লইয়াছিলেন—পরে মৃত্যুভয় জয় করিয়া শমনকে উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন—

আমি তোর আসামী নই রে শমন মিছে কেন করিস তাডনা।

জননীর কাছে কবি একদিন মুক্তি চাহিয়াছিলেন—পরে তিনি বৈষ্ণবসাধকদের মতই বুঝিয়াছিলেন মুক্তির চেয়ে বড় ভক্তি—

নির্ব্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল

(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মা চিনি খেতে ভালবাসি।

কবি বৈষ্ণবকবিদের অনুকরণে ভগবতীর গোষ্ঠলীলা বর্ণনা করিয়াছেন, জগজ্জননীকে কবি বালিকারূপে কল্পনা করিয়া তাঁহার বাৎসল্যলীলা দেখাইয়াছেন। যশোদার কোলে যেমন নীলমণি, মেনকার কোলে তেমনি উমা। বৈষ্ণবকবিদের সঙ্গে এখানে রামপ্রসাদের তফাৎ নাই। কালীকীর্ত্তনে কবি শুধু গোষ্ঠলীলা নয়, কালীর রাসলীলারও বর্ণনা করিয়াছেন। কবি কৃষ্ণকীর্ত্তনও লিখিয়াছিলেন। বৈষ্ণব না হইয়াও রামপ্রসাদ একজন বৈষ্ণবপদকর্ত্তা হইতে চাহিয়াছিলেন। কবি বৈষ্ণবভাবের কথা অনেক বলিয়াছেন—

সেখানে আনন্দ হাট গুরুশিষ্যে নাইক পাঠ
যে রসিক ভক্তশূর সে প্রবেশে সেই পুর।

ভক্ত তুলসীদাসের মত কবি বলিয়াছেন—

পাষাণ পূজে হর যদি পায় বসি তবে পাহাড় পূজি অবিরত।

উপনিষদের অনেক তত্ত্বই প্রসাদের গানে স্থান পাইয়াছে—কবি শ্যামা মাকে রসেশ্বরী বলিয়াছেন—

রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী।

গীতার মতে সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধ হয়, ভক্ত কবি বলিয়াছেন—মায়ের করুণাই সমস্ত দগ্ধ করে। "সাবেক যত জমা ছিল সে অঙ্কে মা শূন্য করে দিল রে—এমনি মায়ের করুণা।"

কবি বলিয়াছেন—এই বিশ্ব ইচ্ছাময়ীর লীলা। ইহা আমাদের দুর্ব্বোধ্য, আমরা তাঁহার লীলারহস্য বুঝি না।—আমরা কেবল ডেলা দিয়া ডেলা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করি। সত্যই তাঁহার স্বরূপ কি তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। এই লীলাতত্ত্বের গহনতা ও রহস্যময়তার আভাস দিতে গিয়া কবি অনেক সময় রহস্যময় ভাষারও প্রয়োগ করিয়াছেন—ঠারেঠোরে অনেক কথা বলিতে চাহিয়াছেন। যে সকল পদে সন্ধ্যাভাষায় তত্ত্বকথা আছে সে পদগুলি সাধকদেরই অধিগম্য। কেবল তাহাই নয়—ষট্চক্রভেদ লইয়াও পদ রচনা করিয়াছেন। ষট্চক্র সাধনপ্রণালী যৌগিক ও তান্ত্রিক মতে মূল সাধন তত্ত্ব। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং যাঁহারা সদ্‌গুরুর উপদেশ লাভ করিয়াছেন ঐ পদগুলি তাঁহাদের অধিগম্য। এসকল পদ সাহিত্যগোষ্ঠীর বাহিরে।

সাধক কবি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথাও অনেক পদে বলিয়াছেন—

"জ্ঞানাগ্নি জ্বালিয়া কেন ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না।"
"জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন শক্তিরূপা মুক্তা ফলে।"
"জ্ঞানকিনারায় লাগিয়ে তরী ভক্তিডোরে বেঁধে থুবি।"

আর একশ্রেণীর পদ সাহিত্যের গোষ্ঠীতে স্থান পাইতে পারে। এইগুলি শান্ত রসের রচনা। সংসার যে মায়ার খেলা—ঐন্দ্রজালিকের ভোজবাজি, দারাপুত্র-পরিবার যে কেহই আপনার নয়, চক্ষু মুদিত করিলে সবই যে অন্ধকার—যে সাংসারিক মায়ায় আমরা আবদ্ধ তাহা যে আমাদের বিমাতা কিংবা মাসী—আমরা বিমাতা বা মাসীকে মা বলিয়া ভুল করিতেছি—এই সকল কথার উল্লেখ করিয়া কবি বৈরাগ্যের সঞ্চার করিতে চাহিয়াছেন। এই পদগুলিও বঙ্গদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে।

একালে যেমন গ্রন্থাহৃত জ্ঞানকে কবিরা ভক্ত সাজিয়া কাব্যে রূপ দিয়া থাকেন, সেকালে তাহা ছিল না। যে জ্ঞান ভক্তকবিদের জীবনের অঙ্গীভূত হইত না, যাহা অন্তরে অন্তরে গভীরভাবে অনুভব করিতেন না—তাহাকে তাঁহারা কবিতা বা গীতে রূপদান করিতেন না। এজন্য রামপ্রসাদের পদাবলী হইতে তাঁহার নিজস্ব জীবন-সাধনারই পরিচয় মিলে।

কবির সাধকজীবনের প্রথম স্তরে তিনি দক্ষিণাকালীর উপাসক ছিলেন। এই মূর্ত্তি রণরঙ্গিণী, লোলরসনা, ভীষণা—কিন্তু কবি এই মূর্ত্তির অন্তরালে স্নেহময়ী জননীমূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন—তাঁহার দুই হস্তে বরাভয়। দ্বিতীয় স্তরে তিনি বিশ্বব্যাপিনীরূপে জননীকে দেখিয়াছেন—কেবল বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নয়—বিশ্বমানবের মধ্যেও জননীকে দেখিয়া কবি বলিয়াছেন—'মা বিরাজে ঘরে ঘরে, আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, ঘটে ঘটে আছ যেমন জলে সূর্য্যছায়া।' তারপর সংশয়ের সুরে সাধক বারবার

বলিয়াছেন—কে জানে গো কালী কেমন—ষড়্‌দর্শন না পায় দরশন।

তারপর তাঁহার মনে হইয়াছে—তারা চিন্ময়ী। এই বিশ্ব যে মনের সৃষ্টি, শ্যামা মা সেই মনোজগৎকে ব্যাপিয়া আছেন।

ইহার পরই ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মময়ীকে কবি ব্রহ্মের মহাশক্তি রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া কবি গাহিয়াছেন—'তারা নামের মর্ম্ম পরমব্রহ্ম'। তখন তিনি নিজেকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। তখন দেহাত্মবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে, মৃত্যুভয় গিয়াছে—জলের বিম্ব জলে উদিত হইয়া জলেই যদি মিশায়, তাহাকে ত মৃত্যু বলে না। এই আত্মাত পরমাত্মার বিম্ব। ব্রহ্মজ্ঞানের জন্ম হইল, লৌকিক ধর্ম্মসংস্কারের হইল মৃত্যু। অতএব এক সঙ্গে 'জনম মরণাশৌচ,—অশৌচে 'সন্ধ্যাপূজা বিড়ম্বনা।' এসব ত এখন 'বিধবার ভালে সিন্দূরের মত।' এই অবস্থায় কবি ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। শ্যামা মায়ের সকল রূপ ছায়াচিত্রের মত অপসারিত হইয়া শ্যামা মা সচ্চিদানন্দময়ী হইয়া উঠিয়াছেন,—কবি বলিয়াছেন—তারা আমার নিরাকারা। দক্ষিণাকালীর সেই রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়াছে—লৌকিক উপাসনাকে তাঁহার পুতুলপূজা ও প্রতীকোপাসনাকে নিম্নস্তরের উপাসনা বলিয়া মনে হইয়াছে—লৌকিক অনুষ্ঠান ও কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার কাছে বালকের খেলা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। এই অবস্থায় প্রসাদকবি যে গানগুলি লিখিয়াছেন সেগুলি বাৎসল্যরসের গান নয়—সেগুলি শান্তরসের গান। কবির চিত্তে সকল দ্বন্দ্বদ্বিধাসমস্যা ও ক্ষুব্ধতার অবসান হইয়া গিয়াছে, হৃদয় শান্ত, স্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ, অনুদ্বেল ও স্বচ্ছ, রম সত্য তাহাতে প্রতিবিম্বিত। ধর্ম্মজগতের সমস্ত কোলাহল শিশুর কলরব বলিয়া এবং গৃহসংসার যশমান ধনসম্পদ্ দারাপুত্রপরিবার

সমস্তই অনিত্য ও অসার বলিয়া তখন প্রতিভাত। মনের এই অবস্থায় নির্ব্বেদ, ঔদাস্য ও নির্ব্বিকার ভাবকে অবলম্বন করিয়া যে গানগুলি উচ্ছ্বসিত হইয়াছে—তাহা সংসারপিষ্ট ত্রিতাপক্লিষ্ট প্রাণের সমস্ত ধূলিমালিন্য দূর করিয়া তাহাকে জীবনসন্ধ্যার গেরুয়া রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে—ক্ষণকালের জন্য মনের রজস্তমের সর্ব্বাবরণ সর্ব্বাভরণ দূর করিয়া তাহাকে সত্ত্বোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।—কবি বলিয়াছেন—

'সন্ধ্যা হলো এবার কোলের ছেলে মা কোলে নিয়ে চল।'

যে সকল পদে জ্ঞানের বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেগুলির তুলনায় ভক্তিরসাত্মক পদগুলি উৎকৃষ্টতর। আবার সেগুলির তুলনায় পরিপূর্ণ বাৎসল্য রসের পদগুলি আরো উৎকৃষ্টতর।

রামপ্রসাদের পদে মাতৃগতপ্রাণ বাঙ্গালী অন্তরের সাড়া পায়, দুর্গত বাঙ্গালীর অন্তরের সর্ব্ববিধ আকিঞ্চন ঐগুলিতে ফুটিয়াছে। ঐগুলির ভাষা বাঙ্গালীর খাঁটি প্রাণের ভাষা—বাঙ্গালীর ঘরসংসার জমিদারী, আদালত, হাটবাজার ও তাহার জীবিকার্জ্জনের বিবিধ ক্ষেত্রের চল্‌তি ভাষায় এইগুলি রচিত। বাঙ্গালীর বুকের ভাষা ও মুখের ভাষা দুই-ই মিলিত হইয়াছে এই পদাবলীতে। বাংলার ঘরের চল্‌তি ভাষাকে রামপ্রসাদই প্রথম সাহিত্যে স্থান দিয়াছেন।

আর ছন্দ? বাংলার ছড়াপাঁচালীর প্রবাদ-প্রবচনের নিজস্ব ছন্দ রামপ্রসাদের হাতে প্রথম সঙ্গীতের বাহন হইয়াছে। রামপ্রসাদই প্রথম বাংলা শব্দের হসন্ত-বাহুল্যের চমৎকারিতা উপলব্ধি করিয়া হিল্লোলিত ছন্দে লিখিতে পারিলেন—

এমন—মানবজীবন রইল পতিৎ আবাদ কর্‌লে ফল্‌ত সোনা।

বাংলার ছন্দ ও ভাষায় নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে এই রামপ্রসাদ হইতে। যে ছন্দে যে ভাষায় বাংলাদেশের মায়েরা চিরদিন তাহাদের

ছেলেদের ভুলাইয়া আসিয়াছে—সেই ছন্দ ও সেই ভাষায় রামপ্রসাদ সর্ব্বপ্রথম মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

কবি তাঁহার গাঢ় অনুভূতিকে সুস্পষ্ট রূপদান করিবার জন্য রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন। এই রূপকপ্রয়োগ চল্‌তি ভাষাকে ঋদ্ধিশালী করিয়া সুরের প্রকৃতিই কিরূপ বদলাইয়া দেয় রামপ্রসাদের গানগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রামপ্রসাদ নূতন সুরের স্রষ্টা নহেন—তিনি তাঁহার গানে হৃদয়ের দরদ এমন করিয়াই মিশাইয়াছেন যে তাঁহার গানের সুর রামপ্রসাদী সুর বলিয়া পৃথক্ একটি সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে।

রামপ্রসাদ 'ব্রহ্মস্বাদ' লাভ করিয়া সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সংসার ত্যাগ করিযা চলিয়া যান নাই। সন্ন্যাসগ্রহণও একটা সংস্কার ও বাহ্য অনুষ্ঠানমাত্র। তিনি তাহারও অতীত স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভোগবিমুখ চিত্ত বারবারই ব্রহ্মময়ীর কাছে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছে—'সন্তানকে দুঃখ দেওয়ার জন্য কেন কলুর চোখঢাকা বলদের মত সংসারের ঘানিগাছে ঘুরাইতেছ মা।' যে ষড়্‌রিপু ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহায়তায় মানুষ এ সংসারে ভোগে মগ্ন হইয়া ইহকাল-পরকাল হারায়, সেইগুলিকে তিনি মহাশত্রু বলিয়াছেন। এইগুলির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই অভিমানী কবি মায়ের কাছে একটু নরম হইয়াছেন। এই সংসারাশ্রমে থাকিয়াই তিনি ঐ রিপুগুলির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে সন্ন্যাস ও গৃহধর্ম্মের একটা সন্ধি হইয়াছিল ব্রহ্মজ্ঞানে। তিনি অন্য যে তান্ত্রিক বা যৌগিক সাধনাই করুন, অকৃত্রিম গভীর ভক্তির গুণেই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই ভক্তিই বঙ্গসাহিত্যকে এমন একটা শক্তি দিয়া গিয়াছিল যাহার বলে গীতিসাহিত্য একটি নূতন

ধারায় প্রবাহিত হইতে পারিয়াছিল। বৈরাগ্যের ছায়াচ্ছন্ন এই ভক্তিধারা বঙ্গের হৃদয় ভেদ করিয়া বহিয়া গিয়াছে। গৃহীরা সেই ধারায় সত্ত্বপূত হৃদয়ের অশ্রুধারা মিশাইয়াছেন। এই ধারা কত শাখাতেই না বিভক্ত হইয়া অনন্তের উদ্দেশে ধাবিত হইয়াছে! পরবর্ত্তী যুগের বৈরাগী, আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ ও শ্যামাসঙ্গীত-রচয়িতৃগণ এই সকল শাখার পরিপোষক ও প্রবর্ত্তক। সকলেরই ঐ এক সুর—সংসার অনিত্য, দেহ পঞ্চভূতের চক্রান্তের আস্তানা, পরম-ধনের সন্ধান কর—দারাপুত্রপরিবার কেহ কারও নয়,—সংসারচক্র হইতে অব্যাহতি চাই। রামমোহন রায় পর্য্যন্ত গাহিলেন—

"শেষের সেদিন মন কর রে স্মরণ যেদিন ভবধাম ছাড়িবে।"

এই শান্ত রসের গেরুয়া রঙের ভক্তিধারা বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথের গীতাবলীতে এক অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে। আর অবিমিশ্র স্বকীয় রূপেই পর্য্যবসান লাভ করিয়াছে রজনীকান্ত সেনের কতকগুলি গানে।

রামপ্রসাদকেই মনে পড়ে যখন কান্তকবির কণ্ঠে শুনি—

পার হ'লি পঞ্চাশের কোটা,
আর দুদিন বাদে মন রে আমার ফুল ঝরিবে থাকবে বোঁটা।
তুই—আশার বশে দিন হারালি বশ হ'ল না রিপু ছটা।
তোর—ভিতর মলিন বাইরে টিকি মালার থ'লে তিলক-ফোঁটা।
লোকে কয় তোর সূক্ষ্মবুদ্ধি দেখে রে তোর দালানকোঠা,
তুই—দিনের বেলায় রইলি ঘুমে আমি কই তোর বুদ্ধি মোটা।
তুই—পাকা চুলে করিস টেরি বাঁধতে যখন হয় রে জটা।
তুই—পাণ ছেঁচে খাস হায় রে দশা পড়ে গেছে দন্ত কটা।
তোর—খাওয়াপরা ঢের হয়েছে এখন পারের কড়ি জোটা।
কান্ত বলে সব ফেলে দে তুলে নে কম্বল আর লোটা।

২

রামপ্রসাদের সাধক-কবিজীবনে বেদান্ত ও সাংখ্য, চণ্ডী ও গীতা, নিরাকারবাদ ও সাকারবাদ, জ্ঞান ও ভক্তি, সংসার ও সন্ন্যাস, শাক্তের গঙ্গা ও বৈষ্ণবের যমুনার মিলন ও সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল। তিনি সেকালের বিভিন্ন ধর্ম্মসাধনার আপাত বিরোধের সমন্বয় সাধন করিয়া শ্যামার চরণে মহাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ ছিলেন বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদী। শ্যামা তাঁহার ব্রহ্মময়ী, সর্ব্বঘটে বিরাজমানা। রামপ্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, জগৎসংসারকে তিনি মায়া বলিয়াই জানিতেন। অবিদ্যার মোহ হইতে প্রজ্ঞানের মধ্যে যে মুক্তি—তিনি তাহাকেই মুক্তি মনে করিতেন। তিনি ধর্ম্মের বাহ্য সংস্কার ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্মকে অসার বলিয়াই মনে করিতেন। চিত্তশুদ্ধির জন্য এইগুলির প্রয়োজন থাকিতে পারে—চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে এই গুলির কোন প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল তাঁহার সিদ্ধান্ত। এসকল কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলিয়াছি। এই প্রবন্ধে প্রসাদের রচনা হইতে কিছু কিছু অংশ বক্তব্যের সমর্থনের জন্য উদ্ধৃত করিতেছি। রামপ্রসাদের পদাবলীর নিম্নলিখিত চরণগুলি তাঁহার ধর্ম্মসাধনায় ব্রহ্মবাদিত্ব প্রমাণ করে।—

প্রকৃতিপুরুষ তুমি। তুমি সূক্ষ্মস্থূলা, কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা।

রামপ্রসাদ শ্যামাকে বলিয়াছেন—একাধারে প্রকৃতি-পুরুষ। 'চৈতন্য-রূপিণী নিত্য ব্রহ্মময়ী মহেশী।'

প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতো হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে, পদে গঙ্গা গয়া কাশী।

তারা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী—'সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে।" কবি বলিয়াছেন—

ওগো, তুমি ক্ষিতি তুমিই জল মা ফল ফলাচ্ছ ফলা গাছে।
তুমি শক্তি তুমি ভক্তি তুমিই মুক্তি শিব বলেছে।

*　　*　　*

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে　　ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে
ওরে আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মাকে।

*　　*　　*

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীব　　ভেদ ভাবে শিবাশিব
উভয়ে অভেদ যেন পরমাত্মাস্বরূপিণী।

নিত্যানন্দময়ী শ্যামামায়ের মধ্যে কৈবল্য লাভকেই তিনি মুক্তি বলিতেন—নির্ব্বাণে আনন্দও নাই—দুঃখও নাই। প্রসাদ বলেন,—

১। নির্বাণে কি আছে ফল　　জলেতে মিশায় জল।
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মা চিনি খেতে ভালবাসি।
যে লভে সাযুজ্য ভাব নির্ব্বাণ কি তার মনে ধরে ?

২। মৃত্যুঞ্জয়ে উপযুক্ত সেবায় হবে আশুমুক্ত
সকলি সম্ভবে তাতে পরমাত্মায় মিশাইবে।

৩। প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয় জল হয়ে তা মিশায় জলে।

ঘট ভাঙিয়া গেলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, মৃত্যুতে জীবাত্মা তেমনি পরমাত্মায় বিলীন হইবে। লোকে "ঘটের নাশকে মরণ বলে।"

এই মরণ মুক্তি-ইত তবে। রামপ্রসাদ এই মুক্তি চাহেন নাই। তিনি চাহিয়াছেন সাযুজ্য। তিনি নির্ব্বাণের চির মরণ চাহেন না—তিনি সাযুজ্যের অমরত্ব চান। কোথাও স্বর্গধামের নামও করেন নাই!

বাহ্যানুষ্ঠানের অসারতা উপলব্ধি করিয়া রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।

বৈদান্তিক কবি এ সংসারকে মায়ার খেলা বলিয়াছেন—অনেকগুলি পদে। শ্যামাকে তাই বলিয়াছেন—বাজিকরের মেয়ে।

১। এ সকল ত তোরই মায়া বাজিকরের বাজির মত।
তুই দিয়েছিস মা মনের পায়ে মস্ত বেড়ী দারাসুত।

২। যেমন ভোজের বাজি কারসাজি তেম্নি ফাঁকি শ্যামার লীলে।
আপ্‌নি মৎস্য আপ্‌নি ধীবর মা আপ্‌নি খেলো কারণ-জলে।

৩। ওমা তোর মায়া কে বুঝতে পারে ?
তুমি ক্ষেপা মেয়ে মায়া দিয়ে রেখেছ সব পাগল ক'রে।

৪। এসব ক্ষেপা মায়ের খেলা। যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা।

৫। এমন কল করেছ কালী বেঁধে রাখ মায়াপাশে।

৬। মনরে মন, মায়াডোরে বঁড়শি গাঁথা, স্নেহ বল কারে।

রামপ্রসাদ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, অবিদ্যার মোহ তাঁহার কাটিয়া গিয়াছিল, তাই জোর করিয়া বলিয়াছেন—

তোমার জারিজুরি আমার কাছে খাটবে না মা কোন কালে।
ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে।

এই মায়া বা অবিদ্যার ফলেই ষড়্‌রিপুর এত প্রতাপ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মিলেই অবিদ্যার সহিত ষড়্‌রিপুরও পরাজয়। তখনই সর্ব্ব তৃষ্ণার তৃপ্তির ফলে নিত্যানন্দ লাভ।

অবিদ্যা-বিমাতার ব্যাটা তারা ছ'টা কাম আদি।
যদি তুমি আমি এক হই তো পুর হ'তে দূর করে দি।
বিমাতা মরেন শোকে ছ'টায় যদি আমল না দি,
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি পার হ'য়ে যাই আশা-নদী।

এ সব জ্ঞানমার্গের কথা। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানসাধনায় রামপ্রসাদের তৃপ্তি হয় নাই। ভক্তির সহিত জ্ঞানের মিলনসাধন হইয়াছে

তাঁহার জীবনে সাকার বা প্রতীক উপাসনায়। তিনি তাই বলিয়াছেন—

আকার তোমার নাই অক্ষর আকার
গুণ-ভেদে গুণময়ী হয়েছ সাকার।

ভক্তের প্রতি করুণাবশতঃ ব্রহ্মময়ী সাকারা হইয়াছেন। নিরাকারের বা নির্গুণের প্রতি ভক্তি নিবেদন চলে না,—তাঁহার উপাসনাও চলে না।

মায়াতীত নিজে মায়া উপাসনাহেতু কায়া।

রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ীর কালী-মূর্ত্তি-কল্পনারও একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বটে নাশ করে কাল।
সেই কালে গ্রাস করে বদন করাল॥
এই হেতু কালী নাম ধর নারায়ণী।
তথাচ তোমারে বলে হরের কামিনী।

রামপ্রসাদের বহু পূর্ব্ব হইতে এই মহাকালী মূর্ত্তিতে ভারতীয় সাধকগণ ব্রহ্মময়ীর উপাসনা করিয়া আসিয়াছেন। রামপ্রসাদও এই মূর্ত্তিতেই ব্রহ্মময়ীকে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এই মূর্ত্তির সঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে—নিষ্ক্রিয় শবরূপী পুরুষ—শিব। ফলে, সাকার উপাসনায় বৈদান্তিক রামপ্রসাদ সাংখ্যের ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছেন।

ব্রহ্মময়ীকে সাকাররূপে আবির্ভূত হইবার জন্য রামপ্রসাদ আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

১। বসন ভূষণ নেই মা তোমার রাজার মেয়ে গৌরব কর।
মা'গো আমরা সবে লাজে মরি এবার মেয়ে বসন পর।
২। মা বসন পর বসন পর মা বসন পর তুমি
রাঙা চন্দনে মাখিয়া জবা পদে দিব আমি গো।

মুক্তকেশী বিবসনারূপ নিরাকারতারই অভিদ্যোতক। বসন পর অর্থাৎ সাকার হও, কায় ধারণ কর মা, আমি রাঙা চন্দনে মাখা জবা চরণতলে অর্পণ করিয়া ভক্তি-তৃষ্ণা নিবারণ করি।

রামপ্রসাদ স্পষ্টই বলিয়াছেন--

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অ-ভাবে কি ধরতে পারে?
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠুরি ভোর হ'লে সে লুকাবে রে।
ষড়্‌দর্শন না পায় দর্শন আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে পুরে।
সে ভাব লোভে পরমযোগী যোগ করে যুগযুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি বারে বারে
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে।

এই পদটিতে রামপ্রসাদের সাকার উপাসনার তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রসাদ যাঁহাকে মাতৃভাবে উপাসনা করেন--সেই ব্রহ্ম ভাবগম্য অর্থাৎ ভক্তিরস-গম্য। ভক্তি বিনা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম ভক্তিরসের রসিক—রসো বৈ সঃ—তিনি রসানন্দের মধ্যে বিরাজ করেন। ভক্তেরা এই ভক্তিরসের পথেই সাধনা করেন। নির্গুণ ব্রহ্মকে সগুণা,—নিরাকারা ব্রহ্মময়ীকে সাকারা কল্পনা না করিলে তাঁহাকে ভক্তিপথে পাওয়া যায় না। তাই রামপ্রসাদ তাঁহাকে মাতৃভাবে উপাসনা করেন। নির্গুণবাদ বা নিরাকারব্রহ্মবাদের মধ্যে এই সাকার ও সগুণ-বাদের ভক্তি-সাধন কেমন? যেমন কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি। ভোর হইলে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে তাহা লুপ্ত হয়। কবি এই পদে 'চাতরে হাঁড়ি না ভাঙ্গিয়া' এই কথা ঠারেঠোরে বলিলেন।

মায়ের চেয়ে ভক্তি-ভালবাসার পাত্র আমাদের আর নাই। সাধক

কবি সেইজন্য ব্রহ্মের সগুণরূপকে মাতৃরূপ ছাড়া অন্যরূপে ধারণা করিতে পারেন নাই। তাই কবি বলিয়াছেন—

কখন বিশ্বরূপিণী কভু বামা উলঙ্গিনী।
কভু শ্যামসোহাগিনী কভু রাধার পায়ে ধরে।
কখন বিশ্বজননী পঞ্চভূতনিবাসিনী।
কভু কুলকুণ্ডলিনী চতুর্দ্দশ বিশ্বোপরে।
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা।
তাই ডাকি মা বলে মা ঐ অভয় চরণ পাবার তরে।

চণ্ডীতে যে দেবী অপারা, অসঙ্গা, অব্যাকৃতা, চিতিরূপেণ সংস্থিতা, জগতঃ আধারভূতা, অলঙ্ঘ্য-বীর্য্যা, যা দেবী মাতৃরূপেণ সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা সেই মহাশক্তি মহামায়া রামপ্রসাদের ভাবকল্পনায় রুদ্রাণী হইয়াও দক্ষিণা জননীরূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

এই মূর্ত্তিকে অবলম্বন করিয়াই রামপ্রসাদের ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতগুলি রচিত হইয়াছে।

এ শরীরে কাজ কিরে ভাই (যদি) দক্ষিণে প্রেমে না গলে।
এ রসনায় ধিক ধিক (যদি) কালীনাম নাহি বলে॥
কালীরূপ যে না হেরে পাপ চক্ষু বলি তারে
ওরে সেই সে দুরন্ত মন না ডুবে চরণতলে॥
সে কর্ণে পড়ুক বাজ থেকে তার কিবা কাজ—
ওরে সুধাময় নাম শুনে চক্ষু না ভাসালে জলে॥
যে করে উদর ভরে সে করে কে সাধ করে?
যদি না পূরে অঞ্জলি চন্দন জবা আর বিল্বদলে।
সে চরণে কাজ কিবা মিছা শ্রম রাত্রি দিবা
ওরে কালী মূর্ত্তি যেথা সেথা ইচ্ছাসুখে নাহি চলে॥

ইন্দ্রিয় বিবশ যার দেবতা কি বশ তার ?
রামপ্রসাদ বলে বাবুই গাছে আম্র কি কখনো ফলে ?

কবিরাজ গোস্বামীও এই কথা বলিয়াছেন—

বংশীগানামৃত-ধাম লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ু তার মাথে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ?
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জনম হৈল অকারণে।
মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
সেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ অঙ্গগন্ধ যার নাই সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান ॥
কৃষ্ণকরপদতল কোটি চন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার যাউ সেই ছারখার
সেই বপু লৌহসম গণি ॥

ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদসাধনই অথবা অবশতা-সম্পাদনই ধর্ম্ম নয়, সর্ব্বেন্দ্রিয়কে দেবতার সেবায় ও ভক্তিনিবেদনে নিয়োজিত করাতেই তাহাদের চরম সার্থকতা।

রামপ্রসাদ তুলসীদাসের মত বলেন—মাথায় জটাভার বহন করিয়া যোগীর ভান করিয়া বসিয়া থাকিলে যদি তাঁহাকে পাওয়া

হইত—তাহা হইলে বটবৃক্ষ তাঁহাকে পাইত। গুরুপদ পাইয়া নয়ন মুদিয়া বসিয়া থাকিলে যদি তাঁহাকে পাওয়া যাইত তবে অন্ধেরাও তাঁহাকে পাইত। ভক্তি না থাকিলে যোগযাগ ইন্দ্রিয়জয় সবই ব্যর্থ।

বৈদান্তিক রামপ্রসাদ শুধু জ্ঞানমার্গেই তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই, সংসার ও সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সর্বেন্দ্রিয়কে শ্যামা-মার সেবায় উৎসর্গ করিয়া ভক্তিপথে ব্রহ্মময়ীকে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার জীবনে জ্ঞানের সহিত ভক্তির একটা সন্ধিও ঘটিয়াছিল। কোন কোন পদে এই সন্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তিনি ভক্তি উপাসনার আনুষ্ঠানিক দিকটার অসারতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মের প্রচলিত সাকার রূপগুলির মধ্যে একটা ঐক্যও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহার নিজস্ব স্বীকৃত সাকাররূপের সহিত অন্যান্য রূপ যে অভিন্ন এ সত্য তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

"কালী হলি মা রাসবিহারী।" "হলেন বনমালী কৃষ্ণকালী বাঁশী ত্যজে করে অসি।" "ওরে একে পাঁচ পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষাদ্বেষি।"

এ সকল কথা রামপ্রসাদকে কেন জোর দিয়া বলিতে হইয়াছিল তাহারও কারণ ছিল। রামপ্রসাদের সময়ে—শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব খুব বেশি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল শ্যাম-শ্যামা নয়, সকল দেবতার সঙ্গেই শ্যামারূপের অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

> উপাসনা ভেদে তুমি প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ'।
> যেজন পাঁচেরে এক ক'রে ভাবে তার হাতে মা কোথায় বাঁচ।
> প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ।
> তুমি সেই পাঁচে (সাঁচে ?) নির্ম্মিতা হয়ে মনোময়ী হ'য়ে নাচ।

ফলে, তাঁহার ভক্তির দেবতা সর্ব্ব রূপ, সর্ব্ব মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চিন্ময়ী বা মনোময়ী হইয়া উঠিয়াছেন। কবি একটি পদে বলিয়াছেন—

জাঁক জমকে করলে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা জানবে না রে জগজ্জনে।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদিসিংহাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি-সুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে।
ঝাড়লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কিরে তোর সে রোশনে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে দেও না জ্বলুক নিশিদিনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী জয় কালী ব'লে বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে।
প্রসাদ বলে ঢাকে ঢোলে কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয়কালী বলে দাও করতালি মন রাখ সেই শ্রীচরণে।

মনোময়ী আবার বিশ্বময়ী হইয়াও মানসী পূজা গ্রহণ করিয়াছেন—

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে ও মন করতে চাও তাঁর উপাসনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয় আলোচাল আর বুটভিজানা।
প্রসাদ বলে ভক্তিমন্ত্র কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোকদেখানো করবে পূজা মা আমার ঘুষ খাবে না।

ইহাও কবির ভক্তিসাধনার একটি স্তর। এই স্তরে আরোহণ করিয়া মূর্ত্তি-কল্পনার দ্বারা প্রতীকোপাসনাকে রামপ্রসাদ অন্তর হইতে অন্তরে (দূরে) অবস্থিত বলিয়াছেন।

"মা আমার অন্তরে (মনে) ছিলে বুঝি দোষ দেখে অন্তরে (দূরে) গেলে।" কবি মূর্ত্তিপূজার ও সাকার উপাসনার প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন—প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্য, দ্বিতীয়তঃ ভক্তি-মার্গে অগ্রসর হইবার জন্য। চিত্তশুদ্ধি সাধিত হইলে এবং ভক্তিমার্গে যথেষ্ট দূর অগ্রসর হওয়ার পর আর এইরূপ উপাসনার প্রয়োজন নাই। যেখানে কেবল প্রথাগত মূর্ত্তি উপাসনা, ভক্তির সঙ্গে সম্পর্ক নাই সেখানে কোন লাভই হয় না। তুলসীদাসের মত প্রসাদ কবিও বলিয়াছেন—

পাষাণ পূজে হর যদি পায় শুনরে অজ্ঞান যত।

তবে আমি দিবানিশি বসি বসি পাহাড় পূজি অবিরত।

রামপ্রসাদ এই ভক্তিসাধনার অতি উচ্চগ্রামে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের যে পদ-গুলিতে ভক্তির এই উচ্চগ্রামের সুর ধ্বনিত হইয়াছে, সেইগুলি সংকাব্যের পদবীতেও আরোহণ করিয়াছে। রামপ্রসাদ যে বিশুদ্ধা ভক্তির সাধক—সে ভক্তির সাধনাকে পূর্ব্বেই বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের পদাবলীতে বাণীরূপ দিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-রসতত্ত্বে বাৎসল্য রসের ভক্তিসাধনা নন্দযশোদার সম্পর্কে দেখানো হইয়াছে। অবশ্য বৈষ্ণব সাধকদের মতে 'এহো বাহ্য।' বৈষ্ণবসাহিত্যে সন্তানের প্রতি জননীর বাৎসল্যরসের পরাকাষ্ঠাই দেখানো হইয়াছে। রামপ্রসাদের পদাবলীর উপজীব্য হইয়াছে জননীর প্রতি সন্তানের অনুরাগ। ইহাকে প্রতিবাৎসল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। রামপ্রসাদের পর এ রসের কবি আরও জন্মিয়াছেন—কিন্তু রসের নিবিড়তায় কেহই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

বৈষ্ণবের ভক্তি-সাধনার সঙ্গে রামপ্রসাদের ভক্তি-সাধনার পার্থক্য আছে আর এক বিষয়ে। বৈষ্ণব সাধকের ভক্তির মধ্যে ইষ্টদেবতার

কাছে প্রার্থনীয় কিছুই নাই,—ধন না, মান না, যশ না, কোন ঐহিক সম্পদ নয়, স্বর্গ নয়, অপবর্গ নয়, মুক্তিও নয়। রামপ্রসাদের ভক্তিও প্রায় এমনি নিষ্কাম বটে। একস্থলে তিনি বৈষ্ণবসাধকের মতই বলিয়াছেন,—

কাশীতে মোলেই মুক্তি এ বটে শিবের উক্তি।
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি মুক্তি হয় তার সেবাদাসী।

কিন্তু রামপ্রসাদ শমন-ভয়ের কথা বারবারই বলিয়াছেন। স্বর্গাপবর্গদা দেবীর কাছে তিনি শমন-ভয় হইতে মুক্তি চাহিয়াছেন।

মহাশক্তির কাছে বাসনাজয়ের জন্য, ষড়্‌রিপুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যও শক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন।

এ বিষয়ে প্রচলিত শাক্ত ধর্ম্মের সহিতও রামপ্রসাদের ভক্তি-ধর্ম্মের পার্থক্য আছে। প্রচলিত শাক্তধর্ম্মে দেবীর কাছে ঐহিক সম্পদ প্রার্থনা করা হয়। মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবীর কাছে সুখসম্পদ প্রার্থনা করা ত হইয়াছেই—তাহা ছাড়া অনেকস্থলে,—ভয়ে ভক্তি। চণ্ডী শুধু শুভঙ্করী নহেন, তিনি অশুভঙ্করীও। তাঁহাকে প্রসন্ন না রাখিলে মানুষের ত কথাই নাই—অন্য কোন দেবতারও মর্ত্ত্যজীবকে অনর্থ হইতে রক্ষা করিবার শক্তি নাই। চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের তুলনায় রামপ্রসাদের ভক্তি যেমন নিষ্কাম, তেমনি গভীর। শ্যামামার কাছে সুখসম্পদ প্রার্থনা দূরে থাকুক, রামপ্রসাদ জানিতেন—শ্যামা মা তাঁহার ভক্তের সর্ব্ববিধ ঐহিক সম্পদ হরণ করিয়া তাহাকে অকিঞ্চনত্ব দান করেন।

"ওমা যে জন তোমার নাম করে মা তার হাড়ের মালা ঝুলিকাঁথা।"

ইহাই যাঁহার প্রতিদানরীতি—তাঁহার কাছে সুখসম্পদ কোন সন্তান চাহিতে যাইবে?

৩

রামপ্রসাদের আত্মপরীক্ষা, চিত্তশোধন ও সাধনভজনের ইঙ্গিত আভাস পদাবলীর মধ্যে কতটা পাওয়া যায় এখানে তাহারই আলোচনা করি। তিনি যে এক সময় তন্ত্রমতে যোগসাধনা করিতেন তাহার পরিচয় কোন কোন পদে পাওয়া যায়। যোগ-শাস্ত্রের কথা অনেক পদে আছে।

যেমন—হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবস রজনী তোমা॥
ঈড়াপিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তাঁর মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্ম সনাতনী ওমা॥

কবি যোগাসনের সাধনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—অন্যে

"ভয় পায় ভূতে মারে আসনে তিষ্ঠিতে নারে
সম্মুখে ঘুরায় চক্ষু ল'ল।" কিন্তু রামপ্রসাদ ?
"বিভীষিকা সেকি মানে ব'সে থাকে বীরাসনে
কালীর চরণ ক'রে ঢাল।"

আত্মশুদ্ধির জন্য সংযম, ব্রহ্মচর্য্য, রিপুদমন, সংসারে অনাসক্তি ইত্যাদির উপরই তিনি বেশি জোর দিয়াছেন। ষড়্‌রিপুই যে সাধনার প্রধান বাধা, একথা তাঁহার বহু পদেই আছে। ষড়্‌রিপু জয় করিতে পারিলেই

বিমাতা (অর্থাৎ অবিদ্যা) মরেন শোকে ছ'টায় যদি আমল না দি।
সুখে নিত্যানন্দপুরে থাকি পার হয়ে যাই আশানদী॥

অহংবোধকে ত্যাগ করিতে না পারিলে সাধনায় অগ্রসর হইবার উপায় নাই। "আমি এই আমার এই—এ ভাব ভাবে মূর্খ সেই।"

"ছাদে গো মা দশভুজা আমার ভরে তনু হইল বোঝা।"

এই অহংবোধকে জয় করিয়া গীতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কবি বলিয়াছেন,—

"তুমি কখন হাসাও কখন কাঁদাও যেরূপ রাখ মাগো যখন।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আপন।"

সংসারসুখে বিষয়সম্ভোগে সাধককবির অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই। তিনি পরমার্থলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছেন—

"চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে ঘুচ্‌ল না মা মুখের তিত।"
"যার পিতামাতা ভস্ম মাখে তরুতলে রয়।
ওমা, তার তনয়ের ভিটেয় টেকা এ বড় সংশয়॥"

বিষয়াসক্তির জন্য কবি নিজেকে বারবার ধিক্কৃত করিয়াছেন।

"ত্যজে কমলদলের অমল মধু, মত্ত হলি বিষয়রসে।
হেরে গুড়ের কলস ওরে অলস, এমন অবশ হলি কিসে।"

সংসারাসক্ত জীবনকে 'কলুর চোখ-ঢাকা বলদের' সহিত উপমিত করিয়াছেন। কর্ম্মবন্ধন বা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য বহু পদেই কবি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন।

"প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি কর্ম্মডুরি দে মা কেটে।"
"একবার খুলে দে মা চোখের ঠুলি দেখি শ্রীপদ মনের মত।"

সাধনভজন করিতে গেলে লোকে ভণ্ড বলে, পাগল বলে। কবি বলিয়াছেন,—সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

১। লোকে মন্দ বলে বলবে তায় কিরে তোর ব'য়ে গেল।
আছে ভালমন্দ দুটো কথা যা ভাল তাই করা ভালো।

২। জয় কালী জয় কালী বল। লোকে বলে বল্‌বে পাগল হ'ল॥

সাধক কবি দুঃখকে মায়া বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি দুঃখজয়ের আনন্দ একটি পদে ব্যক্ত করিয়াছেন। "আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
বিষের কৃমি বিষে থাকিগো বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।
• দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে আমি করি দুখের বড়াই।'

সাধককবি তীর্থদর্শনাদিকে সাধনার অঙ্গ মনে করিতেন না। একথা তিনি বহুবারই বলিয়াছেন। যেমন—"কাজ কি তীর্থ গঙ্গা কাশী যার হৃদে জাগে এলোকেশী।" "তীর্থে ভ্রমণ মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন ক'র নারে"। গঙ্গার সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন "আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে বিমাতাকে মা বলিব।"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে কেবল তীর্থদর্শন কেন, ধর্ম্মের কোন বাহ্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কবি বলিয়াছেন—

"এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্মকর্ম্ম সব ছেড়েছি।
আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।"

ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে শৌচাশৌচবুদ্ধি লুপ্ত হয়, এইরূপ ভেদবুদ্ধি থাকিলে শ্যামা মাকে পাওয়া যায় না। "অশুচি শুচিকে ল'য়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি। যখন দুই সতীনে পিরীত হবে তখন শ্যামা মাকে পাবি।"

রামপ্রসাদ সাধনার জন্য গুরুর প্রয়োজন স্বীকার করিতেন। গুরুমন্ত্রের কথা, গুরুকৃপার কথা অনেক পদে আছে। বিশেষতঃ যোগসাধনায় গুরু চাইই। কবি বলিয়াছেন—

"দেখাদেখি সাধয়ে যোগ সিজে (কৃশ) কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছামিছি কর্ম্মভোগ গুরু বিনে প্রসাদ বলে।"

কেবল গুরুর কৃপাকেই সম্বল করিলে হইবে না, আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির সন্ধান রাখিতে হইবে এবং সেই শক্তিকে উন্মেষিত করিবার জন্য অধ্যবসায় চাই। কবি বলিয়াছেন—

ডুব দেরে মন কালী ব'লে। হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন দুচার ডুবে ধন না পেলে॥

আবার বলিয়াছেন,—

"ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস নারে বসে বসে।"

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ না করিলে শুধু গুরুদত্ত মন্ত্রে ফল কি ?

রামপ্রসাদ যে সুরাপানে মত্ত—সে সুরার গুড় গুরুদত্ত মন্ত্র, কিন্তু আত্মজ্ঞানই তাহার শুঁড়ি (আমার জ্ঞান-শুঁড়িতে চুয়ায় ভাটি)। তাই কবি বলিয়াছেন,—

"গুরুবাক্য শিরে ধর আত্মতত্ত্ব তত্ত্ব কর।
ঘরে আছে পরমরত্ন ভ্রান্তি ক্রমে কাচে যত্ন।
ওরে মিছে কেন ভ্রমণ করিস্ ভ্রান্তি সে তোর সাথে সাথে।"

এখানে ভ্রান্তির দুটি অর্থ (—ভ্রমণ ও ভ্রম)। দুই-ই এক।

সাধক কবি নারীকে ব্রহ্মময়ীর অংশরূপা এবং নরমাত্রকেই ভৈরব ভাবিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। ইহা তন্ত্রের কথা।

নারীমাত্রে ভাব শক্তি শুদ্ধ মনে করভক্তি,
প্রসাদ বলে এই যুক্তি ভৈরব ভাবিবে নরে।

রামপ্রসাদ ছিলেন অনাসক্ত সংসারী, গৃহবাসী সন্ন্যাসী। সংসারের অনিত্যতা তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেন—শেষের দিনের কথা অর্থাৎ শ্মশানের কথা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগরূক থাকিত। কারণ, তিনি ছিলেন শ্মশানবাসিনীর ভক্তসেবক। সেজন্য তাঁহার মনে সর্ব্বদাই শ্মশানের হাওয়া বইত, তাঁহার চারিদিকে একটা শ্মশানের আবহাওয়ারও সৃষ্টি হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহার অনেক পদে শ্মশানপথের কথা,—মহাযাত্রার কথা শান্তরসের উদ্দীপন করে—

১। মরণ সময় দিবে তোমায় ভাঙা কলসী ছেঁড়া চেটা।
যত ধন জন সব অকারণ সঙ্গেতে হায় যাবে কেটা।

২। যার জন্য মর ভেবে সে কি সঙ্গে যাবে চলে।
সেই প্রেয়সী দেবে গোবর ছড়া অমঙ্গল হবে ব'লে।

৩। যম আসি শিয়রে বসি ধরবে যখন অগ্রকেশে,

তখন সাজিয়ে মাচা কলসী কাচা বিদায় দিবে দণ্ডীবেশে।
হরি হরি বলি শ্মশানেতে ফেলি যে যার যাবে আপন বাসে।
রামপ্রসাদ ম'লো কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে।

৪। সুখের ভাগী অনেকে হয় দুঃখের ভাগী কেউ হবে না।
যখন শমন এসে ধরবে কেশে তখন কেবল ত্রিনয়না।

৫। রবিসুতদূত দণ্ড হাতে সে যে আছে শিয়রে বসি
তারে সাধিলে না করে দয়া বাঁধে গলায় রশারশি।
ধন জন পরিবার যাদের পেয়ে বড়ই খুশী,
তারা সময়কালে কেউ কারো নয় একা যাই আর একা আসি॥
প্রসাদ বলে ভাবতে গেলে নিশির স্বপন কান্নাহাসি॥

৬। মোলে দণ্ড দুচার কান্নাকাটি শেষে দিবে গোবরছড়া।
ভাইবন্ধু দারাসুত কেবলমাত্র মায়ার গোড়া॥
মোলে সঙ্গে দেবে মেটে কলসী কড়ি দিবে অষ্টকড়া।
অঙ্গেতে সব আভরণ সকলই করিবে হরণ
দোসর বস্ত্র গায়ে দিবে চারকোণা মাঝখানে ফাড়া॥

৪

আমাদের দেশে বহুদিন হইতে—বাংলাভাষার প্রথম যুগের সাহিত্যসৃষ্টি হইতেই—সাধন-ভজনের কথা এবং গূঢ়ধর্ম্মতত্ত্বকথা রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কাহ্নপাদ, শরহপাদ, ভুসুকুপাদ ইত্যাদি বৌদ্ধসহজিয়া সাধকগণের পদাবলী রূপকেই রচিত। রামপ্রসাদও অধিকাংশ বক্তব্যই রূপকের আবরণে বলিয়াছেন।

বৌদ্ধ সাধককবিদের মত রামপ্রসাদও সংসার-জীবনযাত্রার

কথা,—পাশাখেলা, সতরঞ্চখেলা, নৌকাবাওয়া, কলুর ঘানি, চাষ আবাদ, জমাখরচ, জমিদারের প্রজাস্বত্ব, ব্যবসায়বাণিজ্য, মহাজনী কারবার, চড়কপাক ইত্যাদির রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন, শ্যামা মায়ের সম্পর্কে দাবিদাওয়ার কথা আদালতের ব্যাপারের সহিত ঔপম্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। নশ্বর দেহ উপমিত হইয়াছে পিঞ্জর, জীর্ণতরী, ভাঙা ঘর, আবাদী জমি ইত্যাদির সহিত। চিত্তশুদ্ধির কথা রজকের কার্য্যের সহিত উপমিত হইয়াছে। কবি আপন হৃদয়কে বলিয়াছেন,—রত্নাকর এবং আত্মজ্ঞানকে বলিয়াছেন রত্ন। মন এখানে ডুবুরী। কবি দিব্যানন্দকে বলিয়াছেন সুরা, আত্মজ্ঞান এখানে শুঁড়ি, গুরুমন্ত্র এখানে গুড়। কবি নিজের সাধনাকে ডাণ্ডাগুলিখেলা, হালুইকরের ভিয়ান, শ্যামার লীলাকে ভোজবাজি, ঘুড়ি উড়ানো, জালফেলা এবং নিজের মনকে আসামী, জমিদারের প্রজা, শুকপাখী ইত্যাদির সহিত উপমিত করিয়াছেন।

ছয় রিপু, পঞ্চভূত, নয়টি ইন্দ্রিয় বিবিধ 'রূপকে' রূপায়িত হইয়া মূল্য রূপকগুলির সহিত সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপকগুলি সাঙ্গরূপক। বহু স্থলেই রূপকগুলি ক্লিষ্টরূপক (Strained Metaphor)এ পরিণত হইয়াছে। আলঙ্কারিক উৎকর্ষের বিচারে রূপকগুলির মূল্য খুব বেশি নয়, কিন্তু ভাবপ্রকাশের পক্ষে এইগুলির মূল্য অতুলনীয়। বিনা রূপকে সাধককবির সাধনার গূঢ়রহস্য অভিব্যক্ত হইত না।

রূপকগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সেজন্য এইগুলির ক্লিষ্টতার বা কৃচ্ছ্রচেষ্টার ত্রুটীর যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। সে বৈশিষ্ট্য এই—রূপকগুলি কবির নিজস্ব মৌলিকতা ঘোষণা

করিতেছ, এইগুলি প্রচলিত রূপকের পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়—আমাদের চারিপাশের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপাদান উপকরণ হইতে এইগুলি আহৃত। এই জন্যই রামপ্রসাদের পদ গভীর তত্ত্ব বহন করিয়াও জনসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে এবং বাঙ্গালীর প্রাণ এইগুলিতে সাড়া ও সায় দিয়াছে।

বৌদ্ধ সাধকদের চর্য্যাপদ হইতেই ধর্ম্মসাধনার গুহ্য তত্ত্বের কথা "ঠারে ঠোরে' বলিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বাউল কবিরা বিশেষ ভাবে এ প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অনেক স্থলে বলিয়াছেন—"চাতরে কি ভাঙ্‌ব হাঁড়ি বুঝে লও সব ঠারেঠোরে।" যাহা অনির্ব্বচনীয়, কবি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার চেষ্টা না করিয়া ঠারেঠোরেই বলিয়াছেন। এখন বুঝ নর যে জ্ঞান সন্ধান। কবির কথা—'আমার এ যে ভাষা কি তামাসা ব'লে না বুঝাতে পারি।' সাধনার পথে যাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা এই 'ঠারে ঠোরের' উক্তি হইতে অনেক কিছু বুঝিয়া লইবেন। এই ঠারেঠোরে বলা—এক প্রকারেব বক্রোক্তি। অতএব ইহা যেমন ধর্ম্মতত্ত্বের অঙ্গ, তেমনি সাহিত্যেরও অঙ্গ। কতকগুলি এই শ্রেণীর সূক্তির দৃষ্টান্ত—

১। প্রসাদ বলে যাবে কোথা মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।
এ যেন রাতকানার কথা উড়ে বেড়ায় রাতে-রাতে।

২। ওরে ওঝার ছেলে গরু হলে গোসাপে তায় কাটে নাকি।

৩। তুমি পরের ঘরের হিসাব কর আপন ঘরে যায় যে চুরি।

৪। ঐ যে জোরকা লাঠি শিরকা উপর আমার মন বুঝেছে
প্রাণ বুঝে না।

৫। মায়ের আপ্ত ভাবে গুপ্ত লীলা
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ ডেলা দিয়ে ভাঙে ডেলা।

৬। আমার কিল খেয়ে কিল চুরি তবু কালীবুলি না ছাড়িব।

৭। এ যে ত্যাজ্য ক'রে সোণার কাশী শ্মশানে বসতি করা।
ঘরের কথা বল্‌ব কারে যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা।

৮। অন্ধ স্কন্ধে অন্ধ চড়ে উভয়েতে কূপে পড়ে।
কর্ম্মীরে কি কর্ম্ম ছাড়ে তার কি প্রসঙ্গ।

৯। প্রসাদ বলে ভাবছ কি মন পাঁচ সোয়ারের তুর্কী ঘোড়া।
সেই পাঁচের আছে পাঁচাপাঁচি তোমায় করবে তোলাপাড়া॥

১০। প্রসাদ বলে বারে বারে না চিনিলে আপনারে।
সিন্দুর বিধবার ভালে মরি কিবা বিবেচনা।

রামপ্রসাদের পদে রূপক, উৎপ্রেক্ষা ও উপমাগুলি খুবই জোরালো—যেমন মৌলিক তেমনি যথাযথ। কয়েকটির দৃষ্টান্ত দিই—

১। মাগো একি রূপমাধুরী আহা মরি আহা মরি
গঠিল যে সে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন হৃদিসরোবর ত্যজি
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি

২। নির্ম্মলবর্ণাভা ভুজঙ্গমণিশোভা বিভূষণে হবে কিবা কাজ।
পূর্ণচন্দ্রকোলে খদ্যোত যেন জ্বলে নাহি বাসে লাজ।

৩। পুষ্পে যেমন গন্ধ তেমনি মা বিরাজে সর্ব্বঘটে।

৪। তনু তব ধারাধর রুধিরধারানিঝর
কালিন্দীর জলে কিংশুক যেন ভাসিছে।

৫। কেবল আশার আশা ভবে আসা, আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।

এ সমস্ত চিরপ্রচলিত ধরণের অলঙ্কৃতি। যেগুলিতে কবির সম্পূর্ণ নিজস্বতা প্রকটিত, সেইগুলির ২।৪টির দৃষ্টান্ত দিই।

১। (জীর্ণ দেহের সহিত উপমিত)
পাপ লোনা লাগি দেওয়াল করিলেক জরাযুত।

২। নির্ব্বাণে কি আছে ফল জলেতে মিশায় জল।
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি।

৩। মায়ের করুণা বরুণা ধারা অসিধারা অসি।
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি।

৪। এমন মানব জমি রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।

৫। তেল থাকতে নিবায় বাতি ছ'টা গুবরে পোকা এসে।

৬। অহংকার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজীর তাজী।

৭। এখন যদি না ভজিলে আমসী খাবে আম ফুরালে।

৮। মা আনায় ঘুরাবে কত। কলুর চোখঢাকা বলদের মত॥

৯। যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড পুন পেলে ধরে এঁটে
তেমনি ক'রে ধরতে চাই মা কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে।

১০। দুঃখে দুঃখে জরজর আর কত মা দুঃখ দিবে ?
সাগরে যার বিছানা মা শিশিরে তার কি করিবে ?

৫

কবিত্বের রসসৃষ্টির জন্য রামপ্রসাদ পদাবলী রচনা করেন নাই। তিনি ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রাণের বাণী সরলস্বরে উদ্গীত করিয়াছেন। ইহার ফলে. সর্ব্বত্র না হউক, অনেক স্থলে সে গীতি উচ্চশ্রেণীর কবিতার রূপই ধরিয়াছে। গহন অনুভূতিতে গাহন করিয়া প্রাণের গভীর সত্য প্রাণের আকৃতি ও আকিঞ্চনের সহিত

প্রকাশিত হইলেই কবিতা হয়। যেখানে কবি তত্ত্ব-কথাকে প্রাধান্য দিয়াছেন সেখানে কবিত্ব সৃষ্টি হয় নাই। ক্লিষ্ট রূপকের (strained) metaphor) সাহায্যে যেখানে কোন সত্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেখানেও কবিত্ব সৃষ্টি হয় নাই। বর্ত্তমান যুগে সম্পূর্ণাঙ্গ কবিতা যাহাকে বলে, রামপ্রসাদের পদগুলি তাহা নয়। প্রাণের কথা তাহার প্রকাশ-ধারায় মাঝে মাঝে উত্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে—সেই তরঙ্গশিখরগুলি সত্যের সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া কবিত্বের উচ্চগ্রামে উঠিয়াছে। একটি মাত্র চরণও এইরূপ কবিত্বের রসমর্য্যাদা লাভ করিয়া সমগ্র পদটিকে কবিত্ব-মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে। এই শ্রেণীর পদই বেশি।

যে যে পদে কবি অভিমানী সন্তানের রূপে জননীর আচরণ বিচার করিয়াছেন সেই সেই পদ পূর্ণাঙ্গ কবিতার মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। কোন কোন পদ বক্রোক্তির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের গুণেও সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভক্তের রচনা উপভোগ করিতে হইলে মনেও একটা ভক্তির পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করিয়া লইতে হইবে। যিনি ভক্ত নহেন অথবা ক্ষণকালের জন্যও মনেও ভক্তির আবেষ্টনী সৃষ্টি করিতে পারেন না—তিনি হয়ত কোন রসই পাইবেন না। আমি ২।১টি রচনা এখানে উৎকলন করি :—

যাওগো জননি জানি তোরে।
(আমি জানি তোরে পাষাণের মেয়ে)
তারে দাও দ্বিগুণ সাজা মা যে তোর খোসামুদি করে ॥
পেয়েছ পিতার ধর্ম্ম বুঝিলাম মা ব্যবহারে।
এমন হাবাতে নির্দ্দয়া দয়াময়ী নাম ধরেছ কোন বিচারে ॥
মা মা বলে পিছু পিছু যে জন স্তুতি ভক্তি করে।
দুঃখে শোকে দগ্ধে তারে দাখিল করিস যমের ঘরে।

অল্পে কি রে পাওয়া যায় ক্ষীণ আইলে বারি ধায়,
যে জন হয় শক্ত তার ত্রিকাল মুক্ত জোরজবরে ॥
চোখে আঙুল না দিলে পরে দেখবি না মা বিচার ক'রে
ওমা হরের আবাধ্য পদ ভয়ে দিলি মহিষাসুরে ॥
যে দুকথা শোনাতে পারে যে জনা হেতের ধরে
তার হ'য়ে আশ্রিত সদা থাকিস মা পরাণের ডরে।

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ !' ভক্তির এই যে অভিমান-জাত বক্রভাব—বক্রোক্তির দ্বারা এই যে গভীর ভক্তির প্রকাশ, ইহাই এই পদকে উৎকৃষ্ট কবিতার মর্য্যাদা দিয়াছে।

বৈষ্ণব কবিতায় ভক্তির গভীরতা সূচিত হইয়াছে মান-অভিমানের বিচিত্র লীলায়। অভিমানের অধিকারই বৈষ্ণব মধুররসের পদাবলীতে একদিকে যেমন ভাগবতী প্রীতির প্রকৃত স্বরূপ ও চরমতম গভীরতা প্রকাশ করিয়াছে—অন্যদিকে তেমনি ঐগুলিকে ব্রহ্মস্বাদসহোদর কাব্যরসে উত্তারিত করিয়াছে।

বাৎসল্য রস রামপ্রসাদের পদে মান-অভিমানের সুরে ঝঙ্কৃত হইয়া একদিকে বিশুদ্ধ কাব্যরসে, অন্য দিকে ভাগবতী প্রীতির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। চন্দ্রাবলীর অনুরাগের সহিত শ্রীরাধার অনুরাগের যে পার্থক্য, অন্যান্য শাক্ত কবির ভক্তির সহিত রামপ্রসাদের ভক্তির সেই প্রভেদ। যে রামপ্রসাদ সারাদিন মা মা বলিয়া ডাকেন, সেই রামপ্রসাদ যখন বলেন—

মা মা বলে আর ডাক্‌বো না, তারা, দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে ?
মা বিদ্যমানে এ দুঃখ সন্তানে মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না।
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠরযন্ত্রণা ॥

তখন ভক্তিরসের দাস্যাদি নিম্নতর স্তর হইতে ঢের বেশি ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়ে। কেবল তাহাই নয়। ভক্তিরস কাব্যরসেও উত্তীর্ণ হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বিলাতি হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতি নাই। ইউরোপীয়েরা যখন বলে—Thank God—তখন তাহার অর্থ এই—ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্ব্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন, তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্ব্বরের মতো চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না। কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্ত্তব্যও আমি সারিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে। কারণ, স্নেহের দাবির অন্ত নাই। সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর—মধুরতর। রামপ্রসাদের গানে আছে—"তোমায় মা মা ব'লে। আর ডাকবো না। আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।' এই উদার অকৃতজ্ঞতার কোন ইউরোপীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইতে পারে না। (পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ)। রামপ্রসাদ যখন অভিমান করিয়া বলেন—

জন্ম মৃত্যু যে যন্ত্রণা মাগো, যে জন্মে নাই সে জানে না।
তুমি কী জানিবে সে যন্ত্রণা জন্মিলে না মরিলে না।

তখন শ্যামামাকে একেবারে লজ্জায় নিরুত্তর করিয়া ছাড়েন। এইখানেই রামপ্রসাদের প্রকৃত কবিত্ব।

ঐহিক সম্পদের প্রতি রামপ্রসাদের লোভ ছিল না। দারিদ্র্যের দুঃখকেও তিনি দুঃখ বলিয়া মনে করিতেন না, তিনি বেশ জানিতেন—

ও তার তনয়ের ভিটেয় টেকা এ বড় সংশয়।
যার পিতামাতা ভস্ম মাখে তরুতলে রয়।

কিন্তু তবে যে তিনি বলিয়াছেন—

(১) কারো দুগ্ধেতে বাতাসা মাগো আমার শাকে অন্ন মেলে কৈ ?
কারে দিলে ধনজন মা হস্তী অশ্ব রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর আমি কি তোর কেহ নই।
(২) ঐ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাণ্ডি যারে দিলে জমিদারি।
(৩) ঐ যে যার মা জগদীশ্বরী তার ছেলে মরে পেটের ভুকে।
সে কি তোমার সাধের ছেলে মা রাখলে তারে পরম সুখে!
ওমা আমি কত অপরাধী নুন মেলে না আমার শাকে।
(৪) কেউ যায় মা পাল্কী চড়ে কেউ তারে কাঁধে করে,
কেউ গায়ে দেয় শালদোশালা কেউ পায় না ছেঁড়া টেনা।
(৫) কারু শাকে দাও মা বালি কারু দুগ্ধেতে দাও চিনির পানা।

এই সব কথা শ্যামামাকে অবিচারিকা বলিয়া অনুযোগ করার জন্য। শ্যামামার সঙ্গে রসকলহ করিবার এসব একটা অছিলা বা ছুতা মাত্র। এই অনুযোগ করার সাহস শুধু জ্ঞানমিশ্র ভক্তিতে মিলে না।

রামপ্রসাদ সুখসম্পদ চান না বটে, কিন্তু গৃহিধর্ম্ম পালন করার জন্য যেটুকু সঙ্গতির প্রয়োজন, সেটুকু তিনি মায়ের কাছেই প্রার্থনা করেন। তিনি অবশ্য মনে মনে জানেন—যোগক্ষেমের ভার ছেলের নয়—মায়েরই। তবু তিনি বলিয়াছেন—

গৃহি-ধর্ম্ম বড়কর্ম্ম যদি দুজন অতিথি আসে,
দুজন উপর তিনজন এলে হয় না যেন মুখ লুকাতে।

কবির নম্রতম প্রার্থনা তাই—

মাটির দেওয়াল বাঁশের খুঁটি তায় পারি যেন খড় জোটাতে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের এই মিনতি দুইটি বেলা পাই আঁচাতে।

প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রার্থনাই নয়, ইহা হইতে বরং ব্যঞ্জিত হয়,—তাঁহার কোন প্রার্থনাই নাই। মায়ের নাম করিবার জন্য, ভোগসুখের জন্য নয়, বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন। কোনপ্রকারে বাঁচিবার জন্য, যাহা প্রয়োজন তাহার বেশি কিছু প্রার্থনীয় নাই। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।" এই প্রার্থনাটুকুও তিনি করেন নাই। সে প্রার্থনা থাকিলে নিজে যে মা শ্মশানবাসিনী সর্ব্বহরা এবং সর্ব্বহারা, 'দিগম্বরত্বেন যাঁহার নিবেদিতং বস্ত্র' তাঁহার চরণ আশ্রয় করিতেন না, ভারতচন্দ্রের মত অন্নপূর্ণার শরণ গ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বে যে অভিমান ও সাহসের কথা বলিয়াছি,—তাহার চেয়ে আরো অধিকতর সাহসের কথা আছে। প্রসাদ বলেন—ছেলে আবার মায়ের স্তব-স্তুতি করিবে কেন? কোন মা ছেলের খোসামোদ চায়? আর পাষাণী মায়ের তোষামোদে লাভই বা কি?

যে জন তোমার নাম করে মা তারে দাও মা ঝুলিকাঁথা॥
তারে দাও মা দ্বিগুণ সাজা মা যে তোর খোসামোদি করে॥
পেয়েছ পিতার ধর্ম্ম বুঝিলাম কর্ম্মের ব্যবহারে॥
এমন—হাবাতে নির্দ্দয়া দয়াময়ী মা নাম ধয়েছ কোন্ বিচারে?

ইহাতেও কবির অনুযোগের শেষ হয় নাই। তিনি অভিমানভরে বলিয়াছেন—

যেজন হয় শক্ত তার ত্রিকাল মুক্ত জোর জবরে।
চোখে আঙুল না দিলে ত দেখবি না মা বিচার ক'রে।

তারপরে কবি নিন্দাচ্ছলে বক্রোক্তিতে চরম অভিমানের বাণী শ্যামামাকে শুনাইয়াছেন। তিনি অভিমানের রোখে অসত্য কথা বলিয়াও, অন্যায় দোষারোপ করিয়াও, শ্যামামাকে

আঘাত করিবার সাহস প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার রসব্যঞ্জনা অপূর্ব্ব—

যে দুকথা শোনাতে পারে যে জনা হেতের ধরে।
তার হ'য়ে আশ্রিত সদা থাকিস্ মা পরাণের ডরে।
ওমা হরের আরাধ্য পদ ভয়ে দিলি মহিষাসুরে।

জীবনের চরম ধন যে আধ্যাত্মিক সম্পদ তাহা লাভ না করিয়া ঐহিক সম্পদ লাভ করিয়া লাভ কি? ঐহিক সম্পদ দিয়া যদি মা ছেলেকে ভুলাইতে চায়—তবে সেয়ানা ছেলে মাকে দুকথা না শুনাইয়া ছাড়িবে কেন? তাই প্রসাদ বলিয়াছেন—

(১) পেয়ে পেটের জ্বালা শরীর হলো কালা
তোলা দুধে ছেলে বাঁচে কত কাল।

(২) চিনি বলে নিম খাওয়ালে ঘুচ্‌লনা মা মুখের তিত।

ঐহিক সম্পদের মায়াকে কবি বলিয়াছেন—মহামায়ার ভগিনী—অর্থাৎ কবির মাসী। মায়ের চেয়ে কি মাসীর দরদ বেশী? কবি বলিয়াছেন—ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল।

মাসীর মায়া···করে নানা খেলা দেয় দ্বিগুণ জ্বালা·· বাড়ায় জঞ্জাল। এই মাসীত মায়ের মত স্তন্য দান করিতে পারে না। তোলা দুধে কি মায়ের দুধের তৃষ্ণা মিটে?

কবি পাষাণের বেটীকে শাসাইয়া বলিয়াছেন—

তুমি কৃপা না করিলে বিমাতার কাছে যাইব অর্থাৎ মা গঙ্গার গর্ভেই সকল জ্বালা জুড়াইব।

আর একটি দৃষ্টান্ত :—

চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?
নামে জগচ্চিন্তাময়ী—ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি।

প্রভাতে দাও বিষয় চিন্তে মধ্যাহ্নে দাও জঠর চিন্তে
ওমা শয়নে দাও সর্ব্বচিন্তে বল্‌মা তোরে কখন ডাকি।
দিয়েছ এক মায়া চিন্তে ওমা সদাই করি তাই চিন্তে,
না পারিলাম তোমায় চিন্‌তে মা, চিন্তা কূপে ডুবেই থাকি।
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে পরম চিন্তামণি পেয়ে
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে রামপ্রসাদকে দিয়ে ফাঁকি।

অভিমানের গভীরতা ইহাতে নাই—কিন্তু বক্রোক্তির গুণে ইহাও চমৎকার কবিতা হইয়াছে।

নিম্নলিখিত পদটীতে বক্রোক্তির দ্বারা রসপুষ্টি হইয়াছে।

শিব নয় মায়ের পদতলে, ওটা মিথ্যা লোকে বলে।
এর মূলকথা মার্কণ্ড মুনি চণ্ডীতে লিখেছে খুলে।
দৈত্য বেটা ভূমে পড়ে মা দাঁড়ায়ে তার উপরে
মায়ের পাদস্পর্শে দানবদেহ শিবরূপ হয় রণস্থলে।
সতী হয়ে পতির বুকে পা দিয়েছে কোনো লোকে ?
বরং দাস ব'লে দাও অভয়পদ রামপ্রসাদের হৃৎকমলে॥

আর একটি এই শ্রেণীর পদ :—

কেন মিছে মা মা কর মা কি আর আছে ভাই।
থাকলে আসি দেখা দিত সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।
শ্মশান মশান কত, পীঠস্থান ছিল যত
খুঁজে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত মিছেই যন্ত্রণা পাই।
বিমাতার তীরে গিয়ে কুশপুত্তল দহাইয়ে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই।
দীন রামপ্রসাদ ভণে মায়ের জন্ম ভাবনা কেনে
মা গেছে, নাম ব্রহ্ম আছে, তরিবারে ভাবনা নাই।

সাকার উপাসনা করিতে করিতে সাধকের মনে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে সগুন ব্রহ্ম নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মে পরিণত হন। তাহাতে নৈরাশ্যের কারণ নাই, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সহায় হয়। এই তত্ত্বের ব্যঞ্জনা ইহাতে আছে। অভিমানের সুরে বক্রোক্তির সাহায্যে ব্যক্ত ঐ তত্ত্ব কবিত্বের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে।

রামপ্রসাদের ভাষা খাঁটি বাংলাভাষা—ভক্তিমূলক পদগুলিতে সংস্কৃত সন্ধি-সমাস বা আভিধানিক শব্দ একেবারে নাই বলিলেই হয়। যে ভাষায় ভাগীরথীতীরের লোকেরা কথা বলে—রামপ্রসাদ সেই ভাষাতেই শ্যামামায়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন, প্রাণের ব্যথা জানাইয়াছেন —কোন্দল করিয়াছেন। ইহাই আদর্শ চল্‌তি ভাষা। চল্‌তি ভাষাতে কত উচ্চশ্রেণীর ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে, রামপ্রসাদ তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। চল্‌তি ভাষা লইয়া বর্ত্তমান যুগে যে সমস্যাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে রামপ্রসাদ বহু পূর্ব্বেই সেগুলির সমাধান করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদের ভাষা আদর্শ চলতি ভাষা বলিয়াই ইহাতে বহু ফারসী শব্দ অবাধে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। জমিদারি, আদালত, কাজকারবার ইত্যাদি হইতে রূপক সংগ্রহের জন্য ঐ সকল ব্যাপারে প্রচলিত ফারসী পদগুলি ঐ ভাষায় স্বভাবতঃ আসিয়া পড়িয়াছে। ডিক্রী, ডিসমিস, সমন, বাটা, কালেক্টারি ইত্যাদি ইংরাজি শব্দও আসিয়া পড়িয়াছে।

যেমন :—

১। মন আখেরি হলে গো মা শমন করবে সমন জারি,
জমি—নাইক হাসিল করলে তসিল কিসে হবে মালগুজারি।

২। হুজুরে উকিল যে জনা ডিসমিস তার আশয় ভারি।
করে আসল সন্ধি সওয়াল বন্দী যেরূপে মা আমি হারি।

৩। এমনি করেছি কায়দা পলাইলে নাইক ফায়দা
হামেশা রুজু ভক্তি প্যায়দা দু নয়ন দারোয়ান রেখেছি।

প্রয়োজনমত সংস্কৃত শব্দও এ ভাষায় অপাংক্তেয় হয় নাই। বাংলা ভাষার জোরালো চল্‌তি গৎগুলি (idiom) এ ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে—ডেলা দিয়ে ডেলা ভাঙা, উঠান চষা, তবিল তছরূপ করা, নাতোয়ানি কাচ কাচা, হাটে হাঁড়ি ভাঙা, শকার-বকার বলা, দুধকলা দিয়া সাপ পোষা, ঠেঙার গুঁতি, ভূতের বেগার খাটা, কাজের কাজী, বিষের কৃমি, একূল ওকূল দুকুল হারানো, দোটানায় পড়া, পাঁচাপাচি করা, শাকে বালি দুধে চিনি, হরিষে বিষাদ, মাটীর দরে বেচা, ঘটে বুদ্ধি না থাকা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো, ঠারে ঠোরে বলা, জাবি-জুরি খাটানো, খেল খেলা এইরূপ অজস্র চল্‌তি গৎ কবির ভাষার মধ্যে স্থান পাইয়া ভাষাকে জোরালো করিয়াছে।

বাংলাদেশে ভক্তিপ্রকাশের ভাষাই ছিল ইহাই। ইংরাজ আমলে খৃষ্টানী ভাবের ভক্তিতত্ত্বের প্রবর্ত্তনে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের পর ভক্তিপ্রকাশের ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এ ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে এবং তাহাতে পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য আনিয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের অমার্জ্জিত রাগগর্ভ ভাষায় যে অকাপট্য ও স্বতঃস্ফূর্ত্ততা ছিল তাহা হারাইয়াছে।

রামপ্রসাদ যে সর্ব্বজনপরিচিত বাংলার নিজস্ব ছন্দে পদগুলি রচনা করিয়াছেন,—সেই ছন্দের উপযোগী ভাষাও ইহাই। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে আর একজন কবি এই ছন্দে তাঁহার পদাবলী রচনা করেন, তিনি সাধককবি লোচনদাস। তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে এই ছন্দের প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। তিনি এই ছন্দে পদ রচনা করিতে গিয়া বাংলার নিজস্ব চল্‌তি ভাষাকে বঙ্গসাহিত্যে প্রথম পাংক্তেয় করিয়া তুলেন।

রামপ্রসাদের সামসময়িক ভারতচন্দ্রও একজন বঙ্গীয় ভাষাভুবনের দিগ্‌গজ। ভারতচন্দ্রের ভাষা বাংলার নাগরিক ভাষা, ইহা বাঙ্গালী হৃদয়ের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশের পক্ষে উপযোগী। রামপ্রসাদের ভাষা বাংলার পল্লীর ভাষা, বাঙ্গালী হৃদয়ের মাধুর্য্যপ্রকাশের পক্ষে এ ভাষা সম্পূর্ণ উপযোগী।‡

---

‡ রামপ্রসাদের সমস্ত পদের উদ্ধার আজিও হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য। এক রামপ্রসাদ সেন আর এক ঈশ্বর চন্দ্রগুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না। কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা বা কান্ত ভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছেন—ঈশ্বর গুপ্ত পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ অল্প।" ইঁহারা দুইজনেই এক অঞ্চলের লোক। ঈশ্বরগুপ্তই রামপ্রসাদের যে পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাই আমাদের সম্বল।

রামপ্রসাদের পদাবলী সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় লিখিয়াছেন—

রামপ্রসাদের পদাবলী কি কি কারণে লোপ পাইতে বসিয়াছিল তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া গুপ্ত কবি বলিয়াছেন যে, 'ধনীদের শিক্ষার অভাব ও রুচির বিকৃতি ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা প্রসাদ-পদাবলীকে সাধনার অঙ্গস্বরূপ মনে করিতেন, তাঁহারা এগুলি যথাসাধ্য গোপন রাখিতেন। তৃতীয়তঃ জনসাধারণ শিক্ষা দীক্ষার অভাবে পদাবলীর রসগ্রহণ করিতে পারিত না।' ইহা ব্যতীত তিনি অন্যান্য কারণের কথাও বলিয়াছেন। এবং তিনি যথাসম্ভব পদাবলী উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তবুও বিস্মৃতির ঘনীভূত অন্ধকারে উজ্জ্বল রত্নরাজিগুলির অধিকাংশ চিরদিনের জন্য আচ্ছন্ন রহিয়াছে; কবে যে তাহাদের উদ্ধার হইবে তাহা জানি না। যাহা হউক' আমরা দেখিতেছি যে আজ যে আমরা প্রসাদ-পদাবলীর মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পাইতেছি, তাহার মূলে আছে গুপ্ত কবির অসাধারণ সাহিত্যনিষ্ঠা ও অদম্য উৎসাহ।"

(রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয় সম্পাদিত সাধনসঙ্গীতের ভূমিকা)

উমাসঙ্গীত

বৈষ্ণবের যেমন যশোদা—শাক্তের তেমনি মেনকা। যশোদার হৃদয়াকূতি ও মাতৃমমতা লইয়া বৈষ্ণবকবিগণ যেমন বাৎসল্যরসের পদ রচনা করিয়াছেন—শাক্তকবিগণ তেমনি মেনকার মাতৃমাধুর্য্য লইয়া ঐ রসের গীত রচনা করিয়াছেন। উমাসঙ্গীতকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়—উমার বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া। শিব অনাদি পুরুষ—কিন্তু পুরাণের জগন্মাতা একদিন নিজে বালিকাই ছিলেন, গিরিরাজের কন্যা তিনি,মেনকার অঞ্চলের নিধি। এ কল্পনা প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের কাব্য হইতেই প্রবর্ত্তিত হইযাছে। বালিকা উমা যে ভয়ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখে মেনকার চিত্তকে চঞ্চল করিয়াছে—তাহা আমাদের ভাষায় অপূর্ব্ব সঙ্গীতের রূপ ধরিয়াছে। উমার বাল্যলীলাও সঙ্গীতে লীলায়িত হইয়াছে।

উমা তপস্যা করিয়া শিবকে বরণ করিলেন—শিবের সঙ্গে গিরিরাজ যেন বাধ্য হইয়া উমার বিবাহ দিলেন। শিব প্রেত পিশাচ লইয়া থাকেন—ভিক্ষা করিয়া খান, ষাঁড়ে চড়িয়া বেড়ান, তাঁহার বয়স কত কে জানে! বাঘছাল পরেন, গায়ে ছাই মাখেন, সংসারের ধার ধারেন না, ভাঙধূতুরা খান, এমনই অদ্ভুত এই জামাতা। নারদ বলিয়াছেন—'ভয় নাই, তিনিই দেবাদিদেব—উমা তোমার মহাদেবী।' মাতৃহৃদয় একথা বুঝিয়াও বুঝে না। উমা যে স্বয়ং ব্রহ্মময়ী যে মাতৃহৃদয় তাহা ভুলিয়া যায়, সে মাতৃহৃদয় শিব যে দেবাদিদেব তাহা কি করিয়া মনে রাখিবে? শ্রীকৃষ্ণ যে বাল্যে

কত অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাতে কি যশোদার মাতৃহৃদয় বাৎসল্য ভুলিয়া দাস্যভাব অবলম্বন করিয়াছিল? এইরূপ অদ্ভুত জামাতার কাছে পাঠাইতে হইবে কুসুমসুকুমারী একমাত্র কন্যা উমাকে। শিব বৎসরে তিন দিনের জন্য উমাকে পিত্রালয়ে পাঠান—চতুর্থ দিনে লইয়া যান। সেদিনের মাতৃহৃদয়ের এই আর্ত্তনাদ, এই হাহাকার যদি সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা লাভ না করে তবে বাঙ্গালীর সঙ্গীতের আর কি উপজীব্য থাকে? ইহাই বিজয়ার গান।

সারা বৎসর পরে উমা গিরিরাজভবনে ফিরিয়া আসিবেন—মাতৃহৃদয় কি আশা, আকাঙ্ক্ষা ও উল্লাসেই না প্রতীক্ষা করে! জননীর অবসন্ন আর্ত্ত দেহে নব জীবনের সঞ্চার হয়। উমা ফিরিয়া আসিবে, তাহার জন্য সংসারে কতই না আয়োজন! মায়ের চোখে নিদ্রা নাই, বুকে উৎকণ্ঠা, মুখে অন্ন রোচে না—মেনকা সারাদিনরাত্রি উমার মুখই ধ্যান করিতেছেন। উমা ফিরিয়া আসিল, মেনকা আনন্দে অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতেছেন। এই উল্লাসের মধ্যেও কি গভীর কারুণ্য! ইহা সেই উল্লাস যাহা অশ্রু ছাড়া অন্য কিছুতেই প্রকাশ পায় না। এযে 'দুহুঁ ক্রোড়ে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'—এই ভাবের পরাকাষ্ঠা। এই অপূর্ব্ব ভাব বাঙ্গালী কবির কণ্ঠে সঙ্গীতে মূর্চ্ছিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর শানাইয়ে ঐ কারুণ্যময় উল্লাস বাণীহারা সুরে বর্ষে বর্ষে মূর্চ্ছিত। এই মেনকা শুধু হিমালয়ে নয়—সমগ্র বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। এই উমা শুধু কৈলাসে নয়, বাঙ্গালীর প্রতি কাঙাল সংসারে ক্ষুধিত সন্তানের মুখে বড় দুঃখে অন্ন যোগাইতেছে, মায়ের মলিন মুখখানির কথা মনে করিয়া অন্যমনা হইয়া যাইতেছে। মেনকা বাঙ্গালী মাতৃহৃদয়ের তিল তিল বাৎসল্যকণা দিয়া রচিত তিলোত্তমা—উমা বাঙ্গালী জননীর বাৎসল্য-সিন্ধুমন্থনে সমুত্থিতা লক্ষ্মী। যে মেনকা-

উমার সঙ্গীত বাঙ্গালী কবি গাহিয়াছেন—তাহার উদ্দীপনা পুরাণ হইতে আহৃত নয়—তাহা বাঙ্গালী আপন ঘরেই পাইয়াছে। তাই এই আগমনী-বিজয়ার গান পৌরাণিক সঙ্গীত নয়, ধর্ম্মসঙ্গীত নয়। ইহা বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত—তাহার গার্হস্থ্য জীবনেরই সঙ্গীত। ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর চেয়ে ঢের বেশী হৃদয়ের ধন—ঢের বেশি অন্তরঙ্গ প্রাণের বস্তু। বাঙ্গালী কবিকে সাধনার দ্বারা এই রস আয়ত্ত করিতে হয় নাই, ইহা সে স্বভাবতই লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী আপন ঘরের কথা মেনকা উমার জবানীতে প্রকাশ করিয়াছে। ঘরের কথার ভাষাও ঘরাও। এই গানের ভাবভঙ্গীভাষা কিছুই পরস্ব নয়। বিশেষতঃ বাঙ্গালী নারীর পক্ষে এতবড় সাহিত্য আর নাই।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে উমার বাল্যলীলার বর্ণনা আছে, আগমনী বিজয়ার কথা আছে, কিন্তু তাহা পৌরাণিক সাহিত্যেরই অঙ্গ।

প্রকৃত উমাসঙ্গীতের সূত্রপাত রামপ্রসাদ হইতে। রামপ্রসাদের—"গিরি এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না, "গিরিবর আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে" ইত্যাদি গীত অতি উচ্চাঙ্গের রচনা।

রামপ্রসাদ তাঁহার কালীকীর্ত্তনে বালক শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ- উমার বাল্যকৈশোরের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন; যশোদার হৃদয়-মাধুর্য্যটুকু সমস্তই মেনকার হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়া উমাসঙ্গীতে নূতন রসযোজনা করিয়াছেন।

রামবসুর—"কও দেখি উমা কেমন ছিলে মা ভিখারী হরের ঘরে।' "ওহে গিরি গা তোল হে মা এলেন হিমালয়"—ইত্যাদি গান উমা সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের "পুরবাসী বলে উমার মা তোর হারা তারা এল ওই।" গানটি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। দাশরথি

রায়ের "গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী" "কৈ হে গিরি কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী"—ইত্যাদি গান একদিন বাঙ্গালীর চোখে জল ঝরাইত। কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য উমাসঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার সঙ্গীত মধুর বাৎসল্যরসে ভরপুর। এইগুলি আজিও বাঙ্গালীর প্রাণ আকুল করে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তেরও উমাসঙ্গীত আছে। শ্রীধর কথকের—"যাও গিরি, আনিবারে আমার সে প্রাণধনে।" "গিরিরাজকে ডেকে দেগো, আমার গৃহে গৌরী এল।"—কালী মির্জার "কি কর গিরিবর আন গিয়ে আনন্দময়ীরে।" ইত্যাদি—এই শ্রেণীর সব গানগুলিই রামপ্রসাদের অনুবর্ত্তিতায় রচিত। রামপ্রসাদ এই সকল কবিদের গুরুস্থানীয়।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"শরৎকালে রাণী বলে বিনয়বচন।
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন।

সমস্ত আগমনী গানের এই ভূমিকা। প্রতি বৎসর শরৎ কালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রঙ কাঁচা সোনার মত হইয়া আসে, তখন গিরিরাণী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোণার গৌরীর স্বপ্ন দেখেন, আর বলেন—

আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন।

এ স্বপ্নকথা গিরিরাজ আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিত, বিভাস এবং রামকেলী রাগিণীতে শুনিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রতিবৎসরই তিনি নূতন করিয়া শোনেন। ইতিবৃত্তের কোন বৎসরে জানি না হরগৌরীর বিবাহের পরে প্রথমে যে শরতে মেনকারাণী স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যূষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে।

স্থলে জলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে—যাহাকে পরের হাতে দিয়াছি আমার সেই আপনার ধন কোথায় ?" (রবীন্দ্রনাথ—লোক সাহিত্য)।

মা মেনকার গৃহ শূন্য—"ডুবিল জলধিজলে প্রাণের কুমার"। তৃতীয় সন্তান আর নাই। তৃতীয় সন্তানের আর সম্ভাবনাও নাই। কন্যা উমা কৈলাসপুরে স্বামীর ঘর করিতেছে। মেনকার মাতৃহৃদয় সারা বৎসরই হাহাকার করে। তিন দিনের জন্য শিব দয়া করিয়া উমাকে ছাড়িয়া দেন—এই তিনটি দিনের অপেক্ষায় মেনকা সারা বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। কেবল পুত্রবিচ্ছেদ ও কন্যাবিরহ নয়, মেনকার মাতৃহৃদয়ে উদ্বেগের অন্ত নাই। উমা যে সাধ করিয়া ভিখারী পাগল ভোলানাথকে বরণ করিয়াছে! রাজার নন্দিনী উমা কৈলাসে কত দুঃখেই না আছে! মেনকা বলেন—

বলেছিল নারদ আমায় উমা তোমার রাজরাণী ;
এখন অন্যের মুখে শুনি—মা মোর অন্নের কাঙালিনী।
সুখী হয়ে শ্মশান-বাসে, উপবাস সে ভালবাসে ;
মা থাকে তার গৃহবাসে উপবাসে কৃশাঙ্গিনী।
থাকিতে অমূল্য রতন অস্থিমালা উমার ভূষণ ;
থাকিতে অতুল্য ভবন উমা বিল্ব-মূলবাসিনী।
বল্‌তে গিরি বুক ফেটে যায় জলাঞ্জলি দিয়ে লজ্জায়
গিরীশ নাকি যোগীর সজ্জায় গিরিজায় সাজায় যোগিনী।
যেতে কোথাও মহোৎসবে মা নাকি বৃষভে শোভে,
অন্য দেবনারী সবে চতুর্দোলে যায় হে শুনি।

বাঙ্গালার লৌকিক জীবনের মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য-রস আগমনী গানের কবিরা মেনকা ও উমার সম্পর্কের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

মেনকা কখনও বলিতেছেন—"এবার আমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না, শিব উমাকে নিতে এলে মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া কর্‌ব।" আবার কখনও বলিতেছেন—"কৃত্তিবাসকে ঘর-জামাই ক'রে রাখব। জামাই ত ভোলানাথ, বিল্বপত্রেই সে তুষ্ট। তাকে ভুলিয়ে রাখা শক্ত হবে না।"

আর একটি উদ্বেগ প্রাচীন বাংলার জননীদের পক্ষে স্বাভাবিক। "একে সতীনের জ্বালা না সহে অবলা যাতনা কত প্রাণে সয়েছে। তাহে সুরধুনী স্বামিসোহাগিনী সদা শঙ্করের শিরে রয়েছে।"

প্রকৃত পক্ষে উমার সাপত্নদুঃখ নাই। কৈলাসের উমার সে দুঃখ না থাকুক, বাংলার কুলীনব্রাহ্মণদের ঘরের উমার ত ঐ দুঃখ ছিল। কবিরা সেই দুঃখের কথাই গঙ্গার নাম করিয়া এখানে বলিয়াছেন।

স্বপ্ন দেখিয়া মেনকা অস্থির হইয়া পড়িতেছেন, কখনও মানসনেত্রে দেখিতেছেন—"চারিদিকে শিবারব—তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে।' কখনও স্বপ্ন দেখিতেছেন—"বসিয়ে আমার কোলে, দশনে চপলা খেলে, আধ আধ মা মা বলে বচন সুধাধার।" আবার কখনও মেনকা বলিতেছেন—"আমি দেখেছি স্বপন যেন উমাধন আশাপথ রয়েছে চেয়ে।" মেনকা আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না—বহু দিন উমার কোন সংবাদও পান নাই, কে জানে কেমন আছে? মাতৃ-হৃদয়ের দ্বিধা ও উদ্বেগের অন্ত নাই। রাম বসুর—

যদি পথিকে কেউ এসে বলে উমার মা উমা ভাল আছে তোর,
যেন করে স্বর্গ পাই অম্‌নি ধেয়ে যাই আনন্দে হয়ে বিভোর।

ইহাও বাঙ্গালীর ঘরের উমারই কথা,—যে উমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম হইতে কখনো সখনো লোক যাতায়াত করে।

উমাকে আনিবার জন্য মেনকা গিরিরাজের চরণে কাতর অনুনয় করিতেছেন—

ত্বরান্বিত হও গিরি তোমার করেতে ধরি

উমা 'ওমা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে। নিধুবাবু

আবার কখনও তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

সোনার মৈনাক ডুবিল নীরে সে শোকে রয়েছি পরাণ ধ'রে

ধিক হে আমারে ধিক হে তোমারে জীবনে কি সাধ আর।

গিরিরাজ অচল,—গিরিরাজ পাষাণ,—কাজেই তাহাকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বলিয়া অনুযোগ করার সুবিধাও হইয়াছে—

কামিনী করিল বিধি তেঁই হে তোমারে সাধি

নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে।

সতিনী সরলা নহে স্বামী যে শ্মশানে রহে

তুমি যে পাষাণ তাহা না কর মনেতে। —কমলাকান্ত।

তোমারে কেউ কিছু বলবে না দেখে দারুণ পাষাণ

আমার লোকগঞ্জনায় যায় প্রাণ। —রামবসু।

গিরিরাজের উত্তরটিও ভাবিয়া দেখিবার মত—

বারে বারে কহ রাণি গৌরী আনিবারে।

জানো ত জামাতার রীত অশেষ প্রকারে।

বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী,

ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মা'রে॥

তিলে না দেখিলে মরে সদা রাখে হৃদি'পরে

সে কেন পাঠাবে তারে সরল অন্তরে।

রাখি অমরের মান হরের গরল পান,

দারুণ বিষের জালা না সহে শরীরে।

উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্করকায়া

সে অবধি শিবজায়া বিচ্ছেদ না করে।

অবলা অলপমতি না জান কার্য্যের গতি
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ তারে মোর সঙ্গে দেহ
তার মা বটে, মানায়ে যদি আনিবারে পারে ॥

যাহার বিহনে মৃত্যুঞ্জয়েরও মৃত্যুর আশঙ্কা, গিরিরাজ কি করিয়া তাহাকে আনিবেন ? এক উপায় আছে,—যদি কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া তিনি লইতে পারেন। তিনিত কমলাকান্তের মা, বাপের কথায় যদি তিনি না-ই আসেন, বা শিব না পাঠান ছেলের আবদার কি এড়াইতে পারিবেন ? চমৎকার !

গিরিরাণীর মনে দ্বিধার উদয় হয়। তিনি তাই গিরিরাজকে বলেন—"সে ভোলানাথ, সহজেই তাহাকে ভুলাইতে পারিবে ! আর যদি না পার দু'জনকেই সঙ্গে আনিবে।" হায়, শিবের যদি পিতামাতা থাকিত তাহা হইলে মা বাপের ব্যথার মর্ম্ম সে বুঝিতে পারিত।

শিবের নেইক পিতা-মাতা কি জানিবে মায়ের ব্যথা,
কারে কবে দুঃখের কথা আমার স্বর্ণলতা বিধুমুখী। (অন্ধ চণ্ডীদাস)

যাহাই হউক, ভোলানাথকে ভুলাইয়া গিরিরাজ উমাকে লইয়া আসিলেন। গিরিনগরে কোলাহল পড়িয়া গেল। প্রতিবেশিনীরা ডাকিয়া বলিল—

"গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী।"
পুরবাসী বলে—"উমার মা, তোর হারা তারা এল ওই।"

তখন গিরিরাণী আতিবিথি চলিয়াছেন—

আমার উমা এলো ব'লে রাণী এলোকেশে ধায়।
যত—নাগর নাগরী সারি সারি সারি
দৌড়ি গৌরী মুখপানে চায়।

কারু—পূর্ণ কলস কক্ষে কারু—শিশু দুলাল বক্ষে
কারু—আধ শিরসি বেণী কারু—আধ অলকশ্রেণী
বলে—চল চল চল অচলতনয়া হেরি ওমা দৌড়ে আয়।
আসি—নগর-প্রান্তভাগে তনু—পুলকিত অনুরাগে
কেহ—চন্দ্রবদন হেরি দ্রুত—চুম্বে অধর বারি
তখন—গৌরী কোলে করি গিরিনারী প্রেমানন্দে ভেসে যায়॥
কত—যন্ত্র মধুর বাজে সুর—কিন্নরীগণ সাজে
কেহ—নাচত কত রঙ্গে গিরি—পুর সহচরী সঙ্গে,
আজু—কমলাকান্ত হেরি নিতান্ত মগ্ন দুটি রাঙা পায়।

উমা গিরিপুরের পাষাণ-প্রাঙ্গণে আসিলেন—রাম বসু একথায় বলিয়াছেন—"পাষাণেতে পদ্ম ফুটেছে।" রাণী দেখিলেন—তাঁহার অঙ্গনে আজ লোকারণ্য। রাণী তাই বলিতেছেন—

এই নগরে লোক ছিল ঘরে ঘরে
না ডাকিতে আমার ঘরে কেবা কবে এসেছিল।
কেবল উমার আগমনে সকলে সানন্দ মনে
গিরিপুরবাসিগণে গিরিপুর আজ পূরে গেল॥ (শ্রীধর কথক)

জননীর কোলে বসিবামাত্র উমার তনয়া-সুলভ অভিমান জাগিল—উমা বলিল—

"কই মেয়ে ব'লে আনতে গিয়েছিলে
গেলেনাক নিতে র'ব না মা যাব দুদিন গেলে।"

মা বলিলেন—

"আর অভিমান করিস্ নে মা ক্ষমা দেগো শঙ্করি,
দু' নয়নে বহে ধারা মা হয়ে কি সইতে পারি।"

স্নেহের আতিশয্যে মেনকা তখন আত্মহারা। কি বলিতে কি

বলিতেছেন তাহার ঠিক নাই। তিনি আবেগের মুখে বলিয়া ফেলিলেন—

জানি জামাতার গুণ কপালে আগুন শিরে জটা বাকল পরে
আমি লোকমুখে শুনি ফেলে দিয়ে মণি ফণী ধরে আছে ভূষণ ক'রে।
(রাম বসু)।

শিব কেন মণিহীন ফণী ধরিয়াছেন অঙ্গে,—মেনকা তাহার অত শত খোঁজ রাখেন না। মণিমণ্ডিতফণ ফণী অঙ্গে ধরিলে পাছে ঐশ্বর্য্য আসিয়া পড়ে—সেই ভয়ে মণিগুলিকে ফেলিয়া অঙ্গে শিব ফণী ধারণ করিয়াছেন। যাহাই হউক, একবার পিতার মুখে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া যিনি তনুত্যাগ করিয়াছিলেন—এবার তিনি মাতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া কোনপ্রকারে আত্মসংযম করিলেন। মাতৃহৃদয়ের মুগ্ধ বাৎসল্যের মর্য্যাদা তিনি বুঝিলেন,—তাই ধীরভাবে বলিলেন—

মা শিবের সেদিন এখন আর নাই।
যারে পাগল ব'লে বিবাহের কালে সকলে দিলে ধিক্কার।
এখন সেই পাগলের অতুল বৈভব কুবের কাণ্ডারী তার। (রাম বসু)

শরৎকমলমুখে আধ আধ উমার বাণী।
মায়ের কোলেতে বসি শ্রীমুখে-ঈষৎ হাসি
ভবের ভবনসুখ ভণয়ে ভবানী।
কে বলে দরিদ্র হর রতনে রচিত ঘর
জিনি কত সুধাকর শত দিনমণি॥
বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার
কে জানে কখন দিবা কখন রজনী॥
শুনেছ সতীনের ভয় সে সকল কিছু নয়

তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী ॥
মোরে শিব হৃদে রাখে জটাতে লুকায়ে দেখে
কার কে এমন আছে সুখের সতিনী।
কমলাকান্তের বাণী শুন গিরিরাজ রাণী
কৈলাস ভুধর ধরাধর-চূড়ামণি।
তা যদি দেখিতে পাও ফিরে না আসিতে চাও
ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধর-রমণি ॥

উমার মত গুণবতী সকল কন্যাই কাঙাল শ্বশুরঘর হইতে পিতৃগৃহে ফিরিয়া বৎসলা জননীকে এই রূপ কথা বলিয়াই সান্ত্বনা দিত।

দেখিতে দেখিতে তিনটি দিন ফুরাইয়া যায়। দুঃখের দিন ফুরাইতে চায় না, কিন্তু সুখের দিন শত পাখায় উড়িয়া যায়। নবমীর নিশি পোহাইলেই নন্দী ত্রিশূল হস্তে দুর্ব্বাসার মত হুঙ্কার দিয়া আসিয়া দাঁড়াইবে। তাই নবমী নিশির উদ্দেশে মেনকার কাতর আকিঞ্চন—

ওরে নবমীর নিশি না হইওরে অবসান।
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান।
খলের প্রধান যত কে আছে তোমার মত
আপনি হইয়ে হত বধ'রে পরের প্রাণ। (কমলাকান্ত)

এই কারুণ্যের ধারা আজিও বাংলায় লুপ্ত হয় নাই। খৃষ্টান ব্যারিষ্টার কবিও গাহিয়াছেন—যেয়োনা রজনি আজি লয়ে তারাদলে।

মধুসূদনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া হাকিম কবি নবীনচন্দ্র গাহিয়াছেন—

যেও না যেওনা নবমী রজনি সন্তাপহারিণি লয়ে তারাদলে।

কিন্তু কাল কাহারও কাকুতিমিনতি শুনে না। নবমীর নিশি পোহাইল—লক্ষ লক্ষ বিহগকণ্ঠের সঙ্গে মেনকার কণ্ঠে হাহাকার

কি হলো নবমী নিশি হৈল অবসান গো।
শুনিয়া ডম্বরু ধ্বনি বিদরে পরাণ গো॥
ভিখারী ত্রিশূলধারী যা চাহে তা দিতে পারি
বরঞ্চ জীবন চাহে তাও করি দান গো॥ (কমলাকান্ত)
এদিকে—বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে ব'সে মহাকাল
বেরোও গণেশ-মাতা ডাকে বার বার।
তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার। (রামপ্রসাদ)

রাণী জয়ার মারফতে বলিয়া পাঠাইলেন—

'জয়া, বলগে পাঠানো হবে না। হর মায়ের বেদন কি তা জানে না।'

রাণী গিরিরাজকে বলিলেন—

"আমার গৌরীরে লয়ে যায় হর আসিয়ে
কি কর হে গিরিবর রঙ্গ দেখ বসিয়ে।"
"নাথ হরচরণে যদি ধর দোষ নেই হে ধরাধর
চরণে ধরে দিলে যে মেয়ে ধর গঙ্গাধর পায়।"

গিরিবর মেনকাকে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘর হৈতে হর চায় গৌরী গিয়ে কহে মায় শুনি রাণী শোকে অচেতন।
রাম বনবাস শুনি যেমন কৌশল্যা রাণী কলস্বরে করেন রোদন।
সুখময়ী রাজকন্যা ভিক্ষু গৃহেদুঃখবন্যা কেমনে বঞ্চিবে তুমি তায়।
এই দুঃখে মরি আমি পরাণপুতলী তুমি কেমনে ছাড়িয়া যাবে মায়।
পাইনু পরম সুখ পাসরিনু সব দুখ নিরখিয়া তুয়া মুখ চাঁদে।
তোমারে বিদায় দিয়া কেমনে ধরিব হিয়া মনের সহিত প্রাণ কাঁদে।
বসাইয়া বরাসনে পালিব পরাণপণে মোর ঘরে থাক চিরকাল।
আমি যত কাল জীব আর তোমা না পাঠাব ফলভারে নাহি ভাঙ্গে ডাল।

গৌরীর গলায় ধরে বিস্তর বিলাপ করে জননী কান্দিয়া মোহ যায়!
মুছিয়া বদন খানি বলিয়া মধুর বাণী পার্ব্বতী প্রবোধ করে মায়।
স্বামী ঘরে কন্যা থাকে ধন্য তার বাপ মাকে অভাগার ঘরে থাকে ঝি—
বিদায় দাও মা বলি উমা হলো কৃতাঞ্জলি না কান্দ মাথার দিব্য দি।

(রামেশ্বরের শিবায়ন)

ফলভারে ডাল ভাঙ্গে না সত্য, কিন্তু ফল কিসের জন্য?

বৈষ্ণবপদাবলীর যশোদাই শাক্তপদাবলীতে মেনকার রূপ ধরিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যশোদার বাৎসল্যের সঙ্গে ঐশ্বর্য্যভাবের মিশ্রণ করা হয় নাই—বৈষ্ণব সাহিত্যের বাৎসল্য বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র। তাহাতে ঐশ্বর্য্যভাব সঞ্চারিত হইলে রসাভাস হয়। বালগোপালের অনেক অলৌকিক লীলা মা যশোদা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বাৎসল্যের বিশুদ্ধি ক্ষুন্ন হয় নাই। শাক্তপদাবলীতে এই বিশুদ্ধভাব রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না।

মেনকা স্বপ্ন দেখিয়া গিরিরাজকে রামপ্রসাদের ভাষায় বলিতেছেন—

আমার উমা সামান্য মেয়ে নয়।
গিরি তোমারি কুমারী…তা নয়—তা নয়।
স্বপ্নে মা দেখেছি গিরি কহিতে মনে বাসি ভয়।
ওহে কারো চতুর্ম্মুখ কারো পঞ্চমুখ উমা তাঁদের মস্তকে রয়।

কমলাকান্তের পদে গিরিরাজ মেনকাকে বলিতেছেন—

দেখ, মনে রেখ ভয় সামান্যা তনয়া নয় যাঁরে সেবে বিষ্ণু হরে।
ও রাঙাচরণ দুটি হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে।

গিরিরাজ কৈলাসে গিয়াছেন কন্যাকে আনিতে। উমা পিতার চরণে লৌকিক প্রথায় প্রণাম করিতে গেলেন।—

জগৎ জননী তায় প্রণাম করিতে চায়
নিষেধ করয়ে গিরি ধরি দুটি করে।
কমলাকান্ত-সেবিত তব শ্রীচরণ মা আমি
কত পুণ্যে পেয়েছি তোমারে ॥

বৈষ্ণবকাব্যে যশোদার অন্ধবাৎসল্য ভক্তিসাধনার অত্যুচ্চ স্তর, ইহা পরম সত্য। শাক্ত কবিতায় অনেকস্থলে মেনকার স্নেহ-মুগ্ধতা, মায়া—অবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় সত্যও নয়—অসত্যও নয়। তাই মেনকাকে বারবার স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছে—"কাহার জন্য তুমি এমন পাগলিনী? সেকি তোমারই বাহুপাশে বন্দিনী হইবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছেন? তিনি যে আদ্যাশক্তি মহামায়া।" স্বয়ং 'ব্রহ্মময়ী কপট তনয়া ছলে তোমার অসংখ্য তপস্যার ফলে' তোমাকে মা বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন।

"তোমার উমার মায়া নির্গুণে সগুণ কায়া ছায়ামাত্র জীবনাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী কালী তারা নাম ধরি কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে।"

গিরি বলেন—"রাণি, তোমার জামাতা কে জান? তুমি ভাবিতেছ সোনার পুতলি দিনু পাথারে ভাসায়ে। জান শিব কে? অণিমাদি আছে যার চরণে। পরম আনন্দে কন্যা দেহ গো পাঠায়ে।" উমার সখী জয়াও রাণীকে উপদেশ দিতেছে—

তখন,—জয়া কহে বাণী শুন শৈলরাণী উপদেশ কহি তোমারে।
কত—বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ঐ পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে।

মেনকা নিজেও নন্দীকে বলিয়াছেন—'জলাভাবে আকুল সিন্ধুকূলে থেকে তোরা।'

তোরা কি এতকাল মিথ্যা ঘরে কাল হরিলি
জান হয় রে জ্ঞানচক্ষে মোর তারা না হেরিলি। (দাশুরায়)

রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ছাড়া অন্য কবিদের রচনাতেও মাঝে মাঝে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বৈষ্ণবভাবের বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তি দেখা যায়। কাহার রচনা জানিনা, নিম্নলিখিত চরণগুলি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ—

প্রণামে আর কাজ নেই উমা মায়ের কথা রাখ।
যতক্ষণ তুই করবি প্রণাম ততক্ষণ মা ব'লে ডাক।
উমা রে তোর সিঁথির সিঁদূর অক্ষয় হোক।
জামাই মৃত্যুঞ্জয় রে আমার চিরজীবী হ'য়ে রোক।

আগমনী-বিজয়া-গানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কমলাকান্ত। কমলাকান্তের পর রাম বসু ও দাশরথির নাম করা যাইতে পারে।

শ্যামাসঙ্গীত

রামপ্রসাদের আগে শ্যামাসঙ্গীত দুই চারিটি রচিত হইয়াছিল, কিন্তু সেগুলি দেশে সমাদৃত হয় নাই। রামপ্রসাদকেই শাক্তপদাবলীব 'চণ্ডীদাস' বলা যাইতে পারে। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইলেও শক্তিপূজক বাংলাদেশে শ্যামাসঙ্গীতের পদ কেন রচিত হয় নাই তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রাচীন বাংলার ধর্ম্মের অনুষ্ঠানধারা অনুসরণ করিলে মনে হয়—বঙ্গভূমি নিজে শ্যামা হইলেও এদেশে সে সময়ে সন্তানবৎসলা শ্যামামার প্রভাব ততদূর সঞ্চারিত হয় নাই। দেশের বহুলোক বৈষ্ণব ছিলেন, পূর্ব্বে যাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহাদের কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ সহজিয়া, কেহ বাউলসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হয় বর্ণাশ্রমী সমাজের মুষ্টিমেয় লোক, নয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই শক্তি পূজা করিত। নারীজাতির মধ্যেই শক্তিপূজার প্রচার ছিল বেশী। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে বাংলাদেশে যে ধর্ম্মে-ধর্ম্মে দ্বন্দ্বের

ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়,—শক্তির ভক্তদের সহিত বিষ্ণু, শিব, ধর্ম্ম ইত্যাদির উপাসকদের দ্বন্দ্ব ঘটিতেছে। বাঙ্গালী যে শক্তির পূজা করিত, সে শক্তি ঠিক মহাকালী বা মহামায়া নহেন—তিনি কৈবল্যদায়িনী ব্রহ্মময়ী নহেন। তিনি আত্মপূজাপ্রচারের জন্য ব্যাকুল, তিনি নিজের বিলীয়মান ও বিলুপ্যমান দেবীত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ছলবল কৌশলের আশ্রয় লইতেছেন, ভক্তকে প্রলুব্ধ করিতেছেন, তাহার ঐহিক কামনার পূরণ করিতেছেন, তিনি ছলনাময়ী, তিনি নিজের প্রভাব সঞ্চারিত করিবার জন্য দেবপুত্রগণকেও অভিশাপের দ্বারা মর্ত্ত্যে অবতারিত করিতেছেন।

বাঙ্গালী এই শক্তিকে মনসা, চণ্ডী, শীতলা ইত্যাদি রূপে উপাসনা করিয়াছে। ইনি ব্রহ্মময়ী তারা নহেন। অনার্য্যদের উপাস্যা দেবী এবং বৌদ্ধদের আদ্যা, বজ্রতারা ইত্যাদি দেবীরাই শিবসীমন্তিনী জগদম্বার অঞ্চল ধরিয়া বাঙ্গালীর পূজা আদায় করিয়াছে। বিশেষতঃ পুরুষসমাজ এই দেবীদের সহজে স্বীকার করিয়া লয় নাই। নারীদেবতা বলিয়া বা নারীদের দেবতা বলিয়া পুরুষসমাজ মস্তক অবনত করিতে চায় নাই। আবার বৌদ্ধ ও অনার্য্যদের দেবতা বলিয়াও তাঁহার পূজায় আপত্তি ছিল। চণ্ডী যদি শিবজায়া মহামায়া বলিয়া স্বীকৃত হইতেন—তাহা হইলে শৈব ধনপতি কখনো চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করিতে পারিত না। অর্থাৎ কবিরা একথা লিখিতেই পারিতেন না—তাঁহাদের লেখনী স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

এই দেবীদের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ ছিল ভয়ের, ভালবাসার নয়—বাৎসল্যের নয়। পুত্রের সঙ্গে জননীর যে আবদার-অভিমানের সম্বন্ধ, এই দেবীদের সঙ্গে উপাসকের সে সম্বন্ধ ছিল না। সম্বন্ধটা ছিল কেন

আদানপ্রদানের—Barter & Exchangeএর! এরূপ স্থলে কাব্য রচিত হইতে পারে,—রসঘন আবেগাত্মক গীতি বা পদাবলী রচিত হইতে পারে না। তাই রামপ্রসাদের আগে বাৎসল্যরসাত্মক শাক্ত-পদাবলীর জন্ম হয় নাই।

শাক্ত কবিগণ মনসা শীতলাকে শ্যামা মার সহিত একাত্মিকা বলিয়া মনে করেন নাই বটে, কিন্তু অনেকেই চণ্ডীদেবীকেই শ্যামামায়েরই প্রাক্তনী অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কমলে কামিনীকেও শ্যামামায়েরই ছলনাময়ী মূর্ত্তি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তাই দেখি—রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে।" আর এক জন কবি লিখিয়াছেন—

এক বার মুখে দুর্গা বলে কালকেতু তোর চরণ পেলে
কেউ বা যোগ সমাধি করে পায়না দেখা যুগান্তরে॥
শ্রীমন্তে কমলবনে দেখা দিয়া দাও শ্মশানে।
আবার দয়া ক'রে পরক্ষণে চরণে রেখেছ তারে॥

এ জগৎ যে মায়াময় জলবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় অলীক, ব্রহ্ম ছাড়া সত্য কিছুই নাই,—বেদান্তের এই তত্ত্ব শাক্তকবিগণের একটী প্রধান উপজীব্য। রামপ্রসাদ বঙ্গগীতিকাব্যে এই তত্ত্বের প্রবর্ত্তক। শ্যামাকে কবিগণ 'বাজিকরের মেয়ে' বলিয়াছেন। যে মায়াময়ী বিশ্বপ্রকৃতি জীবকে ঐহিক সুখসম্পদে ভুলাইয়া রাখেন, তিনিই কঠোর পরীক্ষার পর জীবকে রক্ষা করেন। এই তত্ত্বটি শাক্তকবিগণ সম্ভবতঃ নাথ-সাহিত্য হইতেই পাইয়াছেন। তপস্যার দ্বারা মীননাথ শিবের কৃপায় 'মহাজ্ঞান' লাভ করিলেন। মহামায়া মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া মীননাথকে মোহিত করিয়া সেই জ্ঞান হরণ করিলেন। মীননাথ কদলীপত্তনে ভোগের পঙ্কে মগ্ন হইয়া থাকিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে

উদ্ধার করিবার জন্য সাধনা করিতে লাগিলেন। মহামায়া গোরক্ষনাথকেও মোহিত করিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। গোরক্ষনাথ যখন দেখিলেন মহামায়ার আকর্ষণ দুর্নিবার, তখন 'মা মা' বলিয়া মহামায়ার শরণ গ্রহণ করিলেন। ইহাই মহামায়ার সহিত মহাজ্ঞানের সন্ধি। মায়াকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—মায়াকে জননী বলিয়া তাঁহার শরণগ্রহণই একমাত্র সর্ব্বদ্বন্দ্বের সমাধান। বেদান্তের মায়ার জননীত্ব এই ভাবে বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষনাথ প্রচার করেন। গোরক্ষনাথ মহামায়ার সহিত সন্ধি করিয়া কেবল মীননাথকে উদ্ধার করিলেন না, বঙ্গের শুষ্ক জ্ঞানমার্গী সকল সাধককেই উদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ এই ধর্ম্মসমন্বয় ধারা অনুসরণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী শাক্ত কবিগণ ছলনাময়ী মহামায়াকে জননী বলিয়া তাঁহাদের পদাবলীতে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

রামপ্রসাদের আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে লৌকিক দেবতার প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাবের আতিশয্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু শক্তিপূজক বাঙ্গালীর শক্তিতন্ত্র বিলুপ্ত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর শক্তিসাধনা আর্য্যহিন্দুর বেদান্তপুরাণ ও তন্ত্রের মহাশক্তিকে আশ্রয় করিল। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী সহসা চৈতন্যলাভ করিয়া চৈতন্যময়ীর সন্ধান পাইল, তাহার মোহনিদ্রা বিদূরিত হইল। বন্যাবজ্রঝঞ্ঝাময়ী সর্পব্যাঘ্রসঙ্কুলা, পদ্মাতরঙ্গোদ্বেলা শ্যামা বঙ্গভূমিই যে শ্যামা-মা বাঙ্গালী যেন অজ্ঞাতসারে তাহাও উপলব্ধি করিল। সে মা মা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়া জগদম্বার চরণে আশ্রয় লইল। তখন হইতেই শাক্তপদাবলীর সৃষ্টি। যে বেদান্ত ভারতের শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্মের ভিত্তি, সেই বেদান্তই রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত শাক্তধর্ম্মেরও ভিত্তি। কাজেই শৈব ও বৈষ্ণব

ধর্ম্মের সহিত রামপ্রসাদের শাক্ত ধর্ম্মের কোন দ্বন্দ্ব নাই। প্রায় পঞ্চশত বৎসর ব্যাপী ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে রামপ্রসাদের পদাবলীতে।

বঙ্গদেশে শ্যামের আহ্বানে যদি শ্যামা আসিয়া না থাকেন—বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছে একথা বলিলে খুব অসঙ্গত হয় না।

রামপ্রসাদের পরে এদেশে অসংখ্য শ্যামাসঙ্গীত রচিত হইয়াছে। রামপ্রসাদই তাঁহাদের গুরু। রামপ্রসাদের মত সাধকতা ও কবিত্বের শক্তি তাঁহাদের কাহারো ছিল না। এক কমলাকান্ত রামপ্রসাদের শক্তি কতকটা পাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী শাক্তগীতি-গুলিতে কবিত্বের হয়ত অভাব আছে, কিন্তু ভক্তির অভাব নাই। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের আকিঞ্চন বহু পদেই দেখা যায়।

যে আবদার অভিমানের সুর রামপ্রসাদের পদগুলিতে কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছে, তাঁহাদের গীতগুলিতে তাহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—সর্ব্বনাশীর সঙ্গে কলহ করিবার সাহস যেন তাঁহাদের হয় নাই। রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসমন্বয়ের ধারা তাঁহারাও অনুসরণ করিয়াছেন—শ্যাম-শ্যামার অভেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের রচনায় কোন সংশয় দেখা যায় না। রামপ্রসাদের নিষ্কাম ভক্তির আদর্শও তাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত আগমনীবিজয়ার গানের ধারাটীকে কমলাকান্ত অধিকতর পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা আয়ততর হইয়াছে। শাক্তসঙ্গীতের সুরধুনী এদেশে কবিগানের অরণ্যের মধ্য দিয়া যাত্রাগানের সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে।

যে সকল গীতি জনবল্লভতা লাভ করিয়াছে সেগুলির সবই যে রসের দিক হইতে উৎকৃষ্ট তাহা নয়—সুরের জন্যই সেগুলির প্রচার বেশী হইয়াছে। এই সকল গীতির অনেকগুলি কেবল শ্যামা মায়ের রণরঙ্গিণী

রূপেরই বর্ণনা—কতকগুলি কেবল সম্বোধনপদের এবং বিশেষণের তালিকা, কতকগুলিতে শ্লেষযমকের ছড়াছড়ি, কতকগুলি ক্লিষ্টরূপকে (Strained metaphor) রচিত, কতকগুলিতে শুধু তত্ত্বকথা, কতকগুলি রামপ্রসাদের কথারই পুনরাবৃত্তি। যেমন কালীনাম সম্বল করিলে সন্ধ্যা বন্দনার প্রয়োজন নাই, গয়া গঙ্গা কাশীরও প্রয়োজন নাই, ঘটা করিয়া পূজাবলিও অনাবশ্যক—একথা অনেকেই বলিয়াছেন। সাধনার পথে পঞ্চভূত, ষড়্‌রিপু, দারাসুত পরিবার, বিষয়াসক্তির বাধার কথা অল্প-বিস্তর বহু পদেই আছে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো।"

"মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।"

এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি বহু পদেই পাওয়া যায়। সাহিত্যের দিক হইতে এই গীতগুলির মূল্য যাহাই হউক—এইগুলি শত শত কণ্ঠে গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া এ দেশে যে ভক্তির ধারাটীকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

চর্য্যাপদ-রচয়িতারা যেমন সকলেই সিদ্ধপুরুষ—বৈষ্ণব পদ-রচয়িতাদের প্রায় সকলেই যেমন সাধক—শাক্তপদরচয়িতাদের দুই চারজন ছাড়া কেহই সেশ্রেণীর সাধক নহেন—গৃহী ভক্ত মাত্র।

শাক্তধর্ম্ম গৃহীরই ধর্ম্ম। আশ্রম, কুঞ্জ, আখড়া, মঠ, সঙ্ঘারামের ধর্ম্ম নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন শাক্ত। এই সকল জমিদারবংশের অনেক রাজা, মহারাজা, কুমার শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ রামকৃষ্ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের সামসময়িক ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে মহারাজ মহাতাপচাঁদ, মহারাজ শিবচন্দ্র রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ,

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্রনাথ খাঁ, কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় ইত্যাদি ভূস্বামিগণ পদ রচনা করিয়াছেন। রাজা মহারাজাদের দেওয়ানরাও পদরচনা করিতেন—দেওয়ান রঘুনাথের পদ-ত সর্ব্বজন-পরিচিত। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রচিত পদও পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়া দেওয়ান নন্দকুমার রায়, দেওয়ান রামদুলাল নন্দী, দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় ইত্যাদি দেওয়ানদের পদও পাওয়া যায়। বিখ্যাত কবিদিগের মধ্যে দাশরথি রায়, রাম বসু, নিধু বাবু, নীলকণ্ঠ. ফিকিরচাঁদ শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এণ্টনি সাহেবকেও ভোলাময়রার সঙ্গে কবির লড়াই করিতে গিয়া শ্যামা মার মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

সকলেই যে শ্যামাভক্ত এবং ভক্তিবশেই পদ রচনা করিয়াছেন তাহা নয়। সঙ্গীতের ধারারক্ষার জন্যও শ্যামামার শরণ লইতে হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ কবিশক্তি হয় কীর্ত্তন, না হয় পাঁচালী সঙ্গীতে নিয়োজিত হইয়াছিল—বাকি যাহা ছিল তাহা সঙ্গীতের অন্যান্য ধারা রক্ষার জন্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। শ্যামাসঙ্গীতই এ দেশে কবিত্বের না হউক, সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

সমাপ্ত